বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

গোপালগঞ্জ

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

গোপালগঞ্জ

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
খালেক বিন জয়েনউদদীন

সমন্বয়কারী
দীনেশ চন্দ্র পান্ডে

সংগ্রাহক
কৃষ্ণপদ সরকার
তুষার বিশ্বাস

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
গোপালগঞ্জ

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৩
বাএ ৫৩০৭

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
২৫০ টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SOMKRITI GRONTHAMALA : GOPALGONJ (Present state of Folklore in Gopalgonj District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan. Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2013. Price : Tk. 250.00 only. US$: 5.00

ISBN-984-07-5316-9

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমী থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ্ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ্ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ্ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমীতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, æFolklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function·and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমী ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায়

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. **নামকরণের ইতিহাস :** কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. **বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ :** আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক

www.pathagar.com

কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল, বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান।

www.pathagar.com

২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, প্রকাশন অফিসার এস এম জাহাঙ্গীর কবীর এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে গোপালগঞ্জের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (Introduction of the District) ২৩-১০৪
- ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
- খ. ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতিক পরিবেশ
- গ. নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওড়-
- ঘ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ও অন্যান্য
- ঙ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- চ. মুক্তিযুদ্ধ
- ছ. রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ
- জ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গায়ক ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসাহিত্য (Folk Literature) ১০৫-১২১
- ক. লোকগল্প (Folk Literature)/ কাহিনি/কিচ্ছা/রূপকথা/উপকথা
- খ. কিংবদন্তি (Lenged)
- গ. লোকপুরাণ (Myth)
- ঘ. লোকছড়া
- ঙ. গৎ

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (Material Culture) ১২২-১২৬

লোকশিল্প (Folk Art)
- ১. পৌষ সংক্রান্তির আলপনা
- ২. লক্ষ্মীপূজার আলপনা
- ৩. সাজের হাড়ি
- ৪. নকশিকাঁথা
- ৫. শিকা
- ৬. রচমাল
- ৭. মৃৎশিল্প
- ৮. দারুশিল্প
- ৯. ধাতবশিল্প

পোশাক-পরিচ্ছদ (Ware & Ornaments) ১২৭-১২৯

লোকস্থাপত্য (Folk architecture) ১৩০

লোকসংগীত (Folk Song) ১৩১-২১০
- ১. মুর্শিদিগান
- ২. ধুয়া গান
- ৩. ভাটিয়ালি

www.pathagar.com

৪. বৈঠকি গীত
৫. মেয়েলি গীত
৬. দেহতত্ত্ব ও মারফতি
৭. মাজারের গীত
৮. গাজীর গান
৯. কর্মসংগীত
১০. রয়ানী গান
১১. কবিগান
১২. সারি
১৩. জারিগান

লোকবাদ্যযন্ত্র (Folk Instruments) ২১১-২১২

লোকউৎসব (Folk Festivel) ২১৩-২৩২

১. নববর্ষ
২. নবান্ন
৩. ফল্গুৎসব
৪. গায়ে হলুদ
৫. বিবাহ
৬. চড়কপূজা বা চণ্ডীপূজা
৭. জন্মাষ্টমী
৮. পৌষ সংক্রান্তি
৯. রথযাত্রা
১০. গার্সি
১১. লাল নিশান তত্ত্ব
১২. মহাবারুণী উপলক্ষে অনুষ্ঠান
১৩. অন্যান্য উৎসব

লোকমেলা (Folk Fair) ২৩৩-২৪১

১. বৈশাখী মেলা
২. জলিরপাড়ের মেলা
৩. রামদিয়া দুর্গাপূজার মেলা
৪. দেবাগুর কালীপূজার মেলা
৫. বড়দল ও ভাঙারহাটের মেলা
৬. ফুলগাছার মেলা
৭. ওড়াকান্দির মেলা

লোকাচার (Ritual) ২৪২-২৫৭

লোকখাদ্য (Folk Food) ২৫৮-২৬১

লোকনৃত্য (Folk Dance) ২৬২-২৬৫

১. বেহারা নৃত্য

www.pathagar.com

২. বরণ নৃত্য
৩. অষ্টক নৃত্য
৪. নীল নৃত্য

লোকক্রীড়া (Folk Sport) **২৬৬-২৭৪**

১. পুতুল খেলা
২. আচিয়া খুটি খেলা
৩. নোল নোল খেলা
৪. লাঠিখেলা
৫. পোলাপুলি
৬. কুৎ কুৎ খেলা
৭. বাগুন ঢ্যাবঢেবি খেলা
৮. পুথিবাড়ি খেলা
৯. গোবর্ধন খেলা
১০. লাটি সম্বড়ি বা রাখল রাজা
১১. নৌকা বাইচ
১২. ষাঁড়ের লড়াই
১৩. ঘোড়াদৌড়, গরুদৌড়
১৪. ঘুড়ি ওড়ান
১৫. মাথায় কাদামাটির ব্যবহার

লোক পেশাজীবী গ্রুপ (Folk Groups) **২৭৫-২৭৭**

১. পাল সম্প্রদায়
২. মৎসজীবী
৩. নরসুন্দর
৪. ব্রাহ্মণ
৫. দাই
৬. তাঁত শিল্প
৭. কামার
৮. মিস্ত্রি ও সুতার মিস্ত্রি
৯. গায়েন
১০. গাছি
১১. লাঠিয়াল
১২. অন্যান্য পেশাজীবী

লোকচিকিৎসা (Folk Medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (Chant) **২৭৮-২৮৩**

১. গাছ-গাছড়া ও আয়ুর্বেদ ভিত্তিক চিকিৎসা
২. তন্ত্র মন্ত্র ও ওঝার চিকিৎসা
৩. সিদ্ধ পুরুষের বাক্যদান চিকিৎসা

ধাঁধা (Riddle) **২৮৪-২৮৫**

প্রবাদ-প্রবচন (Proverb) **২৮৬-২৮৮**

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস (Folk Belief) ও লোকসংস্কার (Folk Superstition) ২৮৯-৩০২
১. পুণ্য স্নান
২. পেত্নী ছাড়ানো
৩. ভাই ভাতের ব্রত
৪. ভাগ্নে ভোজন
৫. নষ্টচন্দ্র বা হরিতালিকা
৬. ল্যাংটার চিনি
৭. ওজনের চিনি
৮. শিরলি
৯. পাঁঠা বলি
১০. ব্যবারী বুড়ি
১১. রাখাল পোড়া
১২. বৃক্ষপূজা ও বৃক্ষবিবাহ
১৩. তুলসী গাছের মাহাত্ম্য
১৪. কালিভাঙা
১৫. গোফাগুনা
১৬. দ্বৈতবিয়া
১৭. তিন তেঁতুলে
১৮. বাটি চালান
১৯. চটা চালান
২০. আয়না তপ্পন
২১. স্বপ্ন
২২. বার নিয়ে লোকাচার
২৩. আহ্নিক কৃত্য
২৪. যাত্রা নিরূপণ
২৫. গঙ্গাপূজা বা নদীর ঘাটের ব্রত
২৬. ক্ষেতে কচু ও মানুষের প্রতিকৃতি

লোকপ্রযুক্তি (Folk Technology) ৩০৩-৩০৯
১. নৌকা
২. পাটবান
৩. লাঙ্গল নির্মাণ
৪. মৃৎশিল্প
৫. মাছ শিকারে লোকপ্রযুক্তি
৬. পাখি ও পশু শিকারে লোকপ্রযুক্তি
৭. চিত্তবিনোদনে লোকপ্রযুক্তি
৮. ঘানি
৯. জাহৈ

লোকভাষা ৩১০-৩১৯

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

গোপালগঞ্জের নামকরণ নিয়ে একাধিক কিংবদন্তি আছে। যার নামে এই গোপালগঞ্জ জেলা গড়ে উঠেছে তা জানার কৌতূহল সবার মনে সাড়া দেয়। ষষ্ঠ শতকে গোপচন্দ্র নামে এক রাজা এই জনপদে রাজত্ব করতেন। তার রাজধানী ছিল বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায়। এই গোপচন্দ্রের নামে যে গোপালগঞ্জের নামকরণের সূত্রপাত হয় এই কিংবদন্তিতে অনেকের সংশয় আছে।

অন্য আর একটি জনশ্রুতি থেকে অবগত হওয়া যায়, বহুপূর্বে এই জনপদের নাম ছিল 'রাজগঞ্জ'। এই রাজগঞ্জ ছিল প্রমত্ত মধুমতী নদীর একটি পারঘাটা। নদীটির এপার ওপারের লোকজন এই পারঘাটায় যাতায়াত করতো, এবং জড়ো হতো। বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট সৃষ্টি হতে থাকে এই পারঘাটায়। কোনো এক সময় তা পরিণত হলো গঞ্জে। সে থেকে এর নাম হয় 'রাজগঞ্জ'। এই অঞ্চলটি ছিল জলময়। শাপলা, শালুক, পদ্মফুলে ঢাকা থাকতো বিলঝিল। তার মাঝে মধুমতী নদীতে প্রবল স্রোত। প্রাকৃতিক পরিবেশের এ এক অপূর্ব লীলাভূমি। বিলেঝিলে মিলে অসংখ্য মাছ। এই কারণে এখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশ ছিল মৎস্যজীবী। গোপাল নাম হতে যে গোপালগঞ্জের নামকরণ হয়েছে এই মতের সমর্থক বেশি। কিন্তু কে সেই গোপাল? মকিমপুর পরগণার জমিদারিত্বের দায়িত্বে ছিলেন রানি রাসমণি। তিনি বাস করতেন কলকাতায়। জমিদারি দেখাশোনা করার জন্য প্রায়ই তিনি এই জলময় অঞ্চলে ছুটে আসতেন। একদা তিনি তার আদরের নাতি গোপালকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। গোপাল কলকাতায় শহুরে সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছে। নদী বহুল ও জলময় এই পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। রাজগঞ্জ পারঘাটায় পানসি থেকে নেমে সে দেখতে পেল এক নতুন জগৎ। আনন্দে আত্মহারা হলো। যেদিকে তাকায় কেবলই জল থৈ থৈ দৃশ্য। বিলময় ফুটে আছে শাপলা, পদ্ম। সবমিলিয়ে গোপালের খুবই পছন্দ হলো এই রাজগঞ্জটি। রানি রাসমণি তার সেই প্রিয় নাতির ভালোবাসার জায়গাটাকে স্মৃতির পাতায় অক্ষত রাখার জন্য রাজগঞ্জের 'রাজ'-এর পরিবর্তে 'গোপাল' শব্দটা যুক্ত করে করলেন 'গোপালগঞ্জ'।

অন্যমতে, ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে তুর্কি আক্রমণের প্রাক্কালে কতিপয় হিন্দু প্রাণ ভয়ে এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার আশঙ্কায় ভারতের বিহার প্রদেশের গোপালগঞ্জ জেলা থেকে গৌড় দেশ হয়ে বঙ্গদেশের খরস্রোতা নদী মধুমতীর পূর্ব তীরে নল-নটা জলভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কালক্রমে সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাদের আদিনিবাস গোপালগঞ্জকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এ অঞ্চলের নামকরণ করে গোপালগঞ্জ। আরেক তথ্য অনুযায়ী, ১৭৫৭ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করার

www.pathagar.com

গোপালগঞ্জ জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

সময় বাংলার নবাব সিরাজদৌলা ইংরেজদের একেবারে কোণঠাসা করেন। তারা কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এরপর ১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুর সেনানিবাসে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়। উত্তর প্রদেশের মিরাট থেকে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। মোগল সম্রাটের দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, তাতিয়া টোপী প্রমুখ নেতৃত্বে থাকেন। এই বিদ্রোহে মঙ্গল পাণ্ডে প্রথম শহিদ হন। একদল ইংরেজ বণিক মগধ, গৌড়দেশ, নদীয়া পেরিয়ে প্রাণের ভয়ে আরও পূর্বদিকে ঢুকে পড়ে। পূর্বাঞ্চল ছিল জলময় নল-নটার দেশ। কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যায় ছিল বেশি। তারা আশ্রয় নেয় এসব নিভৃত অঞ্চলে। এলাকার কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ওই বণিকদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে থাকে। বণিকরা প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে কোনো এক সময় তাদেরকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিছু প্রতিদান গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু তাদের ভিতর ছিল না কোনো শিক্ষার আলো। চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই বলে তারা জানিয়ে দেয়। ঐ কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের ভিতর একজন নারী ছিল খুবই বুদ্ধিমতী। নাম রানি রাসমণি। সবাই বলল, যদি কিছু দিতে ইচ্ছা হয় তবে ওই রাসমণিকেই দিয়ে যান। বণিকেরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রানি রাসমণিকে খড়িয়াল, মোকিমপুর, বেলকুলা, নন্দী তেলিহাটি, মিঠাপুর ও সাহাপুর পরগণার জমিদারিত্ব দান করেন। রানি রাসমণির এক নায়েব ছিল। নায়েবের প্রতি ছিল রানি রাসমণির অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসা। ওই নায়েবের এক প্রোপৌত্রের নাম নব গোপাল। রানি রাসমণি নব গোপালের নৈতিকতা ও অসাধারণ প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হন। আগে এলাকাটির নাম ছিল 'রাজগঞ্জ'। তিনি নব গোপালের নামটি স্মৃতির পাতায় অক্ষত রাখার জন্য রাজগঞ্জের পরিবর্তে গোপালগঞ্জ নামকরণ করেন। গোপালগঞ্জের যাত্রা সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে বলে কথিত।

আয়তন : প্রায় ১৪৮৯.৯২ বর্গ কি.মি.।

জনসংখ্যা : গোপালগঞ্জের সর্বমোট জনসংখ্যা ১১৪৯০০০, পুরুষ ৪৯.২৬%, মহিলা ৫০.৬৫% ; মুসলমান ৬৩.৬১%, হিন্দু ৩৬.১৩%, খ্রিস্টান ১.২০%, বৌদ্ধ ০.৫২% ও অন্যান্য ০.০৩%। শিক্ষার হার ৪৬%।

১৯৭২ সালে ৯টি ওয়ার্ড ও ৪৯টি মহল্লা নিয়ে এই পৌরসভা গঠিত হয়। আয়তন ৮.৫৯ বর্গ কি.মি.।

জেলা সৃষ্টি ১৯৮৪ সালে। উপজেলা ৫টি। যথা : গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর, টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া। জাতীয় সংসদে আসন ৩টি। পৌরসভা ৪টি, ইউনিয়ন ৬৮, গ্রাম ৮৮০, ওয়ার্ড ৩৬, মহল্লা ৮৫ ও মৌজা ৬১৮টি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে বঙ্গদেশের কথা বলতে গেলে ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দের পৃথ্বিরাজের পরাজয়ের পর মুসলমানদের কনোজ রাজ্য অধিকারের কথা স্মরণ করে দেয়। মগধ জয় করার পর মুসলমানগণ ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করে। বঙ্গদেশের বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলাটি আগে ছিল ফরিদপুরের অংশ বিশেষ। সংগত কারণে বৃহত্তর ফরিদপুরের ইতিবৃত্তও এই জেলার ইতিবৃত্তেরই অবয়ব।

www.pathagar.com

অধুনা ফরিদপুর জেলা নিয়ে এমনও জনশ্রুতি আছে যে, এই এলাকাটি জলমগ্ন ছিল। নল-নটায় থাকত আচ্ছন্ন। বসবাসের জন্য তা ছিল একেবারে অনুপযুক্ত। ফতেহ আলী নামে একজন মুসলমান অনেক কষ্ট ক্লেশ করে এটিকে বাসযোগ্য করে তোলেন। সে থেকে এর নাম হয় ফতেয়াবাদ। এই ফতেয়াবাদই ফরিদপুর নামে পরিচিত। অন্যমতে, ফরিদপুর নাম ফরিদ খাঁ নামের এক ফকিরের নাম থেকে হয়েছে বলে কথিত। চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে ফরিদপুর জেলা পূর্ব বাংলার অন্যান্য অংশের সাথে মুসলমানদের অধীন হয়ে পড়ে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বারো ভূঁইয়াদের ইতিহাসের নিদর্শন এখনও এই জেলায় দেখা যায়, যথা–কেদার রায়ের কীর্তি পরিখা বেষ্টিত কেদারবাড়ি এবং ভূষণা থানার কেল্লা বাড়িতে সীতারাম রায়ের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

ইংরেজ আমলে ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা হয়ে ওঠে। মূলত তিনটি জেলার সমন্বয়ে ফরিদপুর জেলার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। ঢাকা জেলার যেসকল অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ফরিদপুরের সাথে মিশেছে তা বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ। যশোর জেলার যেসকল অংশ এসেছে তা ভূষণা ও ফতেয়াবাদ। আর বাকরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল) জেলা থেকে যে অংশ এসে মিশেছে তা কতক জলময় সদৃশ। জেলা সৃষ্টির আগে বঙ্গদেশে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে যখন রাজস্ব নির্ধারণ করা হয় তখন তার নাম ছিল 'আমল তুমার জুমা'। এটি চালু করেন বাদশা আকবর। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি গঠিত হয় কয়েকটি পরগণা নিয়ে। তখন বঙ্গদেশে মোট পরগণার সংখ্যা ছিল ৬৮২টি। এরমধ্যে গোপালগঞ্জের সাহাপুর পরগণার নাম ছিল না। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে জেলা পদ্ধতি চালু হয়। সেসময়ে জেলার সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩টি। ওই সময় বর্তমানের ঢাকা, বরিশাল ও ফরিদপুরের অধিকাংশ স্থান ঢাকা-জালালপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জনগণের কল্যাণ ও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ঢাকা-জালালপুর জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। দক্ষিণ অংশের নাম বাকরগঞ্জ। এর অব্যবহিত পরে বর্তমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে থানা সৃষ্টি হয়। এ সময় গোপালগঞ্জ ও তার পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণাংশের বহুগ্রাম যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মধুমতীর তীরে অবস্থিত গোপীনাথপুর ও চন্দ্রদিঘলিয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। গোপীনাথপুর একটি থানা সৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জে একটি সাবডিভিশন স্থাপিত হয়। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর কলকাতা গেজেটের ৩৭০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসারে তৎকালীন মধুমতী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত গোপালগঞ্জের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে যে সমস্ত গ্রাম যশোর জেলার মধ্যে ছিল, যথা : কঠি, ভোজরগাতি, কন্দর্পগাতি, বাঘাজুড়ি, কাঁড়ারগাতি, খানারপাড়, কালা গোপীনাথপুর, কুড়ানটোলা, গোপালপুর খেলনা, ডালিনা, রায়পাশা, কাটরবাড়ি, ভূতিরিয়া, খাগবাড়ি, মানিকহার, দুর্গাপুর, গড়াই গাতি, আড়পাড়া, খাগাইল, বাজুনিয়া, বরইহাটি, মাঝিগাতি, রঘুনাথপুর, শ্রীরামকান্দি, গওহর ডাঙ্গা প্রভৃতি তা বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মধুমতী নদীকে যশোর জেলার পূর্ব সীমানা স্থির করে দেওয়ায় গোপালগঞ্জ বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ে রেভিনিউ সার্ভে শেষ হয়। রেভিনিউ সার্ভেয়ারগণ ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ জেলার একটি নতুন সীমানার লাইন ঠিক

www.pathagar.com

করে দেন। তা গভর্নমেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়ে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। এরফলে বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার যে সমস্ত গ্রাম বাকরগঞ্জ জেলার মধ্যে ছিল তা ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। সাহাপুর পরগণাও ফরিদপুরের মধ্যে এলো। কিন্তু গোপালগঞ্জে তখনও থানা সৃষ্টি হয়নি। এই স্থানসমূহ গোপীনাথপুর থানার অন্তর্ভুক্ত হলো। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা এভাবে ভাঙা-গড়ার মাধ্যমে এগিয়ে চলতে থাকে। তাই গোপালগঞ্জ জেলা সৃষ্টির পেছনে রয়েছে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস। ১৮৭০ দশকের পরের ইতিবৃত্ত পর্যায়ক্রমে গোপালগঞ্জ জেলার ভৌগোলিক সীমানার ভীতকে শক্ত করে তোলে। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে গোপীনাথপুর থানা গোপালগঞ্জে আনা হয়। এই সময়ে ফরিদপুর জেলা ২টি সাব-ডিভিশনে বিভক্ত হয়; একটি সদর ও অপরটি গোয়ালন্দ। সাহাপুর পরগণা (গোপালগঞ্জ থানার সাথে) ফরিদপুর সদর সাব-ডিভিশনের অধীনে থাকে।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাকরগঞ্জ জেলার মাদারীপুর সাবডিভিশনের গৌরনদী থানা বাদে অবশিষ্ট অংশ ফরিদপুর জেলাভুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার কোনো জজ ছিল না। ঢাকার জজই ফরিদপুর জেলার জজের কাজ করতেন। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট হতে ঢাকার এডিশনাল জজ ফরিদপুরে এসে কোর্ট করবার আদেশ হয়। পরের বছর ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ ফরিদপুর স্বতন্ত্র জজ হয়। ওই বছর (১১ আগস্ট ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) গোপালগঞ্জ থানা মাদারীপুর সাব-ডিভিশন ও মুন্সেফির অধীন. হয়। কয়েক বছর পরে গোপালগঞ্জে প্রথমত রেগুলার (Regular), পরে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিপেন্ডেন্ট (Indpendent) বেঞ্চ নামে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের বেঞ্চকোর্ট স্থাপিত হয়। এইভাবে অনেক বছর চলার পর ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ নভেম্বর তারিখে গোপালগঞ্জ, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী থানা নিয়ে গোপালগঞ্জে ফৌজদারি কোর্ট ও মহকুমা হয়; কিন্তু মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী থানার মুন্সেফ কোর্ট ভাঙাতে এবং কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জের মুন্সেফি মাদারীপুরেই থাকে। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্ট হলে ঢাকাতে রাজধানী ও স্বতন্ত্র রেভিনিউ বোর্ড স্থাপিত হয়। ওই সময় হতে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্থান ওই প্রদেশের মধ্যে ছিল।

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জে মুন্সেফ কোর্ট স্থাপিত হয়। তখন থেকে সাহাপুর পরগণায় দেওয়ানি মোকদ্দমা গোপালগঞ্জ মুন্সেফ কোর্টে হচ্ছিল। এই পরগনার অধিবাসীগণ বিভিন্ন সময়ে এই রূপ বিভিন্ন থানা, মহকুমা, মুন্সেফি, জেলা ও রেভিনিউ বোর্ডের অধীনে বাস করেছে। পূর্বকালে যাতায়াতের যেরূপ অসুবিধা ছিল তাতে দূরবর্তী স্থানে মহকুমা ও মুন্সেফ কোর্ট, জজকোর্ট থাকায় তাদের বহুকষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে।

এতদূর পথ পরিক্রমার পর অবশেষে ১৯৮৪ সালে গোপালগঞ্জ স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

জনবসতির পরিচয়

এই ব-দ্বীপ সদৃশ সমতট বঙ্গের দক্ষিণাংশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এটি ছিল একদা জলধির অংশ বিশেষ। এই

www.pathagar.com

বিস্তৃত ভূ-ভাগ দিয়ে সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হতো। উত্তর থেকে বয়ে আসা বিভিন্ন জলরেখা এসে মিশেছে সমুদ্র গর্ভে। সেসব নদী বাহিত পলি কাকড় জমে দক্ষিণ বঙ্গের সুবিস্তৃত অঞ্চল হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে। ভাগীরথী ও পদ্মার প্রবাহ পথ কর্তৃক একূল ভাঙার ও ওকূল গড়ার ইতিহাসের ছোঁয়া লেগেছে এই জনপদটিতে। কখনও অরণ্য, কখনও জনপদ আবার কখনও নদীগর্ভে বিলীন। এই ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েও বাসযোগ্য ভূ-খণ্ড গড়ে তোলার প্রয়াস কখনও থেমে থাকেনি। এই জনপদ নিয়ে পণ্ডিতেরা ধারণা করে থাকেন, ভাঙা-গড়ার পথ মাড়িয়েও প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে থেকে এই জনপদে মানুষ বসবাস করতে শুরু করে। কেউ কেউ মনে করেন তারও বহু বছর আগে এখানে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ভূমিকম্পের ফলে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ক্রমে তা ভরাট হয়ে কোথাও কোথাও স্থলভূমে রূপ নেয় এবং নিচু জলময় অংশ বিল, ঝিল, হ্রদ নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এটি কোনো এক সময় মানুষের বাসযোগ্য ভূমি ছিল এমন নমুনা মেলে। যেমন যেখানে কোটালীপাড়া দুর্গ আছে সেই জলময় স্থানে প্রায়ই ইটের তৈরি গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া গোপালগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নিজড়া গ্রামের সিদ্দিক মীনা বললেন–'নিজড়া বড় মীনা বাড়িতে আমরা বসবাস করি। এই বাড়ির উত্তর ধারে মাটি কাটতে গিয়ে পোড়ামাটির নিদর্শন ও একটি পুকুর ঘাটের নমুনা পাওয়া গেছে।' এ বিষয়ে আরও ব্যাপক পরিসরে গবেষণা চালিয়ে গেলে যুক্তিনির্ভর ও তথ্যনির্ভর প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা

আয়তন : ৪১৩.৭৫ বর্গ কি.মি.। উত্তরে মুকসুদপুর, কাশিয়ানী, ও লোহাগড়া। দক্ষিণে টুঙ্গীপাড়া, মোল্লারহাট, পূর্বে কোটালীপাড়া ও রাজৈর, পশ্চিমে মোল্লারহাট, কালিয়া ও লোহাগড়া উপজেলা।

প্রধান নদী : মধুমতী ও মাদারীপুর বিলরুট ক্যানাল।

উপজেলা শহর : পৌরসভা সৃষ্টি ১৯৭২ সালে। ৯টি ওয়ার্ড ও ৪৯টি মহল্লা নিয়ে গঠিত।

আয়তন : ৮.৫৯ বর্গ কি.মি.।

জনসংখ্যা : মোট ৪০৯৮৭ জন। পুরুষ ৫৩.২৭%, মহিলা ৪৬.৭৩%।

শিক্ষার হার : ৬৬.৯%।

প্রশাসন : সদর থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। ইউনিয়ন-২০, পৌরসভা ১, ওয়ার্ড ৯, গ্রাম ১৯৬, মৌজা ১২৭টি।

টুঙ্গীপাড়া উপজেলা

আয়তন : ১২৭.২৫ বর্গ কি.মি.। উত্তরে গোপালগঞ্জ সদর ও কোটালীপাড়া উপজেলা, দক্ষিণে মোল্লারহাট ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা।

জনসংখ্যা : মোট ৩০৭৪৭ জন। পুরুষ ৫১.০৯%, মহিলা ৪৮.৯১%। জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০১২ জন। শিক্ষার হার ৩৬.১%। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার এ শহরে অবস্থিত।

www.pathagar.com

প্রশাসন : টুঙ্গীপাড়া থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৯৫ সালে। পৌরসভা ১, ইউনিয়ন ৫, গ্রাম ৬৭, মৌজা ৩৪টি।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : মসজিদ ১৫৫, মন্দির ৫০, গির্জা ১, মাজার ১টি। জনসংখ্যা মোট ৮৮১০২ জন, এরমধ্যে পুরুষ ৫১.২৫%, মহিলা ৪৮.৭৫%। মুসলমান ৬৫.০৫%, হিন্দু ৩৪.৭৪% ও অন্যান্য ০.২১%।

শিক্ষার হার : ৩৩.৩%।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান : পাবলিক লাইব্রেরি ১টি, গ্রামীণ ক্লাব ২৭টি, সিনেমা হলো ১টি, বঙ্গবন্ধু পাঠাগার ১টি, সাহিত্য সমিতি ১টি, পর্যটন মোর্টেল ১টি, বঙ্গবন্ধু স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্স ১টি।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি : বাংলা ১৩৬৮ সনে বৌলতলী ইউনিয়নের করপাড়া, বলাকৈড়, তাড়গ্রাম এলাকায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় বহু হিন্দু-মুসলমান নিহত হয়।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় উর্ফী ইউনিয়নের শসাবাড়িয়ায় মুক্তিবাহিনী এবং পাকবাহিনীর মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধে ১০/১২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। পাইককান্দি গ্রামে শান্তি কমিটির সহযোগিতায় পাকবাহিনী প্রায় দেড়শ বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন : বধ্যভূমি ১টি।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব : বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (সমাজসেবক), কবিয়াল হরিবর সরকার, কবিয়াল মনোহর সরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নিশিকান্ত বিশ্বাস (মাতৃভক্ত), নারদ বিশ্বাস (ভারতীয় কূটনীতিক)।

জনসংখ্যা : ২,৯১,৪০১ জন। পুরুষ ৫০.৭৩%, মহিলা ৪৯.২৭%। মুসলমান ৬৬.৪৫%, হিন্দু ৩২.৭৫%, খ্রিস্টান ০.৪২%, বৌদ্ধ ০.৪২%, অন্যান্য ০.৩৪%।

দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী : দৈনিক যুগকথা, দৈনিক ভোরের বাণী, দৈনিক শিরীন, দৈনিক বাংলার সংকেত, দৈনিক বিশ্বদর্পন; সাপ্তাহিক জনপদের কথা, গোপালগঞ্জ বার্তা (অবলুপ্ত), গোপালগঞ্জ সাহিত্য পত্র, আলোর দিশারী; ও মাসিক মধুমতী (অবলুপ্ত)।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান : ক্লাব-১৫, পাবলিক লাইব্রেরি-১, সিনেমা হল-২, শিশু একাডেমী কমপ্লেক্স-১, শিল্পকলা একাডেমী -১, স্টেডিয়াম -২টি।

কোটালীপাড়া উপজেলা

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে যেকয়টি স্থানের নাম আমরা খুঁজে পাই তার মধ্যে রাজশাহীর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড় ও কুমিল্লার ময়নামতি সকলের কাছে পরিচিত। কিন্তু এসব স্থানের চেয়েও অতি প্রাচীন জনপদ হচ্ছে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া। ষোলো শ' বছর আগে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের তৃতীয়পাদে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত স্থানীয় মহরাজা সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করে কোটালীপাড়াকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। চন্দ্রবর্মা তার রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কোটালীপাড়ায় একটি দুর্গ স্থাপন করেন। দুর্গটির নামকরণ করেন চন্দ্রবর্মা কোট।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এবং তাম্রশাসন ও স্বর্ণমুদ্রায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। আর এসব তথ্য প্রকাশিত হতে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে। অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা এই যে, কোটালীপাড়া বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোনো সুষ্ঠু গবেষণা ও পুরাকীর্তির অনুসন্ধান করা হয়নি। তাই ইতিহাসের প্রাচীন সভ্যতা মাটিচাপা পড়ে আছে বিল-বাওড়ে ঘেরা কোটালীপাড়া। কোটালীপাড়ায় প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনের শিলালেখ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা রিভিউ সম্মেলন ও এপিয়াফিয়া ইন্ডিয়া পত্রিকায়। তাম্রশাসনের শিলালেখ উদ্ধার করেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী। ড. ভট্টশালী উদ্ধারকৃত তাম্রশাসনটির নাম, সমাচার দেব ঘাগরাহাটী (ঘাঘর হাটী) তাম্রশাসন। এটি প্রকাশিত হলে ঐতিহাসিক মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার *বাঙ্গালার ইতিহাস* গ্রন্থে লেখেন : 'তাম্রশাসন খানি ফরিদপুর জেলার ঘাগরাহাটী গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং উহা এখন ঢাকার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচার দেবের রাজ্যকালে নব্যবকাশিকার অন্তরঙ্গ উপরিক শ্রীজীবদত্ত শাসনকর্তা ছিলেন এবং তৎকর্তৃক নিযুক্ত বিষয়পাতি পাবিত্রক বার কমন্তনের শাসনকর্তা ছিলেন এবং এই সময়ে সুপ্রতীকস্বামী নামক এক ব্যক্তি যোদ্ধাধিকরনিক দামুক প্রমুখ বিষয় মহত্তরগণের নিকট একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন এবং তদানুসারে তিন কুল্যবাকী পরিমাণ ভূমি তাহাকে বিক্রীত হইয়াছিল। এই তাম্রলিপির উদ্ধার পাঠ বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত পারগিটার (PARGITAR) ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পাঠ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য।'

কোটালীপাড়ায় প্রাপ্ত অন্যান্য মুদ্রায় গুপ্ত বংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও স্কন্ধগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে অর্থাৎ গুপ্তদের পরে গোপাল চন্দ্র দেব, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেবের অধিকারে আসে। যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পৃথুবীর ও সুধন্যদিত্য নামে আরো দুজন নৃপতির নাম বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে অনেকেই মেনে নিয়েছেন যে চন্দ্রবর্মকোট থেকে কোটালীপাড়া নামের উৎপত্তি এবং গোপাল চন্দ্র দেবের নামানুসারে ষষ্ঠ শতকেই গোপালগঞ্জ জেলার নামকরণ করা হয়েছিল। তখন কোটালীপাড়া ছিল বঙ্গের রাজধানী। এ সময় কোটালীপাড়া ছিল নব্যবকাশিকা অঞ্চল অর্থাৎ 'নতুন জেগে ওঠা ভূমি' যা সৃষ্টি হয়েছে জলাভূমি থেকে। ড. নীহাররঞ্জন তাই কোটালীপাড়া জনপদকে বলেছেন নৌগামী ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধ কেন্দ্র। সেন এবং সুলতানি ও মোগল আমলে কোটালীপাড়া জনপদের অস্তিত্ব আগের মতোই ছিল।

বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জেগে উঠেছে বিল বাওড়ের জলাভূমি। দু'শো বছর শাসনকর্তারা থেকেছেন পশ্চিমে, কখনও ঢাকায়, কখনও দিল্লিতে। তারা খাজনা নিয়েই খুশি ছিল। যোগাযোগের কারণেই তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বার বার। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পতন ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ১৭৬৫ সালে। তখন কোটালীপাড়া রাজশাহীর জমিদারিভুক্ত হয়। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে গোপালগঞ্জের কিছু অংশ ও গোয়ালন্দ পার্শ্ববর্তী যশোর জেলার অধীন হয়। ১৮৫৪ সালে বরিশাল জেলার অধীনে মাদারীপুর

www.pathagar.com

মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৮৭৩ সালে বাখরগঞ্জ থেকে মাদারীপুরকে বিচ্ছিন্ন করে ফরিদপুরের অধীনে আনা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ১৮৫৪ সালে মাদারীপুর মহকুমা সৃষ্টির সময় গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়াকে মাদারীপুরের অধীন করা হয়। জেলা হয় বরিশাল। ১৯০৯ সালে গোপালগঞ্জ মহকুমার সৃষ্টি হয়। কোটালীপাড়া ও মুকসুদপুর এই মহকুমার অধীনে চলে আসে। পরে কাশিয়ানী থানা গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালের পরে টুঙ্গীপাড়া থানার সৃষ্টি। এভাবেই বর্তমান গোপালগঞ্জের পরিধি বিস্তৃত।'

আয়তন : ৩৬২.৫০ বর্গ কি.মি.। উত্তরে রাজৈর ও মাদারীপুর সদর উপজেলা, দক্ষিণে নাজিরপুর ও উজিরপুর উপজেলা, পূর্বে আগৈলঝারা, গৌরনদী ও কালকিনি উপজেলা, পশ্চিমে গোপালগঞ্জ সদর ও টুঙ্গীপাড়া উপজেলা।

উপজেলা শহর : ৫টি মৌজা, ৯টি ওয়ার্ড ও ৮টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। পৌরসভা সৃষ্টি ১৯৯৭ সালে। আয়তন ৫.১২ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা ৪৮২৪ জন, পুরুষ ৫০.৯৫%, মহিলা ৪৯.৫০%। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯৪২ জন। শিক্ষার হার ৩৯.৪%। ডাকবাংলো ১।

প্রশাসন : ইউনিয়ন-১২, মৌজা-১০০, গ্রাম-১৯৬।

প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদ : কোটালীপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন (১৮৯৮), বহাতলী সিকদার বাড়ি মসজিদ (৫০০ বছরের পুরাতন)।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি : রামশীল ইউনিয়নে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে হেমায়েত বাহিনীর সাথে পাকবাহিনীর সম্মুখযুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য হেমায়েত উদ্দিনকে বীরবিক্রম উপাধি দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্মৃতিস্তম্ভ–১ (১৬ জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার স্মরণে)।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : মসজিদ ১৮৯, মন্দির ২২৫, গির্জা ৩৯, মাজার ১, তীর্থস্থান ২।

জনসংখ্যা : ২০৬১ জন, পুরুষ ৫০.৪৮%, মহিলা ৪৯.৫২%। মুসলমান ৪৩.৭০%, হিন্দু ৫৩.০১%, খ্রিস্টান ৩.২৬%, বৌদ্ধ ০.০২%, অন্যান্য ০.০১%।

শিক্ষার হার : ৩৪.৮%। পুরুষ ৪২.২%, মহিলা ২৭.৩%।

কলেজ ও বিদ্যালয় : সরকারি কলেজ ১, বেসরকারি কলেজ ৩, হাইস্কুল ২৯, জুনিয়র হাইস্কুল ৮, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০৪, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৮, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১।

কাশিয়ানী উপজেলা

আয়তন : ২৯৯.৬৪ বর্গ কি.মি.। উত্তরে বোয়ালমারী উপজেলা, দক্ষিণে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা, পূর্বে মুকসুদপুর ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা। পশ্চিমে লোহাগড়া ও আলফাডাঙ্গা উপজেলা।

উপজেলা শহর একটি মৌজা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১.৬২ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা ৪০৩৩ জন, পুরুষ ৫২.৬৯%, মহিলা ৪৭.৩১%। জনসংখ্যার ঘনত্ব ২৪৯ জন। শিক্ষার হার ৫২%। ডাক বাংলো-২, প্রশাসন থানা সৃষ্টি ১৯৩৬ সালে। ইউনিয়ন ১৪টি, মৌজা ১৫১, গ্রাম ১৬১টি।

www.pathagar.com

কাশিয়ানী থানায় গ্রামের সংখ্যা ১৫৪টি। ইউনিয়ন ১৩টি, আয়তন ১০৯ বর্গ মাইল। কালুখালি ও ভাটিয়াপাড়ার সঙ্গে এর রয়েছে রেল সংযোগ। মধুমতী ও বারাসিয়া চলাচলের প্রধান নদী। লোকশ্রুতি থেকে জানা যায় নবাব আলীবর্দী খানের আমলে কাশিয়ানী ইউনিয়নের অন্তর্গত কাশিয়ানী গ্রামের বাসিন্দা বাবু দর্পনারায়ণ সেন কাশিনাথ দেবের পাঁচটি মূর্তি নির্মাণ করেন ও গ্রামের পাঁচটি বাড়িতে স্থাপন করেন। সেই থেকেই এই গ্রাম কাশিয়ানী নামে পরিচিত।

বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা যেমন–নমশূদ্র, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্ত, সাহা, বণিক এখানে বাস করত। তন্মধ্যে বৈদ্যরাই ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী, শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন। ব্রিটিশ আমলে বৈদ্যনাথ সেন জজ নিযুক্ত হয়েছিলেন। কবিরাজ কৈলাশ চন্দ্র সেন ছিলেন বিখ্যাত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। তার একজন যোগ্যতম উত্তরসূরি জমিদার গিরিশচন্দ্র সেন ১৯০২ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টির নাম জিমি হাই স্কুল। বিত্তশালী সাহা সম্প্রদায় দেশ বিভাজনের সময় বাড়িঘর ফেলে ভারতে চলে যায়। এই এলাকায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। তবে অঞ্চলটি ধান, পাট ও রবিশস্যের জন্য বিখ্যাত। এ থানার অন্তর্গত ওড়াকান্দি গ্রাম সবচাইতে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এখানে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশনের একটি শাখা আছে। এলাকাটিতে কোনো এক সময় বহু শিক্ষিত হিন্দু বাস করত। রামদিয়া, রাজপাট ব্যবসায়িক সুবিখ্যাত স্থান।

মুকসুদপুর উপজেলা

আয়তন : ৩০৯.৬৩ বর্গ কি.মি.। উত্তরে নগরকান্দা ও ভাঙা উপজেলা, দক্ষিণে গোপালগঞ্জ সদর ও কাশিয়ানী উপজেলা, পশ্চিমে কাশিয়ানী ও বোয়ালমারী উপজেলা।

উপজেলা শহর ৯টি ওয়ার্ড ও ১৫টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। পৌরসভা সৃষ্টি হয় ২০০০ সালে। আয়তন ২.৭২ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা ১৮১১৬ জন। পুরুষ ৪৮.৭৫% ও মহিলা ৫১.২৫%। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৬৬৬ জন। শিক্ষার হার ৫৭.৮%। ডাক বাংলো ২টি। প্রশাসন থানা সৃষ্টি ১৯১৪ সালে। বর্তমানে এটি উপজেলা। ইউনিয়ন ১৭টি, মৌজা ২০৬টি, গ্রাম ২৬০টি।

কথিত আছে, মুকসুদ খাঁ নামক একজন দরবেশ গোপালগঞ্জ সদরের উত্তরে আস্তানা গড়ে তোলেন। অনেক অলৌকিক ঘটনা সেই দরবেশ দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল বলে অনেকে আজও বলে থাকেন। এই মুকসুদ খাঁর নামানুসারে এলাকাটির নাম মুকসুদপুর হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

গোপালগঞ্জ জেলাটি উত্তর গোলার্ধে নিরক্ষরেখা এবং কর্কটক্রান্তির মধ্যবর্তী ২২০৫২ হতে ২৩০২২ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯০৩৮ হতে ৯০০০৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ২৩ ফুট উঁচু। আয়তন ১৪৮৯.৯২ বর্গ কি.মি.। পূর্বে মাদারীপুর ও বরিশাল, দক্ষিণে পিরোজপুর ও বাগেরহাট, পশ্চিমে নড়াইল এবং উত্তরে ফরিদপুর জেলা। মাটির প্রকৃতি দোআঁশ ও বেলে ধরনের।

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক পরিবেশে গোপালগঞ্জ জেলাটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এই জনপদের বক্ষ বিদীর্ণ করে বয়ে গেছে অনেক নদ-নদী। ঘাঘর, মধুমতী, বারাসিয়া, মাদারীপুর বিলরুট ক্যানাল ও কুমার নদ তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য। এখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে নদ-নদীকে ঘিরে। হাওড়-বাওড়, বিল-ঝিল, দিঘি, পুষ্করিণী সৃষ্টি হয়ে অনেক ভিন্নতা এনে দিয়েছে এই জনপদটির। অনেক কিংবদন্তিও মিশে আছে এসব নদ-নদী ও জলাশয়কে ঘিরে। চান্দার বিল, বাঘিয়ার বিল ও বর্ণির বাওড় তারমধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে। ছোট ছোট সুশোভিত বনে সাজানো আছে অঞ্চলটি। তারমধ্যে টুঙ্গীপাড়া উপজেলার গিমাডাঙ্গা, শ্রীরামকান্দি, বাশুড়িয়া এবং পশ্চিম গোপালগঞ্জের শুচীডাঙ্গা ও তার আশপাশের এলাকাসমূহ উল্লেখযোগ্য। কাশিয়ানীর তিলছড়া, রাতৈল এবং ঘোনাপাড়া বন-বাদাড়ে আবৃত। সজারু, খাটাশ, বনবিড়াল ও শেয়াল এসব বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণী। আগে এসব অঞ্চলে মেছো বাঘ, কাঠবিড়াল ও বনরুই প্রচুর দেখা যেত। কিছু কাঠবেড়াল এখনও চোখে পড়ে। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার পালেককান্দি (করপাড়া) গ্রামে বড় বড় বৃক্ষের শাখায় বাদুড় আগের মতোই আছে। বর্ণির বাওড় ও কাজুলিয়ার বিলে শীতের মৌসুমে অসংখ্য অতিথি পাখি এসে প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। বর্ষা মৌসুমে এই এলাকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝে জলে ভাসা গ্রামগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। বর্ষার দিনে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে নৌকায় যাতায়াত লক্ষ করা যায়। দক্ষিণবঙ্গের এটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বাড়ির আশপাশে ও পথে-প্রান্তরে ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের সমারোহ কম না। দোয়েল, শ্যামা, কোকিল, ময়না ও নাম জানা-অজানা হরেক রকম পাখির কলকাকলিতে আজও প্রভাত বেলায় এই জনপদের ঘুম ভাঙে।

গ. নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওড়-বাওড়

মাদারীপুর বিলরুট ক্যানাল

খুলনা থেকে মাদারীপুর, গোয়ালন্দ, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও আসামের মধ্যে নৌ-পথের দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য স্যার আর্থার কটন ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি নৌপথ খননের প্রস্তাব দেন। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে স্যার ব্রেডফোর্ড ল্যাসলি এবং ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে স্যার রিচার্ড টামসল এর কিছু সংশোধন প্রস্তাব পেশ করেন। আবার ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে স্যার আরবি ব্যাকল হরিদাসপুরের কাছে মধুমতীর সাথে টেকের হাটে কুমারের সংযোগ স্থাপনের প্রস্তাব দেন। কাজ শুরু হয় ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ব্যবহারোপযোগী করা হলেও কাজ শেষ হয় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে। মাদারীপুর বিলরুট ক্যানালকে বাংলাদেশের সুয়েজ ক্যানাল বলা হয়। অসংখ্য নিম্নাঞ্চল, বিল বা জলাশয় একই জল রেখায় এনে মিলিত করার কারণে এই নামকরণ। মাদারীপুর বিলরুট মাদারীপুর জেলার কবিরাজপুরের কাছে আড়িয়াল খাঁ নদী থেকে গোপালগঞ্জের মানিকদহের কাছে মধুমতী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথে বিলরুট টেকেরহাটের কাছে কুমারনদে মিশেছে। টেকেরহাট হতে ৩৫ কি.মি. এগিয়ে মানিকদহে মধুমতিস্রোতের সাথে একীভূত হয়েছে। কুমারনদ

www.pathagar.com

কবিরাজপুর থেকে টেকেরহাট পর্যন্ত 'আপার কুমার' নামে পরিচিত। এটি টেকেরহাট থেকে মানিকদহ পর্যন্ত মাদারীপুর বিলরুট নামেই প্রবাহিত। কুমারনদ ফরিদপুর বিলরুটে পড়ার পর টেকেরহাটের কাছে এই রুট 'লোয়ার কুমার' নামে পরিচিত। খুলনা থেকে চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা যেতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথ ছিল। এটির গতিপথ সরল হলেও কোথাও কোথাও আছে ভাঙন প্রবণতা। উলপুর ও হরিদাসপুর ব্রিজ তৈরি হওয়ায় সড়ক যোগাযোগ অনেকটা উন্নত হয়েছে। সাতপাড়ের ব্রিজটি নির্মাণাধীন রয়েছে। বর্তমানে খালটি ড্রেজারের মাধ্যমে সু-গভীর করার প্রক্রিয়া চলছে। আড়পাড়া, তেঁতুলিয়া, কংশুর, করপাড়া, বৌলতলী, গান্ধিয়াশুর, চামটা, ভেন্নাবাড়ি, বানিয়ারচর ও জলিপাড়ে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা আছে।

মধুমতী নদী

গোপালগঞ্জ শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে এই খরস্রোতা নদীটি। নদীটির রূপ-যৌবনে ভাটি লেগেছে যারজন্য এর প্রমত্ততা মানুষের কাছে আজ গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বর্ষা মৌসুমে নদীটি অতীত দিনের একটু স্মৃতি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। দক্ষিণ বাংলায় নৌযোগাযোগের জন্য এটি ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জলরেখা। দিনে রাতে বড় বড় স্টিমার, শিপ, কার্গোসহ বিভিন্ন ধরনের জলযানে মুখরিত ছিল এই নদীটি। চলাচল করতো ব্যাপারীদের পণ্যে বোঝাই নৌকা, ঘাসি নৌকা, রাজা-জমিদারদের বজরা, পানসি, টাবুরিয়া, ডিঙ্গি, ডোঙ্গাসহ বিভিন্ন মধুময় নামের সব নৌকা। এই নদীই ছিল একসময় গোপালগঞ্জের গর্ব। নদীটির কয়েকটি শাখা নদী হলো বনকানা খাল, নবগঙ্গা খাল এবং মাচিয়াখালী খাল। এই শাখা নদীগুলো যশোর বা নড়াইল জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আবার এরই অন্য একটি শাখা বারাসিয়ার গোয়ালবাড়ি মূলস্রোত থেকে দক্ষিণে ২০ মাইল অগ্রসর হয়ে ভাটিয়া পাড়ার কাছে সেই মধুমতীতে মিশেছে। অতীতের এই প্রমত্ত মধুমতীর স্মৃতি এখনও প্রাচীনদের কাছে জাগরূক। মধুমতীর বাঁকে বাঁকে অসংখ্য কুমির সাঁতার কেটে বেড়াত। ভয়ে কেউ নদীর ধারে যেত না। বাঁশ দিয়ে বেষ্টনী তৈরি করে সেখানে মানুষ গোসল করতো। অনেকে বেষ্টনীর ভিতর থেকেও জলে নামতে ভয় পেত। পাত্রে জল তুলে তারপর গোসল করতো। আঞ্চলিক পত্রিকা 'মাসিক মধুমতী'-এর ১ম সংখ্যায় টুকুরানি চক্রবর্তী নামে এক কবি এমনই একটি চিত্র তুলে ধরেন :

ও বাড়ির বড় বউ
সাথে নাহি ছিল কেউ
কলসিটা কাঁখে নিয়ে
জলে যেই নেমেছে
টুপ করে ডুবে গেলো
কুমীরেতে খেয়েছে।

এই হলো মধুমতীর অতীত চরিত্র। বর্তমানে সেই মধুমতীর রূপ কোথাও বালুচর, কোথাও কাশফুলের ঝাড়, কোথাও বয়ে চলেছে ক্ষীণ জলধারা।

www.pathagar.com

ঘাঘর নদী

ঐতিহাসিক জনপদ কোটালীপাড়ার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে ঘাঘর নদীটি। প্রায় ষষ্ঠ শতকের দিকে এই ঘাঘর নদীকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছিল নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা। এই নদীগর্ভে অনেক পুরাকীর্তি মূল্যবান প্রত্নরাজি বিলীন হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন। কবি বিজয়গুপ্ত তার পদ্মপুরাণে এই নদীটির নাম উল্লেখ করেছেন।

বারাসিয়া নদী

রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল মুহম্মদপুর (বর্তমান মুকসুদপুর সদর)। এর প্রান্ত ছুঁইয়ে প্রবাহিত হয়েছে কল্লোলিত নদী বারাসিয়া। নদীটি এঁকে বেঁকে বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা হয়ে কাশিয়ানী উপজেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালনা ঘাটের অদূরে মধুমতীর সাথে মিলিত হয়েছে। এর কলেবরেও ভাটার টান লেগেছে। কোথাও কোথাও নদী মনে হয়, আবার কোথাও শীর্ণ হতে হতে নদীর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে।

কুমার নদ

কুমার নদটি কানাইপুরের চন্দনা থেকে বেরিয়ে একাধিক শাখা নদীতে রূপ নিয়ে চলার পথে বিভিন্ন লোকালয় ছুঁইয়ে গেছে। এর প্রধান শাখা নদী শীতলক্ষ্যা। দ্বিতীয় শাখা বালুগ্রামের কাছে ভাঙার উত্তর দিক থেকে বেরিয়ে দক্ষিণের বড় বড় বিল ডিঙিয়ে অবশেষে মিশেছে মধুমতীতে। পূর্বে ফরিদপুরের সঙ্গে গোপালগঞ্জের বাণিজ্য যোগাযোগে এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কুমারের অন্য একটি শাখা বালুগ্রামের খাল। এটিও ৩-৪টি বিল অতিক্রম করে গেছে। উৎপত্তি স্থল থেকে কুমারনদ ফরিদপুরের কাছে চরমাধবদি গ্রামের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে অম্বিকাপুরের কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। প্রথম শাখা ফরিদপুর বাখুন্ডা, রসুলপুর ও নগরকান্দার ভিতর দিয়ে ভাঙা পর্যন্ত প্রবাহিত। অপর শাখা বোয়ালমারি ও মুকসুদপুরের ভিতর দিয়ে ভাঙা পর্যন্ত প্রবাহিত। এখানে দুটি শাখা মিলিত হয়ে মাদারীপুর বিলরুটে পড়েছে। শুকনো মৌসুমে নদের উৎস মুখ শুকিয়ে গেলেও ভরা বর্ষায় মাদারীপুর বিলরুটের জল অম্বিকাপুর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।

প্রধান নদ- নদী (টুঙ্গিপাড়া): মধুমতী, শৈলদাহ, দরিয়ার গাঙ, টুংরি খাল ইত্যাদি।

প্রধান নদ-নদী (কোটালীপাড়া): বাঘদা, শৈলদাহ।

প্রধান নদ-নদী (কাশিয়ানী): মধুমতী, বারাসিয়া।

প্রধান নদ-নদী (মুকসুদপুর): পুরাতন কুমার, মাদারীপুর বিলরুট।

বর্ণির বাওড়

দেশের হাজারও নদ-নদী খাল-বিল হাওড়-বাওড়ের মধ্যে টুঙ্গীপাড়া উপজেলার বর্ণির বাওড় অন্যতম। কোনো এক সময় গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গীপাড়া ও কাশিয়ানীসহ বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল এই বর্ণির বাওড়ের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব দিকের বাঘিয়ার বিল এই বাওড়ের

www.pathagar.com

সাথে সংযুক্ত হওয়ায় এর রূপ ফুটে উঠেছিল সাগরের মতো। তখন ঘোনাপাড়া এলাকায় মধুমতী নদীর সাথে বাওড়টির প্রাকৃতিক একটি সংযোগ স্রোতধারা ছিল। এলাকার কিছু প্রবীণ ব্যক্তি এখনও একে সুতিয়া নদী নামে জানে। কালক্রমে সেই সংযোগ রেখাটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় বাওড়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। প্রাচীনেরা আজও বিশাল বিশাল মাছের কথা বলে থাকেন। সেসব আজ রূপ কথার মতো মনে হয়। চতুর্দিকে একটু একটু ভরাট করে চাষের আওতায় আনায় বাওড়ের নৈসর্গিক দৃশ্যে ভাটি লেগেছে। তারপরেও শীর্ণদেহে দর্শনার্থীদের মন কাড়বে।

চাঁন্দার বিল

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা ও মুকসুদপুর উপজেলার সঙ্গম স্থলে চাঁন্দার বিল অবস্থিত। উত্তরে টোংরাইল ও নয়াকান্দি, পশ্চিমে বেদগ্রাম, দক্ষিণে সানপুকুরিয়া। পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব ৬ কি.মি., উত্তর-দক্ষিণের দূরত্ব ৭ কি.মি.। বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল কাব্যের নায়ক চাঁদ সওদাগর। বনিক চাঁদ সওদাগর মধুকরী সপ্তডিঙ্গা নিয়ে দেশ-বিদেশ বাণিজ্য করে বেড়াতেন। তখন জলপথের জন্য এই জনপদটি ছিল সুন্দর ও সাবলীল। এর ওপর দিয়ে পণ্য বোঝাই ডিঙ্গা নিয়ে যাতায়াত করতেন চাঁদবেনে। এক সময় ঝড়ের কবলে তাঁর সপ্তডিঙ্গা ডুবে যায় এই বিলে। সেই থেকে চাঁদবেনের স্মৃতিতে বিলের নামকরণ করা হয় চাঁন্দার বিল। বিলের চতুর্পার্শ্বে ফসলি জমি জেগে উঠছে। দু'একটি বাড়িও তৈরি হচ্ছে। তবুও ভরা বর্ষায় এই বিলে নৌকা ভাসালে চমকে উঠতে হয়।

এছাড়া বাঘিয়ার বিল (কোটালীপাড়া), মোল্লাকান্দির বিল, রাউৎখামারের বিল, পিঠা বাড়ির বিল, চন্দ্রদিঘলিয়ার বিল (গোপালগঞ্জ) এবং বাওড়ের মধ্যে বর্ণির বাওড় (টুঙ্গীপাড়া) উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক খানারপাড় (গোপালগঞ্জ-কোটালীপাড়া সড়কের কাঠি বাজারের পাশাপাশি) দিঘিকে নিয়ে আছে অনেক কিচ্ছা-কাহিনি ও কিংবদন্তি। যেমন পূর্ণিমার রাত ছাড়াও গভীর রাতে সোনার নাও পবনের বৈঠা বিভিন্ন ধরনের বাজনা বাজিয়ে দিঘি প্রদক্ষিণ করতো। প্রাচীনেরা ওই দিঘির ঘাটে গিয়ে পূজা দিত। সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করার জন্য থালা বাসনা চাওয়া হতো। পরের দিন প্রভাতে দেখা যেত কাঙ্ক্ষিত বস্তু দিঘির ঘাটে সাজানো গোছানো রয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে গুণে গুণে পাত্রগুলো ফেরত দেওয়া হতো। এইভাবে বংশ পরম্পরায় বহুদিন চলছিল। এরকম এক অনুষ্ঠানে এক গৃহস্বামী একটা সোনার নেমকদানি লুকিয়ে রেখেছিল। এরপর থেকে উক্ত দিঘির কাছে কেউ কোনো বস্তুর প্রার্থনা করে আর পায়নি। খানারপাড় থেকে প্রায় ১৮/১৯ কিলোমিটার পূর্বে কোটালীপাড়ায় সিদ্ধান্তবাড়ির ঐতিহাসিক দিঘি আছে। দিঘিকে নিয়েও আছে এরকম কিংবদন্তি। এ ছাড়া রয়েছে কামনা সাগর, বারুণী সাগর (ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়ি) অনন্যচন্দ্রের ঘাট (গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা কমপ্লেক্স দিঘিতে ১৯৫৮ সালে এ দিঘিটি নির্মাণ করা হয়) প্রভৃতি।

ঘ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ও অন্যান্য

প্রাচীন জনপদ

বাংলাদেশে যেসব অঞ্চলে পুরাকীর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে তারমধ্যে মহাস্থানগড়, বিক্রমপুর, উয়ারী বটেশ্বরী, ফরিদপুর ও কোটালীপাড়া উল্লেখযোগ্য। এসবের

www.pathagar.com

গোপালগঞ্জ জেলায় কোটালীপাড়ার 'চন্দ্রবর্মন কোট' দুর্গটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেতে পারে। কোটালীপাড়ায় যে বহুপূর্বে নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা সেখানকার বেশ কয়েকটি প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনে ফুটে উঠেছে। এখানে ষষ্ঠ শতকে প্রাপ্ত একটি লিপিতে 'চন্দ্রবর্মন কোট' বলে একটি দুর্গের আছে যা কিনা সামরিক প্রয়োজনে নির্মিত হয়েছিল। ধর্মাদিত্যের রাজত্বকালে এখানে একটি শহর গড়ে উঠেছিল বলে অনেক গবেষক মনে করে থাকেন। কোট বা দুর্গ হতে কোটালীপাড়া নামের উৎপত্তি বলে অনেকের বিশ্বাস। এটি এই জনপদের একটি প্রধান আকর্ষণ। দুর্গটির উচ্চতা ১৫ হতে ৩০ ফুট। দৈর্ঘ্য প্রস্থে আড়াই মাইল। পূর্ববঙ্গে বৃহত্তর দুর্গ বলে এটি পরিচিত। দুর্গটির অল্প দক্ষিণে গুয়াখোলা গ্রামে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও স্কন্ধগুপ্তের সময়ের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। দুর্গটির অল্প দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ১৯৯৮ সালে ঘাঘরহাটি গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে 'ঘাঘরহাটি তাম্রপাত্র'। তাছাড়া সোনাকান্দুরি মাঠের মধ্যে গুপ্ত সম্রাটদের নামাঙ্কিত 'সুবর্ণ মুদ্রা' পাওয়া গেছে। কোটালীপাড়া থেকে এক মাইল পূর্বে পাওয়া গেছে ঘাঘর নামে জনৈক এক অজ্ঞাত রাজার একটি স্বর্ণমুদ্রা। দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিম সীমানা সংলগ্ন পিঞ্জুরী গ্রামের কাছে মদনপাড়া গ্রামে সেন রাজবংশীয় বিশ্বরূপের তাম্রপাত্রে সম্পাদিত এক দানপত্র পাওয়া যায়। এরই আলোকে বলা যায় গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় কোনো এক সময় এই বিস্তীর্ণ জনপদের রাজকার্য সম্পাদিত হতো।

একসময় এই কোটালীপাড়াকে বলা হতো ভারতের দ্বিতীয় 'নৈমিষারণ্য'। এই এলাকাটি ছিল তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ভাটপাড়া ও নবদ্বীপ পূর্ববঙ্গে তেমনি বিক্রমপুর ও কোটালীপাড়া। তন্মধ্যে কোটালীপাড়া সমধিক প্রসিদ্ধ। ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে বাংলাদেশকে সুস্পষ্ট চার ভাগে ভাগ করা যায়। পশ্চিমে সুবৃহৎ অংশ হলো পুরাভূমি। পূর্ববাংলা নবভূমি। এটি পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও মেঘনা দ্বারা সৃষ্ট। বাকি প্রায় সমস্ত অঞ্চল জলীয় সমতল ভূমি বা নবগঠিত ভূমি, এতে আবার দুটি অংশ সুস্পষ্ট। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের গঠন পুরাতন, এবং খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও সমতল চট্টগ্রাম নতুন। প্রায় খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়ার নাম ছিল 'নব্যাবকাশিকা'। নদ-নদী দ্বারা ভাঙা গড়ার ইতিহাস এ অঞ্চলের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চলটি কখনও জলাময় আবার কখনও নদীগর্ভে। তাই কোটালীপাড়ার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা দুষ্কর। কোটালীপাড়ার নামকরণ কবে থেকে প্রচলন হয়েছে তাও সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। এখানে ষষ্ঠ শতকে প্রাপ্ত একটি লিপিতে চন্দ্রবর্মন কোট বলে একটি দুর্গের উল্লেখ আছে। সামরিক প্রয়োজনে এই দুর্গটি গড়ে উঠেছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। সেই কোট হতে কোটালীপাড়া নাম করণ হতে পারে বলে অনেকে ধারণা করেন। (কোট = দুর্গ, আলি = শ্রেণি, পাড়া = তৎসংলগ্ন জমিতে বসতি বা লোকালয়)। কোটালীপাড়া নামকরণ সম্পর্কে বেদগ্রামের মাঈনউদ্দীন যে মতামত দিয়েছেন তা এরকম – 'পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ আকবর ও শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে সংঘটিত হয়। আকবরের অভিভাবক ছিলেন বৈরাম খাঁ। এ যুদ্ধে মোগলরা জয়লাভ করে। সেই থেকে ভারতবর্ষে মোগলদের ভিত পাকাপোক্ত হয়। পরাজিত পাঠানরা মোগলদের ভয়ে ভীত হয়ে দলে দলে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। পাঠানদের বড়

www.pathagar.com

একটি দল উত্তরবঙ্গে যমুনা নদীর তীরে বসতি গড়ে তোলে। সেখান থেকে তারা নিজেদেরকে বিশ গাঁ পাঠান বলে পরিচয় দিত। বাকি আরেকটি ক্ষুদ্র দল পালাতে পালাতে পূর্ব দিকে এমন এক স্থানে আশ্রয় নেয় যেখানে জনমানবের খুবই কম সাড়া মিলতো। যেহেতু তারা যুদ্ধ বিগ্রহ করে পরাজয় বরণ করেছে সেহেতু তাদের কাছে ছিল অস্ত্র। সব সময় তো অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ান সম্ভব নয়। তাই তারা একটি অস্ত্রাগার তৈরি করে সেখানে অস্ত্র রাখার ব্যবস্থা করে। অস্ত্রাগারকে ফার্সি ভাষায় কোত বলে। বিতাড়িত পাঠানরা স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে থাকে। তারা জলের চাহিদা মিটানোর জন্য বড় দিঘি খনন করে। তার একধারে কোত বা অস্ত্রাগার তৈরি করল। দিঘির উঁচু কিনারকে পাড় বা আইল বলা হয়। কোত, আইল এবং পাড় শব্দত্রয় কোতাইলপাড়ে রূপ নিল। তা কালক্রমে কোটালীপাড়া হিসেবে পরিগণিত হয়।

কোটালীপাড়ার দুর্গটি পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম দুর্গ বলে চিহ্নিত। ইংরেজ আমলে গোপালগঞ্জের এই কোটালীপাড়াটি কখনও খুলনা জেলার সহিত, কখনও বরিশালের সহিত, আবার কখনও ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোটালীপাড়ার 'চন্দ্রবর্মণকোট' ইতিবৃত্তের দৃষ্টিকোণে খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক এতে খুঁজে পেয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে, 'দুর্গটি চন্দ্রবর্মণের এই রূপ উল্লেখটি সমাচারদেবের তাম্রপত্রের সহিত শেষ যোগসূত্র। এই চন্দ্রবর্মন কে ছিলেন? যিনি কোটালীপাড়া দুর্গের জন্য সমাচারদেবের সময় পর্যন্ত স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন? এই দুর্গটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে আড়াই মাইল। ইহা বাংলাদেশের বৃহত্তম মৃত্তিকা-নির্মিত দুর্গ বলে পরিচিত। 'মহাস্থান' দুর্গটি আকারে ইহার পরবর্তী স্থান পাইতে পারে। ইহার আয়তন মাত্র ১০০০-১৫০০ গজ। এই মহাপরাক্রমশালী চন্দ্রবর্মন কে ছিলেন–যিনি নিম্নভূমিতে এই রিবাট দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন–যাহার প্রাঙ্গণ হইতে গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রাগুলো ক্রমশ আবিষ্কৃত হইতেছে? ইহা আমাদের 'মেহারুল' স্তম্ভে খোদিত চন্দ্রের কথা তৎক্ষণাৎ মনে করাইয়া দেয় যে, চন্দ্র তাহার সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যাহারা তাহার তরবারি দ্বারা তাহার যশ ঘোষিত করিয়াছিল। এই লিপির প্রাচীনত্ব সমন্ধে Fleet জোর দিয়াছেন, অথচ তাহার কোনো তারিখ দেন নাই এবং Allan তাহার স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির সহিত এই চন্দ্রই যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত–এই মতবাদটি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অবশেষে মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদশাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, 'সুসুনিয়া পর্বতে খোদিত পুষ্করণ-এর সিংহ বর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মণই এই চন্দ্র–যে চন্দ্রবর্মণকে সমুদ্রগুপ্ত চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দের তৃতীয় দশকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করেন। যখন আমরা দেখি যে, প্রাচীনবঙ্গের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এক বিরাট দুর্গের আকারে এক অপরূপ স্মৃতিসৌধ এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতেও চন্দ্রবর্মার নাম হইতে উল্লেখিত হইয়াছে–তখন আমরা সেই বিদ্বান ব্যক্তিদের মতবাদ বিশ্বাস করিতে পারি। তাহারা বলিয়াছেন যে, 'মেহারুল' স্তম্ভে নামাঙ্কিত চন্দ্র এবং চন্দ্র একই ব্যক্তি। চন্দ্রবর্মার বঙ্গদেশে আগমন এবং তাহার এই দুর্গের আরম্ভের তারিখ মোটামুটিভাবে ৩১৫ খ্রিষ্টাব্দ বলা যায়।

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়–এই নিম্ন এবং জলাভূমিতে এই বিরাট দুর্গ কিরূপে নির্মাণ হইল? ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই প্রশ্নটি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার একটি ব্যাখাও দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বর্তমানে কোটালীপাড়া বহু মাইল বিস্তৃত জলাভূমি দ্বারা বেষ্টিত; কিন্তু ইহা চিন্তা করা যায় না যে, একজন স্থির মস্তিষ্ক মানুষ এইরূপ স্থানে রাজপ্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা করিবেন; কিন্তু এই বৃহদাকার দুর্গটি সেখানে রহিয়াছে এবং এই জলাভূমিতে প্রায়ই ইস্টক নির্মিত গৃহাদির ধ্বংসাবশেষও পাওয়া যাইতেছে। Pargiter এবং অন্যান্যরা অনুমান করিতেছেন–এই নিম্ন জলাভূমি ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। এই ভূমিকম্পের সময় সম্বন্ধে অনুমান করা যায় যে, ধর্মাদিত্যের রাজত্বকালে একটি নতুন শহর গড়িয়া উঠিতেছিল; কিন্তু ইহা তাহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয় না। লেখক এখানে 'ঘাঘরহাটি' তাম্রপত্রে উল্লেখিত 'নব্যকশিক' অথবা প্রাদেশিক রাজধানীর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি অনুমানে ধর্মাদিত্যের একটি সময় নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, ধর্মাদিত্যের রাজত্বের পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষে একটি ভূমিকম্প হয়। বিগত আড়াই শতাব্দীর রাজ পরিবারের বাসস্থানের চতুর্দিক জলাভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল এবং শাসন দপ্তরের প্রধান বিভাগগুলো অন্যান্য নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইল। কোটালীপাড়া অবশ্য 'ডিস্ট্রিক্ট' হেড কোয়ার্টস হিসেবেই রহিল; কিন্তু ইহার জমির মূল্য এইরূপ কমিয়া গেলো যে, প্রায় সমগ্র গ্রামটি এক ব্রাহ্মণকে দান করা হইল। সমাচারদেবের তাম্রপত্রে এই গ্রাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এই গ্রামে নিম্ন জলাভূমি আছে।'

বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ

জাতির পিতার কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা অনেক পূর্ব থেকেই জাতির পিতার সমাধিস্থল সংস্কারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যে স্থানে বঙ্গবন্ধুর স্নেহশীল পিতা মরহুম শেখ লুৎফর রহমান ও রত্নগর্ভা মাতা মরহুমা সায়রা খাতুন-এর সমাধিস্থল তার পাশেই বঙ্গবন্ধুকে সমাহিত করা হয়। পূর্বে অযত্ন ও অবহেলার এক নিদর্শন ছিল এ স্থানটি। এ স্থানেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমাধিসৌধ গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর একক উদ্যোগে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ট্রাস্ট'। ট্রাস্টের মাধ্যমে ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া এ সময় টুঙ্গীপাড়ায় সমাধিস্থলে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থানে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে উল্লিখিত প্রকল্পগুলো প্রথমে সম্পূর্ণ বেসরকারি পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৮ সালে এ পরিকল্পনাগুলো প্রথমবারের মতো সরকারি ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৮ সালের ২৫ নভেম্বর 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাধিসৌধ' নামে একটি বিশেষ প্রকল্প 'একনেক' (ECNEC)-এ অনুমোদিত হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্প

www.pathagar.com

বাস্তবায়নকালে টুঙ্গীপাড়ার শান্ত, সমাহিত প্রকৃতি ও পরিবেশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

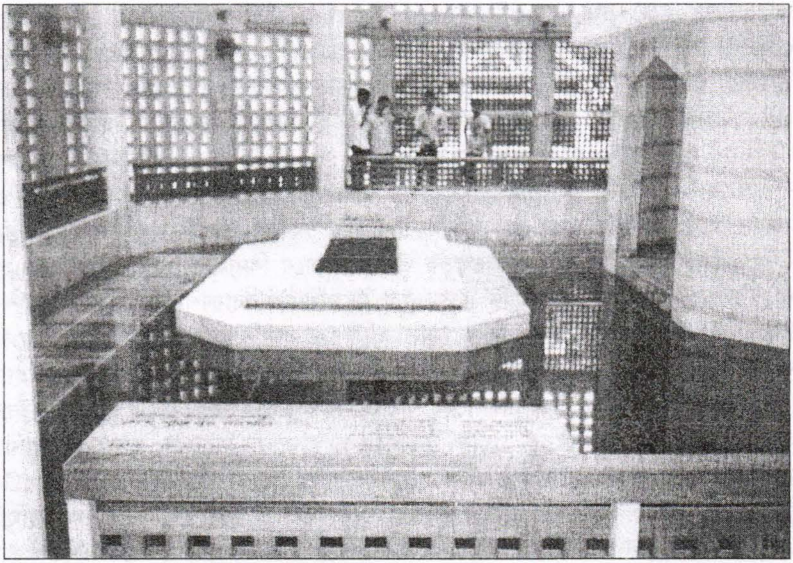

বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯৯ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মদিনে এই প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নকালে টুঙ্গীপাড়ার শোভাময়, শাশ্বত গ্রামীণ পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে কোনো জমকালো, উঁচু ইমারত গড়া হয়নি। সাধারণ মানুষ যেন স্বাচ্ছন্দ্যে নির্বিঘ্নে ঘুরে ফিরে সমাধি কমপ্লেক্স এলাকা দেখতে পারে তার দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া শব্দ দূষণ থেকে সমাধিস্থলকে মুক্ত রাখার জন্য পূর্বের খাল বরাবর গ্রামীণ রাস্তার পরিবর্তে টুঙ্গীপাড়া উপজেলা থেকে পাটগাতী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি বিকল্প রাস্তা নির্মাণ করা হয়।

সমাধিসৌধটি নির্মাণের জন্য সর্বমোট ৩৮.৩০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ১৭১১.৮৮ লক্ষ টাকা। ঠিকাচুক্তি অনুযায়ী এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৯৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। তফসিল মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২০০১ সালের ১৭ মার্চ।

সমাধিসৌধটি দুটি সমাবেশ অঙ্গন সমন্বয়ে বিন্যস্ত। এর একটি প্রার্থনা ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। আর অন্যটি জনসমাবেশ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। এ দুটি এলাকাকে একটি সংযোগ সড়ক দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। সংযোগ সড়কের দু'পাশে

www.pathagar.com

আবহমান গ্রামীণ পরিবেশ বজায় রাখা হয়। এমনকি পুরোনো বাড়ি ও হিজলগাছ এখনও সেখানে দৃশ্যমান।

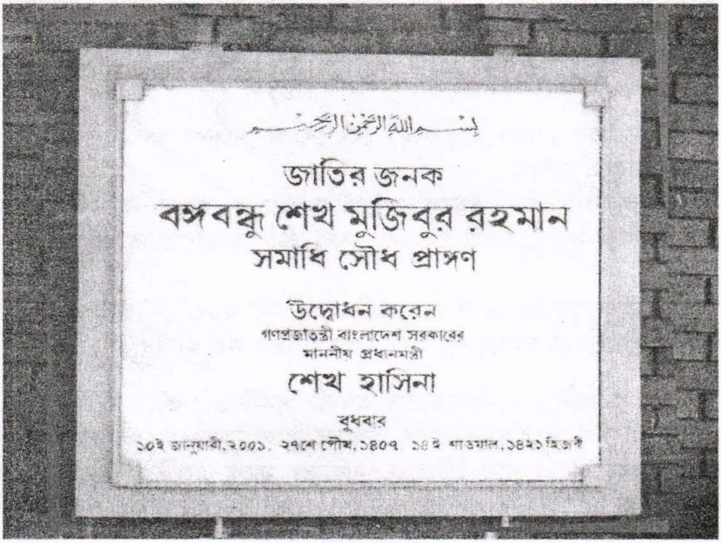

বঙ্গবন্ধুর সমাধির স্মৃতিফলক

(ক) সমাধিসৌধ অঙ্গন : মূল সমাধিকে মাঝখানে রেখে সমাধিসৌধ প্রাঙ্গণটি নিম্নোক্তভাবে নির্মাণ করা হয় :

১. বঙ্গবন্ধু ও তাঁর বাবা-মায়ের সমাধি সমন্বয়ে মূল সমাধিসৌধ।

২. মূল সমাধিসৌধ ঘিরে উন্মুক্ত চত্বর। এখানে একসঙ্গে শত শত লোক একত্র হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবেন।

৩. উন্মুক্ত চত্বরের চারদিক ঘিরে প্রাচীর এবং আগত দর্শনার্থীদের জন্য প্রার্থনা ও বিশ্রামের নিমিত্ত প্রাচীর-সংলগ্ন ছাউনি।

৪. দ্বিতল-বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন। এর প্রথম তলায় দর্শনার্থীদের বিশ্রাম স্থান। দ্বিতীয় তলায় সমাধি কমপ্লেক্সের অফিস।

৫. দ্বিতল বঙ্গবন্ধু ভবন। মূলত যা এখন বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়েছে।

(খ) জনসমাবেশ অঙ্গন : এ অঙ্গনটি নিম্নে বর্ণিত কাঠামোসমূহের সমন্বয়ে গঠিত–

১. সমগ্র অঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত প্রধান ফটক। এটি জনসমাবেশ অঙ্গনের মধ্য দিয়ে সমাধিসৌধ অঙ্গনে যাওয়ার জন্য প্রধান প্রবেশ পথ।

২. সমাধিসৌধ অঙ্গনের সকল তথ্য সম্বলিত একটি তথ্য কেন্দ্র। এর পাশে আছে একটি গার্ডরুম। যা পুরো এলাকার নিরাপত্তা প্রহরীদের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

www.pathagar.com

৩. একটি স্যুভেনির কর্নার। যেখানে দর্শনার্থীদের জন্য দেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন রাখা হয়েছে।

৪. প্রসাধনী ও সাজসজ্জা সম্বলিত একটি উন্মুক্ত মঞ্চ (Amphi Theatre)।-এর গ্যালারিতে প্রায় ৪০০ লোকের স্থান সংকুলান হচ্ছে।

৫. একটি গবেষণা কেন্দ্র। যা একটি পাঠাগার এবং একটি অস্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষ নিয়ে গঠিত।

৬. একটি মসজিদ (পাকা প্রাঙ্গণসহ) যেখানে আনুমানিক ৭০০ লোক এক সঙ্গে নামাজ পড়তে পারেন।

৭. একটি ক্যাফেটেরিয়া। এখানে দর্শনার্থীরা তাদের আহারাদির সুবিধা পাবেন। ক্যাফেটেরিয়া-সংলগ্ন একটি প্রসাধনী কক্ষ। এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

৮. জনসমাবেশ অঙ্গনের মাঝখানে একটি ২০০ ফুট ২০০ ফুট উন্মুক্ত চত্বর। এটি বৃহৎ আকারের জনসমাবেশের জন্য এখন ব্যবহার করা হয়।

(গ) অন্যান্য সুবিধাদি : ১. সমাধিসৌধ অঙ্গনটি একটি ৪০ ফুট প্রস্থ এবং ৬০০ ফুট দীর্ঘ পায়ে হাঁটাপথ দ্বারা জনসমাবেশ অঙ্গনের সঙ্গে সংযুক্ত। হাঁটাপথটি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ পথে হাঁটলে দর্শনার্থীদের মাঝে একটি ছায়া-সুনিবিড় গ্রামীণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে হাঁটার অনুভূতি জাগে। ২. মূল ফটকের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে ৭০টি গাড়ি রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

এ দৃষ্টিনন্দন সমাধিসৌধের মূল পরিকল্পনাবিদ ও কাণ্ডারি ছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি জানতেন। জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত এসব কিছুর মূল অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনার ধ্রুবতারা ছিলেন তিনি। বস্তুত তার দৃঢ় প্রত্যয় ও সুদূরপ্রসারী স্বপ্নের কারণেই আজ আমরা বাঙালি জাতির বীরত্ব-গাঁথার অনন্য প্রতীক হিসেবে এই সমাধিসৌধের বাস্তবায়ন দেখেছি। সমাধিসৌধকে কেন্দ্র করে জাতির পিতার অনন্য জীবন ও ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরার একটি অসামান্য আবহ তৈরি করা হয়েছে।

এ সমাধিসৌধ বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দেশপ্রেমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ সমাধিসৌধ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আশা, সাহস ও চিরন্তন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

এ প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষক কর্তৃপক্ষ (Sponsor) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল (অব.) হাফিজ মল্লিকের নেতৃত্বে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার্স সার্ভিসেস। এ প্রকল্পের উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান ভিত্তি স্থপতি বৃন্দ লি.। প্রধান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান প্রজেক্ট বিল্ডার্স লি.-সহ আরও ছয়টি প্রতিষ্ঠান। জমি অধিগ্রহণের দায়িত্ব পালন করে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সের উদ্বোধনি অনুষ্ঠান হয় ১০ জানুয়ারি ২০০১ সালে। উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন

www.pathagar.com

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সুন্দর পৃথিবীতে মহান স্রষ্টা প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য। মহান আল্লাহ তার অশেষ অনুগ্রহ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আমাদের উপহার দিয়েছেন। টুঙ্গীপাড়ার এক টগবগে, দীর্ঘদেহী, দুরন্ত বালককে দিয়ে স্রষ্টা তার পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন এটাই অতি স্বাভাবিক।

১০ জানুয়ারি ২০০১ সালে সমাধিসৌধের এম্পিথিয়েটারে উদ্বোধনি অনুষ্ঠান হয়। সেদিন টুঙ্গীপাড়ার সুনীল আকাশ ছিল এ অনুষ্ঠান দেখার জন্য আনত। সজল মাটি ও সবুজ প্রকৃতিতে তখন পিন-পতন নীরবতা। অতিথিরা সকলে আসন গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক একজন কবির অবিনাশী পঙ্‌ক্তি বলে অনুষ্ঠান শুরু করলেন :

'এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান;
তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি
চোখে নীলাকাশ বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র এক জায়গায় লিখেছেন তিনি একবার আগ্রার সেকেন্দ্রায় চিরনিদ্রায় শায়িত সম্রাট আকবরের সমাধি দেখতে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, 'এই সমাধিস্থান তিনি নিজেই ঠিক করে গিয়েছিলেন। দিল্লি থেকে শুরু করে অনেক রাজা-বাদশার সমাধি আমি দেখেছি, কিন্তু সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধির ভাবগম্ভীর ও সাদাসিধে পরিবেশটা আমার ভালো লেগেছিল। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে অনেক রকমের গাছপালায় ভরা, ফল ও ফুলের গাছ। সমাধিটা সাদা পাথরের তৈরি।'
এ জগৎ বিচিত্র ও রহস্যময়। বাদশাহ আকবরের সমাধির ভাব গম্ভীর ও সাদাসিধে পরিবেশ দেখে বঙ্গবন্ধু মুগ্ধ হয়েছিলেন। শাহাদাতের অমরলোক থেকে বঙ্গবন্ধুও দেখবেন তার সুযোগ্য কন্যা পিতার জন্য যে সমাধি করেছেন তার সামগ্রিক পরিবেশটি ভাবগম্ভীর ও সাদাসিধে। সমস্ত অঙ্গন জুড়ে নানা রকমের গাছপালা ও ফল-ফুলের মেলা। আর সাদা পাথরে বাঙালি জাতির অশ্রুজল।

কোর্ট মসজিদ

জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে কোর্ট মসজিদ অবস্থিত। ১৯৮৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর খাজা নাজিমউদ্দিন মসজিদটির শুভ উদ্বোধন করেন। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক কাজী গোলাম আহাদের উদ্যোগে মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদটিতে আছে সুউচ্চ একটি মিনার। আরও আছে বৃহৎ আকারের প্রবেশ গেটসহ একটি সুদৃশ্য বড় গম্বুজ ও দুটি ছোট গম্বুজ।

বঙ্গবন্ধুর সমাধির স্মৃতিফলক জেলা শহরে সার্বজনীন কালীমন্দিরটি অবস্থিত। স্থাপিত ১৯১৮ সালে। নব্বই দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত কালীপূজা উপলক্ষে একমাসব্যাপী মেলা হতো। এই ঐতিহাসিক মেলাটি এখন আর হয় না। সার্কাস ও যাত্রাগান ছিল মেলাটির প্রধান আকর্ষণ। প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান ধীরেন্দ্রনাথ বাগচীর যাত্রার দল ছিল তার মধ্যে অন্যতম। মন্দিরটিতে অন্যান্য দেব-দেবীর বিগ্রহও রক্ষিত আছে। গোপালগঞ্জ জেলায় এটি কেন্দ্রীয় মন্দিরের মর্যাদা লাভ করেছে।

www.pathagar.com

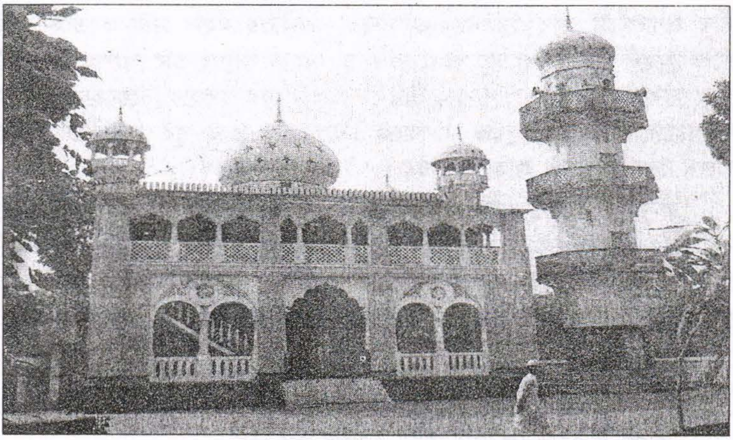

কোর্ট মসজিদ, গোপালগঞ্জ

থানাপাড়া মসজিদ

থানাপাড়া মসজিদটি জেলা শহরের প্রথম মসজিদ। খেলাফত আন্দোলন, অসযোগ আন্দোলন ও '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এই মসজিদটি ছিল অত্র এলাকার মুসলমানদের একটি মিলন কেন্দ্র। মিছিল শেষে শত শত মুসলমান এই মসজিদটিতে সমবেত হতেন। বক্তৃতা ও অনুষ্ঠান শেষে মাটির গ্লাসে ঘোল ও চিনির সরবত দিয়ে প্রত্যেককে আপ্যায়ন করা হতো।

মাতৃতীর্থ

১৩৭১ বঙ্গাব্দে মাতৃভক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস মায়ের স্মৃতিচারণে 'মাতৃতীর্থ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার নিজ গ্রাম গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার করপাড়ায় এটি অবস্থিত। প্রতিবছর ২২, ২৩ ও ২৪শে পৌষ সেখানে কবিগান হয়। কবিগানের অনুষ্ঠানে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান ভক্ত যোগদান করে পিতামাতাকে শ্রদ্ধাভক্তি করার শিক্ষা পেয়ে থাকে। এই আসরেই বাউল কবি বিজয় সরকারকে চারণ কবি সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত সাম্প্রতিক কালের একজন প্রখ্যাত চারণ কবি ও লেখক নিশিকান্ত সরকার, সাং-আট্টাকি, উপজেলা-ফকিরহাই, জেলা-বাগেরহাট। তিনি জানান, 'দেশ বিদেশ বিভিন্ন জায়গায় কবিগান গেয়ে বেড়াই। কিন্তু করপাড়ার এই 'মাতৃতীর্থ' আসরের মতো আর হয় না। কারণ এই মাতৃতীর্থে পড়েছে মহামানব ও অধ্যাত্মবাদী চারণ কবিদের পদরেণু। সর্বোপরি এটা যে একজন মাতৃভক্ত সন্তানের রচিত আসর। একি মন্দ হতে পারে? আমি আসরটিতে প্রায় ৩৮ বছর কবিগান গেয়ে যাচ্ছি। আমিও গর্বিত। এই 'মাতৃতীর্থ' কবিগানের আসরটি এলাকাবাসীর কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার প্রতীক হয়ে থাকবে।'

www.pathagar.com

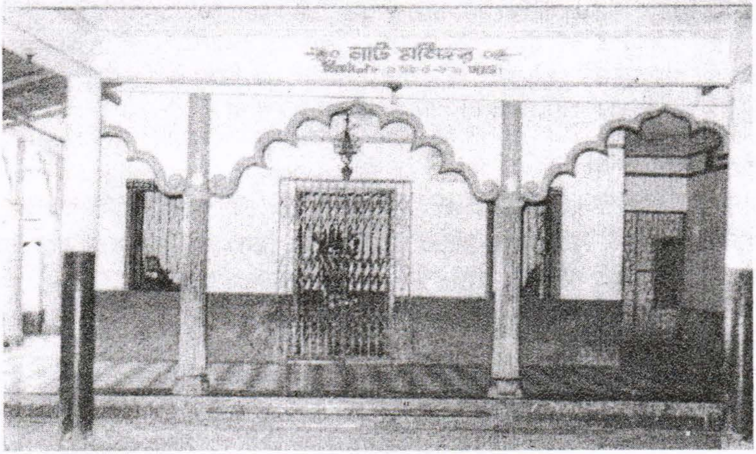

কেন্দ্রীয় সার্বজনীন কালীমন্দির, গোপালগঞ্জ

বানিয়ারচর ক্যাথলিক চার্চ

গোপালগঞ্জ জেলায় দু'টি বিখ্যাত চার্চ রয়েছে। একটি মুকসুদপুর উপজেলা বানিয়ার চরে। অপরটি কোটালীপাড়া উপজেলায় নারিকেল বাড়িতে। চার্চ দুটিতে যথারীতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও জনসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বানিয়ারচরের ক্যাথলিক চার্চ

'১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে ফাদার তাবেজ্জা সর্বপ্রথম গোয়ালন্দ থেকে বানিয়ার চরে আসেন। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকটি পরিবার ক্যাথলিক মণ্ডলীভুক্ত হয়। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র পরিত্রাতার গির্জা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে জেভিরিয়ান ফাদারগণ ধর্মপল্লির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ফাদার মারিও ভেরোনেসি সেন্ট মাইকেল জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান গির্জার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ২০০১

www.pathagar.com

খ্রিষ্টাব্দে ৩ জুন রবিবার দিন পবিত্র আত্মার পর্ব দিনে খ্রিস্টযোগ চলাকালীন সময়ে বোমা বিস্ফোরণে ১০ জন খ্রিস্টান ভক্তের মৃত্যু হয়। এখানে উপধর্ম পল্লির সংখ্যা রয়েছে ৫টি। কর্মরত ধর্ম সংঘ এসএমআরএ। শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেন্ট মাইকেল জুনিয়র হাইস্কুল, ছেলেদের হোস্টেল ও ডিসপেন্সারি উল্লেখযোগ্য।' চার্চের বর্তমান ফাদার জন গোপাল বিশ্বাস ও ফাদার কমল খাঁ।

সিদ্ধান্ত বাড়ি শিবমন্দির

কোটালীপাড়া উপজেলায় সিদ্ধান্ত বাড়ি নামক স্থানে এই শিবমন্দিরটি অবস্থিত। লোকদের কাছে এটি 'বুড়া ঠাকুর' মন্দির নামে পরিচিত ছিল। প্রায় দু'শ বছর ধরে চৈত্র মাসের ২৯ তারিখে এখানে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা বসে আসছে।

'৭১-এর বধ্যভূমি

মহান মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জের রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান। অগণিত মানুষ প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করে গেছে তাদের বীরগাথা। হানাদার বাহিনী গোপালগঞ্জে তৎকালীন থানা পরিষদে (সিও অফিসে) তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। এটি ক্যান্টনমেন্ট নামে পরিচিত ছিল। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে এনে তারা এখানে হত্যা করত। সেই ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন পুকুরের পাড় ছিল তাদের কসাইখানা। পুকুরটি বাংলা পুকুর নামে পরিচিত। নাম জানা-অজানা বহু মুক্তিযোদ্ধার গণকবর রয়েছে পুকুরটির আশে-পাশে। পরবর্তীকালে পুকুরটি ভরাট করে শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়েছে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। গোপালগঞ্জ জেলার এটিই '৭১-এর বধ্যভূমি।

'৭১-এর বধ্যভূমি, গোপালগঞ্জ

অন্যান্য প্রাচীন নিদর্শন : গোপালগঞ্জের অন্যান্য প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে কোটালীপাড়া চন্দ্রভর্মা কোট (কোটাল দুর্গ), দক্ষিণা কালীবাড়ি, বহলতলী মসজিদ, মথুরানাথ এজি চার্চ, ধর্ম রায়ের বাড়ি, ওড়াকান্দি শ্রীহরি মন্দির আড়ুয়াকংশুর কালী মন্দির, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

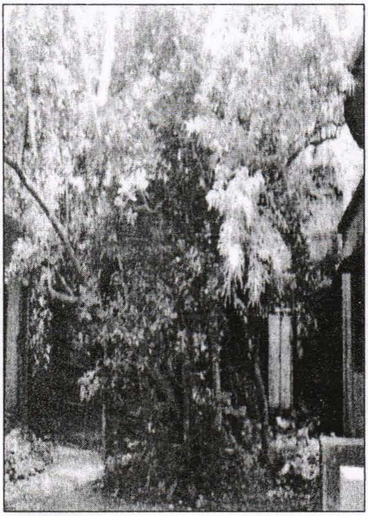

কোটালীপাড়ার প্রাচীন নিদর্শন, পশ্চিমপাড়া

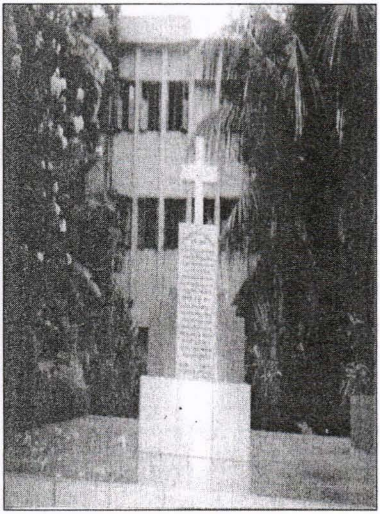

মথুরানাথ এজি চার্চ

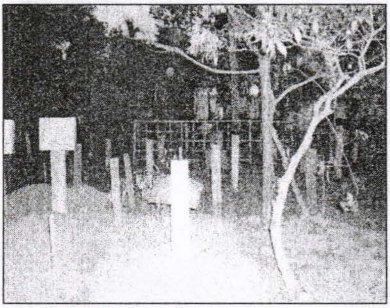

থানাপাড়া কবর স্থান

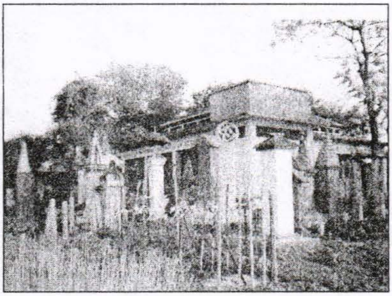

পৌরসভা শ্মশান গোপালগঞ্জ

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি : ঘাঘর নদীর তীরে মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে বাংলার সুলতান নুসরত শাহর যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে এ অঞ্চলে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ হয়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কোটালীপাড়ার বান্দাবাড়ি গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস শহিদ হন। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে শহিদ হন জলিরপাড় গ্রামের মহানন্দ বিশ্বাস।

মনসা মন্দির

কোটালীপাড়ার সবচেয়ে বড় মনসা মন্দিরটি গচাপাড়া গ্রামে। গ্রামের মাঝখানে প্রায় ৩০০ বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল মনসা মন্দির। কালের আবর্তে মন্দিরটি একাত্তর সালে

www.pathagar.com

প্রায় ধ্বংস হয়ে পড়ে। সাতচল্লিশে উপমহাদেশ বিভক্তির সময়ে ধনী হিন্দু পরিবারগুলো কলকাতায় চলে যাবার কারণে মন্দিরটি শ্রীহীন হয়ে পড়ে। পুরোনো ইটের তৈরি মন্দিরটি তখন কেউই মেরামতের জন্য এগিয়ে আসেনি। তবুও ক্ষয়ে যাওয়া মন্দিরটিতে প্রতি বছর সর্পদেবী মনসার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উপলক্ষে সেকালে দেবীর নামে ওই স্থানটিতে বসতো মনসা মেলা। এই মেলায় হিন্দুরা ছাড়াও অন্যধর্মের লোকেরা আসতো। অনেকে মনসা দেবীকে তুষ্ট রাখার জন্য ঘট ভরে দুধ-কলা নিয়ে আসতো। মনসার শক্তি সাপ। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি বহুল প্রচারিত থাকায়, সাধারণত সাপের ভয়ে মনসাকে দুধ-কলা দিয়ে খুশি রাখার ব্যবস্থা করতো। মনসা পূজা উপলক্ষে মন্দিরের সামনে আটচালা টিনের ঘরে অনুষ্ঠিত হতো বেহুলা-লখিন্দরের পালা। সাতটি পালা সাত রাতে শেষ হতো। পুরোনো মন্দিরটি ছিল বেশ বড়। কিন্তু বেশ ক'বছর আগে এটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে পড়েছে। বর্তমানে এই মন্দিরটির পশ্চিম পাশেই একটি আধাপাকা ঘরে স্থাপন করা হয়েছে মনসা দেবীকে। এটিই এখন মনসা মন্দির। এখানে প্রতিদিন ভক্তরা দুধ-কলা দিয়ে মনসাকে প্রণাম জানায়।

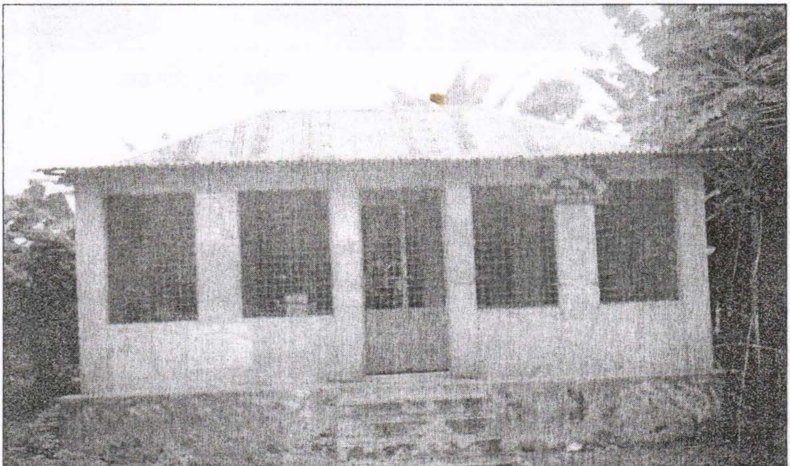

মনসাবাড়ির মনসা মন্দির

হরিনাহাটি জমিদার বাড়ি

কোটালীপাড়ার একটি অন্যতম গ্রাম হরিনাহাটি। উপজেলা থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত এই গ্রামটি। এই গ্রামটির দক্ষিণ পাশে বয়ে গেছে একটি খাল ও হালে তৈরি করা পাকা সড়ক।

এই গ্রামটির ইতিহাস ঐতিহ্য অনেকের অজানা। গ্রামের একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়টি সচ্চিদানন্দ ইনস্টিটিউশন নামে জেলায় সুপরিচিত হলেও এটি যে এককালে জমিদার বাড়ি ছিল, তা এই প্রজন্মের কাছে অজ্ঞাত। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে এই বাড়িটি নির্মাণ করেন

www.pathagar.com

এই গ্রামেরই ধনী ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য বাড়ি নির্মাণকালে কলকাতায় ঠিকাদারির ব্যবসা করতেন।

হরিনাহাটি জমিদার বাড়ি

ব্যবসার অর্থেই তিনি স্বগ্রামে পুকুর-দিঘিসহ দালান-কোঠা নির্মাণ করেন। একপর্যায়ে তিনি বান্ধাবাড়ি ও হরিনাহাটি মৌজায় জমিদারি ক্রয় করে জমিদার বনে যান। তার বিপুল অর্থ সম্পদ উপার্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের ইতিহাস। তিনি অ্যান্ট্রাস পাস করে শূন্য হাতে কলকাতায় যান এবং সেখানে ময়মনসিংহের অসিত রায় চৌধুরীর সহকারী হিসেবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি অসিত রায় চৌধুরীর কলকাতার বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন এবং মিলের ১/৪ শতাংশ মালিকানা লাভ করেন। এরপর থেকেই তার অর্থলাভের দুয়ার খুলে যায়। প্রথমেই তিনি গ্রামে প্রাসাদের মতো বাড়ি নির্মাণ করেন এবং জমিদারি ক্রয় করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের বাবা প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য ছিলেন একজন পণ্ডিত মানুষ। বেদান্ত-তীর্থ খ্যাতি ছিল। হরিনাহাটি ছিল তাঁর শ্বশুর বাড়ি। মূল বাড়ি উপজেলা সদরের কাছে ফেরদারা গ্রামে। এ গ্রামে তিনি বিয়ে করে একটি সংস্কৃতির টোল খোলেন। ৪৭-এ উপমহাদেশ বিভক্ত হলে সচ্চিদানন্দ পরিবার দালান বাড়ি ও বাড়ি সংলগ্ন বিপুল জমি রেখে কলকাতায় স্থায়ী হন এবং অল ইন্ডিয়া টেক্সটাইলের সভাপতি নির্বাচিত হন। আর এরই মাঝে পিতা প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্যের স্মৃতি রক্ষায় মূল বাড়িটিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সবকিছু দান করে দেন। স্থানীয় জনগণের ইচ্ছায় তার নামেই সচ্চিদানন্দ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন জনদরদি, দানশীল ব্যক্তি ও অসাম্প্রদায়িক। শত বছর হলেও গোপালগঞ্জের মানুষ তাকে ভুলে যায়নি।

বহলতলী পাঁচশো বছরের মসজিদ

প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী জনপদ কোটালীপাড়া। এক সময়ের জলাভূমি কালের আবর্তে স্থলভূমিতে পরিণত হয়। রাজা চন্দ্রবর্মন কোটালীপাড়ায় দুর্গ নির্মাণ করে রাজধানী স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

বহলতলীর ফতেশাহ নির্মিত মসজিদ

আগে থেকেই কোটালীপাড়া হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। বাংলায় ইসলাম ধর্ম ও শাসন বিস্তারের ফলে এর প্রভাব পড়ে কোটালীপাড়ায়। কথিত আছে, সেকালে ৩৮১জন আউলিয়ার বাংলায় আসার ফলে ইসলাম বিস্তার ঘটে। আর এরই ধারাবাহিকতায় কোটালীপাড়া গমন করেন আউলিয়া ফতেশাহ মাহমুদ। তিনি কোটালীপাড়ার মূলকেন্দ্র বাণিজ্যস্থান ঘাঘর ছেড়ে প্রায় ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে বহলতলী গ্রামে একটি অজগাঁয়ে আস্তানা গাড়েন এবং এই গ্রামেই ১৫৪৩ অথবা ১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনগম্বুজ বিশিষ্ট একটি লাল ইটের মসজিদ নির্মাণ করেন। গত ৪ থেকে ৫ শত বছর ধরে এই মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছিল ফতেশাহ মাহমুদের উত্তরাধিকারীগণ। বর্তমানে এই গ্রামে যারা শিকদার পদবী ধারণ করে আছেন, তারাই ফতেশাহ'র বংশধর। দীর্ঘদিন ধরে মসজিদটি জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর দেশের পুরাকীর্তিসমূহ সংরক্ষণ করলেও এই মসজিদটির প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। এহেন অবস্থায় কিছুদিন পূর্বে গ্রামবাসী নিজেদের বিবেচনায় বাংলার প্রাচীন সম্পদ বা পুরোনো কীর্তি এই মসজিদটিকে ভেঙে ফেলেন এবং ওই স্থানে একটি সুরম্য মসজিদ নির্মাণ করেন। পাঁচশো বছরের মসজিদটির স্মৃতি এখন ছবিতে দৃশ্যমান।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পিতৃভিটা

সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি। তিনি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার মহিম হালদার স্ট্রিটে জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের অনেকেই জানেন না সুকান্ত ভট্টাচার্যের পিতা নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং তাদের পূর্বপুরুষদের বাড়ি কোটালীপাড়ার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম উনশিয়ায়।

আনুমানিক ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে সুকান্ত ভট্টাচার্যের পিতা ও কাকারা মাদারীপুরে চলে যান এবং সেখানে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পূজার সময় তারা গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসতেন। ঘর-বাড়ি-পুকুর তখন তাদেরই দখলে ছিল। উপমহাদেশে

www.pathagar.com

সুকান্তের পিতৃভিটায় নির্মিত গ্রন্থাগার ও মিলনায়তন

আন্দোলন শুরু হলে নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভাইবোনদের নিয়ে মাদারীপুর ত্যাগ করে আনুমানিক ১৯২০ সালে কলকাতায় পাড়ি জমান এবং সেখানে বই ব্যবসা শুরু করেন সারস্বত প্রকাশনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর উনশিয়ায় তারা ফিরে আসেননি কিংবা কারও কাছে জমি ও বাড়ি বিক্রি করেননি। কয়েক বছর পর বাড়ি ও পুকুর খাস জমিতে পরিণত হয়। '৪৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাড়ি ও পুকুর বিভিন্নজন দখলে নিয়ে বসবাস শুরু করেন। একজন তো সুকান্ত ভট্টাচার্যের বাবা-কাকার স্বাক্ষর জাল করে জমি ক্রয় করেন এবং ঘরবাড়ি উঠিয়ে বসবাস শুরু করেন। এভাবে চলে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। এ নিয়ে লেখালেখি হলেও বাড়িটি দখলমুক্ত করা যায়নি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাড়িটি দখলমুক্ত করা হয়। অবৈধদের ঘর ছাড়া করা হয়। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ছিয়ানব্বইয়ে অবৈধদের তাড়ানো হলেও সেখানে সুকান্তদের পরিবারের নামে কোনো কিছু করা সম্ভব হয়নি। প্রায় ৭-৮ বছর বাড়িটি উন্মুক্ত থাকে। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সুকান্ত ভট্টাচার্যের পূর্বসূরিদের স্মৃতি রক্ষায় একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। এই প্রকল্পের অধীনে মূল ভিটায় সুকান্ত লাইব্রেরি কাম অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এটি জেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত। জেলা পরিষদের নিয়োজিত একজন তত্ত্বাবধায়ক এটি দেখাশোনা করছেন। সুকান্তের নামে গ্রন্থাগার ও মিলনায়তনটি উপজেলা সদর থেকে উনশিয়ার একদম ভেতরে অবস্থিত। পশ্চিমপাড়া শেখ লুৎফর রহমান সরকারি কলেজ হয়ে অথবা সিকির বাজার হয়ে অতি সহজেই পাকা সড়কে এটি প্রদর্শন করা যায়।

নারিকেলবাড়ি সাধ্বী তেরেজা ক্যাথলিক মিশন

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত গৌরনদী ক্যাথলিক মিশন থেকে পরিচালনা করা হতো বর্তমানে কোটালীপাড়ার নারিকেল বাড়িতে অবস্থিত স্বাধ্বী তেরেজা ক্যাথলিক

www.pathagar.com

মিশনটি। তখন কানাডিয়ান ফাদার হ্যারোল সিএসসি, ফাদার ডেরোসি, ফাদার ল্যারোস সিএসসি পর্যায়ক্রমে মিশন পরিচালনা করেন। এরপর আনুমানিক ১৯২০ সাল থেকে স্থানীয় কয়েকজন খ্রিস্টান প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহায়তায় মিশনটি স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে থাকে।

খ্রিস্টের বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে চার্চের ফাদাররা প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক প্রার্থনা পরিচালনা করেন। খ্রিস্টের ঐশী বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষার ওপর ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নারিকেল বাড়ি মিশন হাই স্কুলটি সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। এ-ছাড়া শুরু থেকেই দাতব্য চিকিৎসা বিশেষ করে মা ও শিশু পুষ্টির কার্যক্রমে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। 'সাধ্বী তেরেজা মাতৃসদন' নামে ক্লিনিকটি ধাত্রী সেবায় সুপরিচিত। অসহায় ও দুঃস্থদের সেবায় বিশেষ করে দুর্যোগ পরবর্তী সাহায্যে মিশনটির সুনাম রয়েছে।

নারিকেলবাড়ি সাধ্বী তেরেজা ক্যাথলিক মিশন

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এখান থেকে 'আগুন' নামে সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপা বিশেষ পত্রিকা বের করা হয়। আগস্টের ২১ তারিখে পাক হানাদাররা রাজাকারদের সহায়তায় মিশনটির উপর হামলা করে। হানাদাররা মনে করতো মিশন মুক্তিবাহিনীর আশ্রয়দাতা ও সংগঠক। তখনকার মিশন পরিচালক ফাদার ডেমার্স সিএসসি এবং বিশপ যোয়াকিম হানাদারদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড় দিন এখানে আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে ২৫শে ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয় মানব জাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে। এই দিনটি 'বড় দিন' হিসেবে পালন করে খ্রিস্টানরা। এ-ছাড়া প্রতি রোববার খ্রিস্ট ভক্তগণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে। বর্তমানে মিশনটি

www.pathagar.com

ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠন পরিচালনা করছে। নারিকেল বাড়ি খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন তার মধ্যে একটি।

শান্তি কুটির

কোটালীপাড়ার দুটি খ্রিস্টীয় মিশন গত দেড়শো বছর ধরে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এরমধ্যে ভুয়ার পাড়ের শান্তি কুটির ও নারিকেলবাড়ির সাধ্বী তেরেজা ক্যাথলিক মিশন অন্যতম। শান্তি কুটিরটি ব্যাপটিস্ট মিশনারী। খ্রিস্টীয় ধর্মের মহান বাণী প্রচারের পাশাপাশি এই মিশনটি দেড় শতাধিক বছর ধরে জনকল্যাণমূলক নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

মিশনটি সম্ভবত ১৯১২ সালে বাংলা গদ্যের জনক উইলিয়াম ক্যারির অনুরাগী জনৈক পাদ্রী প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনটি একটি মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত। একটি বড় পুকুরের চারপাশে দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রার্থনালয় ও অন্যান্য দপ্তর। মিশনটি পরিচালনা করেন একজন পালক। এটি তত্ত্বাবধান করে গোপালগঞ্জ মাদারীপুর আঞ্চলিক ব্যাপিস্ট চার্চ সংঘ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমানসহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এই মিশনটি থেকে নানা ধরনের সেবা পেয়ে আসছে।

রজনীর আস্তানা

রজনী ছিলেন কোটালীপাড়ার চিত্রাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গত হয়েছেন প্রায় ৫০ বছর হলো। কিন্তু তার আস্তানাটি এখনও টিকে আছে। বাড়ির উঠোনেই আস্তানাটি। এখনও প্রতিদিন সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালানো হয়। আস্তানাটি একসময় দেখাশোনা করতেন তার স্ত্রী ও ছেলেরা। এখন নাতি-পুতিরা। এরা হলেন–সোনা মিয়া, আবদুর রহমান। আবদুর রহমান রজনীর নাতি। এই আস্তানায় প্রতিবছর ৯ চৈত্র উরশ অনুষ্ঠিত হয়। সারারাত গান বাজনার আয়োজন করা হয়। ধলপহরে আগতদের খাওয়ানো হয়। এ উপলক্ষে বাড়ির পাশে ছোটখাটো মেলা বসে। উল্লেখ্য, এই আস্তানার খাদেমরা ঢাকার নবাবগঞ্জের প্রখ্যাত দরবেশ শাহ লাল (রহ.)-এর অনুসারী।

রজনীর আস্তানায় গানের আসর

www.pathagar.com

ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়ি

কাশিয়ানী উপজেলায় ওড়াকান্দি গ্রামে হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলাভূমি 'ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়ি' নামে পরিচিত। হিন্দুদের কাছে এটি অন্যতম একটি তীর্থস্থান।

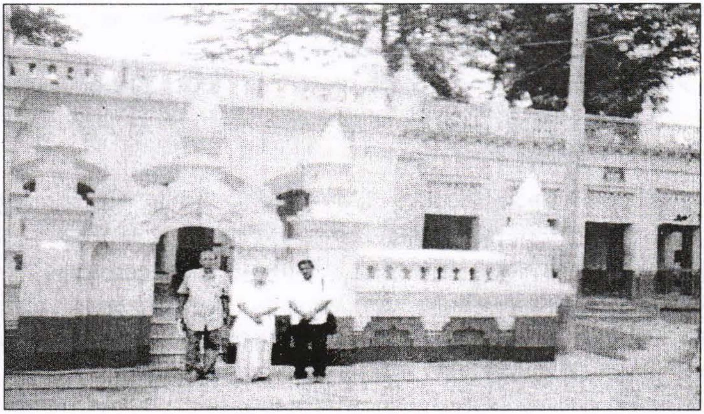

ঠাকুরবাড়ি

প্রতিবছর চৈত্র মাসে মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে ঠাকুরের জন্ম তিথিতে অসংখ্য হরি ভক্ত মতুয়া নাম ধারণ করে যোগদান করে। হরি মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে পুকুরটি আছে সেটি কামনা সাগর নামে পরিচিত। এই যোগতিথিতে মতুয়া ভক্তরা কামনা সাগরে স্নান করে পুণ্য লাভ করে। এটি মহাবারুণী মেলা নামে খ্যাত। প্রায় সপ্তাহব্যাপী চলে এই বারুণীর মেলা।

কাশিয়ানী থানার মহাশ্মশান

কাশীয়ানী গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় বাবু সখীচরণ রায় মহাশয় নিজ গ্রামে শ্মশান প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৮৫ সালে ৮৫ শতাংশ জমি দান করেন। সেই জমির উপর ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্মশানটি। এখানে শবদাহ করার সুবিধার্থে ইট নির্মিত ও লোহার পাত্রের বেদি আছে। প্রায় ২০-৩০টি গ্রামের হিন্দুরা শব দাহ করার কাজে ব্যবহার করে থাকে এই শ্মশানটি। এমনকি নিকটতম বোয়ালমারি থানার হিন্দুরাও শব দাহ করে এই শ্মশানে। চিতাভস্ম যাতে নিকটবর্তী নদী বারসিয়াতে চলে যেতে পারে সে মতো ব্যবস্থা আছে শ্মশানে।

এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে দুর্গামন্দির, কালীমন্দির, গোবিন্দমন্দির ও বারোয়ারি মন্দির। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ছাড়াও রথ যাত্রার মেলা, জন্মাষ্টমীর উৎসব হয়। প্রতি বৃহস্পতিবারে পালিত হয় হরি বাসর উৎসব। এখানে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ৫ দিনব্যাপী আয়োজন করা হয় নাচ-গানের অনুষ্ঠান। এই পাঁচ দিনই চলে ভক্তদের খাবারের ব্যবস্থা। চাউল ব্যয় হয় কম করে ৪০ থেকে ৫০ মন। সমস্ত ব্যয় বহন করে পোনা, পিঙ্গুলীয়া, কাশিয়ানী গ্রামবাসী ও কাশিয়ানী উপজেলা বাজার কমিটি।

www.pathagar.com

শ্মশানের যাবতীয় কাজ পরিচালনার জন্য ২১ সদস্য বিশিষ্ট শ্মশান কমিটি আছে। যার নাম মহাশ্মশান কমিটি। কমিটির সভাপতি নিযুক্ত আছেন উত্তম কুমার রায় এবং সম্পাদক আছেন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

বিদ্যাধর গ্রামের নামকরণ

বিদ্যা+আধার=বিদ্যাধর। এখানে পূর্বে বহু শিক্ষিত লোকের বাস ছিল। যেমন–ষষ্টিচরণ কীর্ত্তনীয়া। যিনি পণ্ডিত মহাশয় নামে খ্যাত। আরও ছিলেন রাজেন্দ্র পণ্ডিত, কুঞ্জু পণ্ডিত প্রমুখ। এদের মধ্যে ষষ্টিচরণ পণ্ডিত তৎকালীন সময়ে বরিশাল থেকে মাইনর পাস করেন। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালানোর লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা তৈরি করেন। নিজ গ্রামেও শিক্ষার জন্য পাঠশালা খোলেন। ষষ্টিচরণ কীর্ত্তনীয়া সভা, সমিতি, মিলিয়া পরগণার সভায় সভাপতিত্ব করতেন বিধায় ব্রিটিশ সরকার ষষ্টিচরণ কীর্ত্তনীয়াকে সরকার উপাধি দেন। সেখানে থেকে এই কীর্ত্তনীয়া বংশ সরকার বংশ নামে খ্যাত হয়। যখন এ অঞ্চলে কোনো শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, কোনো অক্ষরজ্ঞান ছিল না তখন এই গ্রামেই বাস করতেন গোটা কয়েকজন শিক্ষিত লোক। তাই ব্রিটিশ সরকার এই গ্রামের নাম দেন বিদ্যাধর।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভজন কুটির

১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ বাংলা ১২৪৮ সনের শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা। এই পবিত্র রজনীর প্রত্যুষে প্রভুপাদ শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আনন্দ চন্দ্র গোস্বামী, মাতা স্বর্ণময়ী দেবী। 'স্বর্ণময়ী দেবী বলেছেন, 'বিজয়, আমার অন্য ছেলের মত জন্মায়নি। সে যখন আমার গর্ভস্থ হয়, তখন তার পিতা আমাকে বীর্যদান করেননি। তিনি কেবল ইচ্ছা করেছিলেন আমার গর্ভসঞ্চার হোক। তাঁর এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই আমি গর্ভধারণ করেছিলাম। বিজয় যখন আমার গর্ভে ছিল, সূর্যের রশ্মির মতো আমি রাধা-কৃষ্ণ দর্শন করতাম।' মহাপুরুষগণ প্রয়োজনেই পৃথিবীতে আসেন। আবার কর্ম সমাপন করে চলে যান। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), ভগবান রামচন্দ্র, শ্রীচৈতন্য, মহাত্মা যিশু, শংকরচার্য, গুরু নানক প্রমুখ সকলেই সংকটকালে পৃথিবীতে আগমন করে ধর্ম পিপাসু নর-নারী উদ্ধার করে গেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কঠোর তপস্যা করেছেন বনে-জঙ্গলে। আবার সংসারও করেছেন তিনি। কঠোর-তপস্যা বলে তিনি সন্ধান পেয়েছেন পরম ব্রহ্মের। এই মহান পুরুষের শিষ্যত্ব লাভ করেছেন হাজার হাজার জনগণ। তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে, তাঁর কৃপায় ধন্য হয়েছেন তারা। তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, কিরণচাঁদ দরবেশ ও জগবন্ধু গোস্বামী। বিজয়কৃষ্ণের কৃপায় ধন্য কিরণচাঁদ দরবেশজী ১৯৩০ সালের শ্রাবণ মাসে ঝুলন পূর্ণিমা ও রটন্তিকা কালীপূজার দিন (ঐ সালে) জ্যোৎকুরা গ্রামে আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়িতে আগমন করেন।

বলা প্রয়োজন যে, এই আশুতোষ বিশ্বাস পেশায় একজন আইনজীবী ছিলেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য বেছে নিয়েছিলেন ওকালতি ব্যবসা। ওকালতিতে প্রতিপক্ষকে ঠকাতে বিভিন্ন অপকৌশল ও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় মর্মে নিজেকে ধিক্কার দেন এবং ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন।

www.pathagar.com

শত শত জনগণ কিরণচাঁদ দরবেশজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালে এই হৃদয়বান নিজ বাড়িস্থ ৬ শতাংশ জায়গা যেখানে কিরণচাঁদ দরবেশজী বসেছিলেন, সেখানেই নির্মাণ করেন কৃষ্ণ ভজন কুটির। অবশ্য গুরুর কথামতো বিজয়কৃষ্ণ ভজন কুটির নামকরণ করেন। এখানে প্রশ্ন যে কিরণচাঁদ দরবেশজী নামকরণ কেন হলো?

কিরণচাঁদের পিতা ছিলেন বড় জমিদার। এই মহান মনের অধিকারী ও মহান পুরুষ তাঁর পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত সমস্ত জমিদারি জনগণের মধ্যে বিতরণ করে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সর্বত্যাগী কিরণচাঁদের নামের শেষে দরবেশ যোগ করে দেন। সেখান থেকেই তিনি কিরণচাঁদ দরবেশজী নামে খ্যাত।

পরবর্তীকালে কিরণচাঁদ দরবেশজীর কৃপাধন্য ও আশীর্বাদপুষ্ট অসীমানন্দ স্বরসতী প্রভু নিজ গুরুদেবের পদচারণ ভূমি জ্যোৎকুরা গ্রামে আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়িতে আসেন এবং এই বাড়িটিকে নতুন আর এক তীর্থস্থান বলে ঘোষণা দেন। পরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর আশ্রিত আশীর্বাদপুষ্ট বাবাজীর শিষ্য সতীপ্রসন্ন সেন এবং আশীর্বাদধন্য অনাদি জ্ঞান সরকারের শিষ্যত্ববরণ করেন। কিরণচাঁদ দরবেশজী, অসীমানন্দ স্বরসতী, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ও অনাদী জ্ঞান সরকারের বহু শিষ্য এখানে আছেন। তাদের সদ্ইচ্ছায় ও গুরুর প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিবেদনে আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভজন কুটির আঙ্গিনায় প্রতিবছর শ্রাবণী পূর্ণিমায় ও রটন্তিকা কালীপূজার সময় নাচ-গান, গুরুর জীবনাদর্শ ও উপদেশবাণী আলোচনা করা হয়। সারাদিন মহোৎসবের অনুষ্ঠান করে থাকেন ভক্তরা।

খলিশাখালী সাধনকেন্দ্র

খলিশাখালী সাধন কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাশিকৃষ্ণ ঠাকুর। আদি নিবাস ছিল গোপালগঞ্জ সদর অন্তর্গত রাউৎখামার গ্রাম। পেশায় ছিলেন কৃষিজীবী। ছেলেমেয়ে প্রত্যেকের সংসার প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিয়ে লোকটি বেরিয়ে পড়েন অসীমের সন্ধানে। তিনি কালীর সাধক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরনে থকতো দুইটা গামছা। একটা পরিধানের, অন্যটা গায়ে। হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর; সিঁদুরের চিহ্নটি ছিল নাকের থেকে চুল পর্যন্ত প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া করে। ঘুরেছেন দেশে-দেশে, হিন্দু-মুসলমান সকলেই ভালোবাসতো এই গৃহত্যাগী ঠাকুরকে। শেষ পর্যন্ত তিনি আস্তানা করলেন কাশিয়ানীর খলিশাখালীতে। জড় হতে থাকে আরও সন্ন্যাসী। আশ্রমের যাবতীয় খরচ চলে কালেকশনের মাধ্যমে। সব সম্প্রদায়ের লোকেরা সাহায্য করে এই আশ্রমে। প্রথমেই তৈরি হয়েছে পূজা মন্দির। মন্দিরটি ইটের তৈরি অর্ধ পাকা। একই আকারের এরকম আরও মন্দির করা হয়েছে। যেমন বাসুদেব মন্দির, কালী মন্দির ও দুর্গা মন্দির। নিয়মিত পূজা হয় এখানে। ঠাকুররা এবং দূরের লোকজন থাকেন আলাদা ভবনে। আর একটা দালান আছে অনাথ আশ্রম নামে। মেধাবী গরীব ছাত্রদের আশ্রমের খরচে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। সকাল সন্ধ্যা নাম চলে এখানে। একটি মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলকও আছে। এই গৃহত্যাগী মানুষটি ১১১ বছর বয়সে গত ২৩-০২-১২ তারিখে নিত্যধামে গমন করেন। বর্তমানে গ্রাম কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আশ্রমটি পরিচালিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

জ্যোৎকুরা জামে মসজিদ

'জ্যোৎকুরা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ প্রায় ৩৫০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে এখানে অনেক মসজিদ তৈরি হয়েও ম্লান করতে পারেনি এই মসজিদটিকে। দশ জনের সাহায্যেই চলে মসজিদটির ব্যয় নির্বাহ। বহুপূর্ব থেকেই এই গ্রামে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই বাস করে। গ্রামে প্রায় ৪০০ গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রিপ্রাপ্ত লোক আছে। তাদের মধ্যে বহু লোক বহির্বিশ্বে কাজে নিয়োজিত আছেন। গ্রামে উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গ্রামের মসজিদে ছাত্রদের পড়ার জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে। জমজমাটভাবেই মসজিদটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামে একটি কালীমন্দিরও আছে। মাঘ মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা শেষে কবিগান হয়ে থাকে। পূর্বে এখানে খুব নামকরা চারণ কবিরা গান গেয়েছেন। যেমন–নিশিকান্ত সরকার, নকুল সরকার, পাগল বিজয় সরকার, অনাদি জ্ঞান সরকার, রসিক সরকার প্রমুখ। মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণে মুসলমানরা সচেষ্ট থাকেন।

ছোট বাহির বাকপুরান মসজিদ

ছোট বাহিরবাক শরিফ বাড়িতে প্রায় দুইশত বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদটি। গ্রামের ধনাঢ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির ঘাটতি নেই। পাশেই ছিল জমিদার শ্রেণির তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। তাদের বদৌলতেই গড়ে উঠেছে এ গ্রামের কৃষ্টি-কালচার। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পূর্ব-পুরুষ প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদটি যেন দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধবেশে লাঠি ভর করে। সে যেন তাকিয়ে আছে বর্তমান প্রজন্মের দিকে। গ্রীষ্মের রোদে পুড়ে যেন খাঁক হয়ে গেছে। তার গায়ে কিছু দেওয়ার নেই। যে যুগে মানুষ চাউল পুড়িয়ে, কালি বানিয়ে লিখতো সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত এই ইট নির্মিত মসজিদটি। এর কি কেউ নেই। অবশ্য মো. ইদ্রিস আলী মিয়া উদ্যোগী হয়েছেন মসজিদটির সংস্কারের দিকে। হাত বাড়াচ্ছেন তিনি প্রত্যেকের সহযোগিতা পেতে। আশ্চর্যের বিষয় আজও এখানে বহু মানুষ নামাজ আদায় করে। জুম্মার নামাজ হয় এখানে। হয় প্রতি বছরের সেই ওয়াজ-মাহফিলও। হাজার হাজার মুসল্লি যোগ দেয় ওয়াজ শুনতে। হিন্দুরাও আসে এখানে। তারা জানে মাহফিলে ভালো কথাই আলোচনা হয় যা শিক্ষণীয় সবার জন্য।

লক্ষ্মীপুর কালী মন্দির

জনশ্রুতি আছে যে, এই লক্ষ্মীপুর গ্রামে লক্ষ্মী দিঘা ধান প্রচুর হতো। জমির ধরন লক্ষ্মী দিঘা ধান হওয়ার উপযুক্ত। কোনো অভাব এখানে থাকতো না। ঘরে ঘরে হতো লক্ষ্মীপূজা জমজমাটভাবে। লক্ষ্মীপূজার সময় তৎকালীন এক জমিদার দেখতে আসেন এই গ্রামটিকে। তিনি এসে দেখলেন প্রতিঘরে লক্ষ্মীপূজা হচ্ছে। তখন জমিদার বলে ওঠলেন এ যে লক্ষ্মিতে ভরপুর। তিনি এলাকাটির নামকরণ করেন লক্ষ্মীপুর। সেখান থেকে গ্রামের নাম হয় লক্ষ্মীপুর।

এই গ্রামে আছে একটি কালীমন্দির। ১০ শতাংশ জমির উপর মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দির কমিটির প্রধান নিখিল চন্দ্র বর এবং সুবোধ দাস। গ্রাম থেকে হার তুলে পূজা করা হয়। মাঘ মাসের ১৫ তারিখের পর যে মঙ্গলবার, সেই মঙ্গলবারে পূজা হয়। ধান

www.pathagar.com

মৌসুমে গ্রাম থেকে ধান সংগ্রহ করা হয় মন্দিরের উন্নয়নের জন্য। পূজা শেষে এখানে মেলা মেলে। মন্দিরের দক্ষিণ পাশের বাড়িতে হরিচাঁদ ঠাকুর নিজ হাতে একটি তমাল গাছ রোপণ করেন। এখনও গাছটি আছে। আওয়ামী লীগ নেতা মুকুল বোস গাছের গোড়া পাকা করে বাঁধাই করে দিয়েছেন। মাঘ মাসে মহোৎসব হয়। অগনতি লোকের সমাগম হয় এখানে।

সার্বজনীন কালী মান্দির

রামাদিয়া সার্বজনীন কালী মন্দিরটি দুইশত বছর পূর্বে ১১ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, যার বর্তমান দাগ নং ৩৭০। বহু ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পোহাতে হয়েছে বেশ কয়েকবার এই মন্দিরটিকে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় রাজাকার কর্তৃক ধ্বংস হয় মন্দিরটি। হিন্দুরা দেশে ফিরে আবার প্রতিষ্ঠিত করে এটিকে। এরপরেও একবার মন্দিরের গায়ে আগুন লাগানো হয়। কিন্তু আগুনও যেন সম্মান দেখালো মন্দিরটিকে। আগুন ধরেনি সেদিন। আজও সে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন এর অবস্থা খুবই ভালো। কোনো ঝামেলা নেই। প্রত্যেকেই যেন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। চোখে পড়লেই মন কেড়ে নেয়। প্রতি বছর মাঘ মাসের দ্বিতীয় শনিবারে পূজা হয় এখানে। মন্দিরে বিগ্রহ আছে রক্ষা চণ্ডী, শীতলা দেবীর।

সীতারামপুর কালীমন্দির

প্রায় ২৫০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই কালীমন্দিরটি। মন্দিরের কেবলই পূর্ব পাশে চন্দ্র বালা নামে এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম টিন দ্বারা মন্দিরটি তৈরি করেন।

মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে এখন মুসলমানদের বাস। মন্দিরের নিকট কোনো হিন্দু নেই। যারা আছে তারা মন্দির থেকে অনেক দূরে। কিন্তু এই গ্রামে মুসলমানরা বেশি নজর রাখে মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজা পরিচালনার দিকে। প্রতি বছর মাঘ মাসের প্রথম শনিবারে বাৎসরিক পূজা হয়। এখানে পূজার দিন রাতে বা সকালে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত হয়। দেখা যায় মুসলমানরাও মানত শোধ করে। পূজা শেষে আরম্ভ হয় কবিগান। দুইদিন ব্যাপী চলে এই অনুষ্ঠান।

ঙ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অতি প্রাচীনকালে শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে বিদ্যা অর্জন করত। পর্যায়ক্রমে অঞ্চলে অঞ্চলে গড়ে ওঠে মক্তব ও পাঠশালা। গাঁ থেকে হার তুলে পাঠশালা চালান হতো বলে একে মানুষ গাঁ হারা স্কুলও বলতো। এখনও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীনদের মুখে সেই গাঁ হারা স্কুলের কথা শোনা যায়। কালক্রমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় পাড়া-মহল্লায় গড়ে উঠতে লাগল বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়। ক্রমবিকশিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেণি বিন্যাসকরণের মানদণ্ডে শিক্ষার্থীদের অল্প শিক্ষিত, শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত বলে সনাক্ত করা হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে সুখ্যাতি অর্জনকারী অনেক শিক্ষা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান আছে। সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বয়ে এনেছে অনেক গৌরব।

বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেখ লুৎফর রহমান সরকারি কলেজ, কোটালীপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন (চন্দ্রদিঘলিয়া), ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, লাল মিঞা সিটি কলেজ, এমএইচ খান ডিগ্রি কলেজ, সাতপাড় সরকারি নজরুল কলেজ, শেখ মুজিবুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রামদিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, মুকসুদপুর ডিগ্রি কলেজ, বঙ্গরত্ন মহাবিদ্যালয়, শেখ রাসেল মহাবিদ্যালয়, চাপতা ডিগ্রি কলেজ, শেখ হাসিনা মহাবিদ্যালয়, ভাঙারহাট কলেজ, রামশীল আদর্শ মহাবিদ্যালয়, শেখ রাসেল শিশু নিকেতন, জি টি পাইলট স্কুল, শুয়াগ্রাম হাইস্কুল, সচ্চিদানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, সিতাইকুণ্ড হাই স্কুল, এস এম সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, বীণাপাণি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, স্বর্ণকলি উচ্চ বিদ্যালয়, উলপুর পি.সি উচ্চ বিদ্যালয়, নিজড়া সপ্তপল্লী বি.কে উচ্চ বিদ্যালয়, টুঠামান্দ্রা সর্যুবালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়, করপাড়া ইউনিয়ন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, শেওড়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, বাশুড়িয়া সেনেরচর উচ্চ বিদ্যালয়, ডুমুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বর্ণি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রামদিয়া এস.কে. উচ্চ বিদ্যালয়, ঘোনাপাড়া রাধাচরণ রাজেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, রামদিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নড়াইল জ্ঞানাঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়, মুকসুদপুর পাইলট বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বহুগ্রাম পি.সি উচ্চ বিদ্যালয়, কমলপুরী বিদ্যানিকেতন, সোনার বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, টি টি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্ধাবাড়ি জে.বি.পি উচ্চ বিদ্যালয়, খান্দারপাড় ইউনিয়ন ইন্দুহাটি হলধর উচ্চ বিদ্যালয়, সিঙ্গা কে.সি.সি.এম উচ্চ বিদ্যালয়, সাতপাড় ডি.এন.জি.সি উচ্চ বিদ্যালয়, বৌলতলী এস.ইউ উচ্চ বিদ্যালয়, নারিকেল বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, চন্দ্রদিঘলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। এ ছাড়া মহল্লায় মহল্লায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকারি, বেসরকারি কিন্ডার গার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ

পাকিস্তান আমলে এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘ দিনের প্রাণের দাবি ছিল এখানে একটি কলেজ হোক। গোপালগঞ্জ মহকুমা শহরে কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে রামদিয়াতে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এলাকায় যেমন ছিল না কলেজ তেমনি মসজিদও। তাই এখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার দাবিও জরুরি হয়ে পড়ে। মুসলমান সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত নেয় প্রত্যেক মুসলমান পরিবার ১ টাকা করে এবং টাকা দিতে না পারলে এক পইয়া ধান দেবে। এতে অনেক টাকা সংগ্রহ হয়। তা দিয়ে শহরে একটি মসজিদ তৈরি করা হয় (বর্তমানে এটি কোর্ট মসজিদ নামে পরিচিত)। আরও টাকা থেকে যায়। উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ কত তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও কেউ বলেন ১৫ লাখ কেউ বলেন ২০ লাখ।

বিশিষ্টজনেরা ভাবলেন পাকিস্তানের গভর্নর খাজা নাজিমউদ্দিনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়তা চাওয়া হবে। তাকে উপঢৌকন দেওয়ার জন্য ২০ সের চান্দিরূপা দিয়ে একটি ঢাল ও দুটি বর্শা তৈরি করা হয়। খাজা

www.pathagar.com

নাজিমউদ্দিন আসলেন, উপঢৌকন গ্রহণ করলেন। সাথে কয়েক লাখ টাকাও তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান প্রায়ই কলকাতা ও খুলনায় থাকতেন। গভর্নর খাজা নাজিমউদ্দিনের আগমন উপলক্ষে তিনিও সে দিন সেখানে উপস্থিত হন। কয়েকজন ছাত্র নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিবাদ করলেন—এখানকার জনগণের টাকা অন্য কোথাও যেতে পারে না। এই টাকা দিয়ে এখানেই একটি কলেজ তৈরি করা হোক। খাজা নাজিমউদ্দিন শেখ মুজিবুরের দাবি মেনে নিলেন। সিদ্ধান্ত হয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করার। তখন কলেজের জন্য জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। গোপালগঞ্জে তখন 'সীতানাথ একাডেমী' ও মথুরানাথ ইনস্টিটিউশন' দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জায়গার পরিমাণ বেশি ছিল মথুরানাথ ইনস্টিটিউশনে। সবাই একমত হন যে এখানেই কলেজ করা হবে।

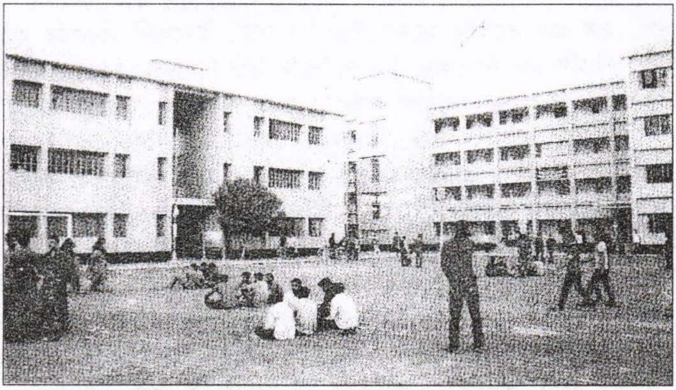

সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ

সীতানাথ একাডেমীতেই সীতানাথ একাডেমী ও মথুরানাথ ইনস্টিটিউশন-- এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে নতুন নামকরণ করা হয় এসএম মডেল হাইস্কুল। পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালে মথুরানাথ ইনস্টিটিউশনের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় একটি কলেজ। এর নাম দেওয়া হয় কায়েদ-ই-আজম মেমোরিয়াল কলেজ। ১৯৭১-এর পর কলেজটির নামকরণ করা হয় সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ। ১৯৭৯ সালে এ কলেজটি সরকারি হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির নাম সরকারি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি

১৯২০ সাল। ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক অবস্থায় ধ্বস নেমে আসে। সূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশ করে ব্রিটিশ শাসকরা সিদ্ধান্ত নেয় ভারতবাসীকে খুশি করার। নতুন রাজা নির্বাচিত হলো। অবিভক্ত ব্রিটিশ সরকার করোনেশনের সৌজন্যে অর্থ প্রেরণ করে। ওই অর্থ বণ্টন হতে হতে এসডিও বর্তমানে ডিসি পর্যন্ত পৌঁছয়। গোপালগঞ্জের এসডিও সে অর্থ পেয়ে মোক্তার মুন্সেফদের সাথে আলোচনা করেন যে করোনেশনের সৌজন্যে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে এমন কিছু করা হোক যাতে তাদের নামটা জড়িত থাকে। তাই তারা ওই অর্থ ব্যয়

www.pathagar.com

করে গোপালগঞ্জ শহরে একটি করোনেশন থিয়েটার তৈরি করেন। প্রতিষ্ঠানটিতে যথারীতি নৃত্য-গীতি চলতে থাকে। কালক্রমে তারই এক কক্ষে কিছু বই সংগ্রহ করে একটি লাইব্রেরি তৈরি করা হয়। নামটা পরিবর্তন করে করোনেশন পাবলিক লাইব্রেরি করা হলো। পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর অন্যায় অবিচার করতে করতে এমন এক পর্যায়ে গেলো যে শেষ পর্যন্ত উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নেয়। এরই মধ্যে কিছু যুবক ব্রিটিশ উপাধি ত্যাগ করে অর্থাৎ করোনেশন শব্দটি বর্জন করে পাকিস্তানের কবি ইকবালের নামে প্রতিষ্ঠানটির নাম ইকবাল পাবলিক লাইব্রেরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। গোপালগঞ্জ শহরের কেবলই পূর্ব পাশে বেদগ্রাম নিবাসী মোঃ মাঈনউদ্দিন এ নামকরণের বিরোধিতা করেন। তিনি চাইলেন একজন বাঙালি কবির নামে লাইব্রেরির নামকরণ করা হোক। বাংলায় তখন বাঙালি কবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি, গোপালগঞ্জ

মোঃ মাঈনউদ্দিন-ই তখন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাম উল্লেখ করেন। এতেও প্রতিবাদের তুফান দুর্বল হলো না। সবাই আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বলল কাজী নজরুল ইসলাম-তো ভারতের কবি। এর উত্তরে মাঈনউদ্দিন বললেন, হোক তিনি ভারতবাসী, তিনি তো বাঙালি কবি, বাংলার কবিতা লেখেন। এভাবে তিনি একের পর এক যুক্তিতর্ক খণ্ডন করে সবাইকে নিজের অনুগত করেন। পরিশেষে ১৯৬৫ সালে ওই লাইব্রেরির নামকরণ করা হলো নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি। মোঃ মাঈনউদ্দিন এখনও (২০১২) লাইব্রেরিটির তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।

উলপুরে জমিদারদের বসতি স্থাপন

উলপুর গ্রামে দালান কোঠা ছাড়া অন্যকোনো ঘরবাড়ি অফিস আজ অবধি দেখা যায় না। সেখানকার জমিদারগণ কালক্রমে ভারতে চলে যায়। পরিত্যক্ত সেসব দালান

www.pathagar.com

কোঠা অতীতের চিহ্ন বয়ে চলেছে। এটি ছোট কলকাতা বলে খ্যাত ছিল। আনন্দনাথ রায় তিনি তার ফরিদপুরের ইতিহাস গ্রন্থে উলপুরে জমিদারি প্রাপ্তি সম্পর্কে লিখেছেন : 'অনুমান ১০১০ হইতে ১০১৬ সালের মধ্যে (১৬০৩-১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দ) উলপুরের জমিদারগণের বীজপুরুষ রঘু নন্দন জন্মগ্রহণ করেন। উলপুর গ্রামটি সুবিশাল নয়। তখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের শেষ সময়। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবকালে এই মহাপুরুষের জন্ম। তাহার শৈশবে পিতা যাদবেন্দ্র পরিবার পরিজনসহ ইত্নাতে বাস করেন। তখন ফতেহাবাদ ও মাহমুদাবাদে সরকারদ্বয় (যাহা চাকলা ভূষণা নামে অভিহিত হয়) পরাক্রমশালী বঙ্গজকায়স্থ মুকুন্দ রায়ের পুত্র শত্রাজিৎ ও শিবরামের শাসনাধীন ছিল। তাহারা নামে বাদশাহের অধীন হইলেও কার্যত সমস্ত স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। মুকুন্দ রায়ের প্রতিষ্ঠিত ফতেহাবাদ সমাজে কুলীনের বাস ছিল না অথচ কুলীন না থাকিলে সমাজের কোনো প্রতিষ্ঠা ছিল না। এ কারণে তিনি কুলীনের বিশেষ সম্মান ও সমাদর করিতেন। ইত্না মুকুন্দ রায়ের অধিকারের মধ্যে ছিল। যাদবেন্দ্র বসু ঠাকুর ইত্নায় বাস গ্রহণ করিলে মুকুন্দ রায়ের পুত্রগণ স্বীয় সমাজে বিখ্যাত কুলিন গোলাপ বসু ঠাকুরের বংশধরের অধিষ্ঠানে সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাকে যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন।'

'রঘুনন্দন বসুর জমিদারি প্রাপ্তি সমন্ধে উলপুরে দুইটি প্রবাদ প্রচলিত আছে।

(১) প্রথম প্রাবদ এই যে তাহার নিকট জ্ঞাতি খুল্লাতাত দেবীদাস বসু ঠাকুর ঢাকার নওয়ারা বিভাগের কানুনগো থাকাকালে তাহার সাহায্যে রঘুনন্দন এই জমিদারি প্রাপ্ত হয়।

(২) অপর কিংবদন্তি এই যে তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত রাজা উপাধিধারী উজানির জমিদারগণ কায়স্থ সমাজে মিশিবার জন্য শ্রেষ্ঠ কুলীন রঘুনন্দকে ৭ গ্রাম দান করেন; লেখকের ভুলে ৭ গ্রাম স্থানে ২৭ গ্রাম লিখিত হয়; তদবধি ২৭ গ্রামে সৃষ্টি সাহাপুর পরগণায় জমিদারি রঘুনন্দনের অধিকারে থাকে।

তৃতীয় আর একটি প্রবাদের কথাও (কায়স্থ সমাজ পত্রিকার সম্পাদক, আলগী–নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট) শোনা গিয়েছে, তাহার মর্ম এই ভূষণা অঞ্চলে বহুকাল হইতে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে ভূষণার অধিপতি মুকন্দ রায়ের পুত্র শত্রাজিৎ রায় তাহার ভ্রাতা শিবরাম রায়ের কন্যার সঙ্গে রঘুনন্দের বিবাহ দিয়া প্রথমত তাহাকে ভূষণার নিকটে একটি গ্রাম যৌতুক দেয়, তাহাকে লোকে এখনও রঘুনন্দপুর বলে। তৎপুত্র শত্রাজিৎ রায় ২৭টি গ্রামের জমিদারি রঘুনন্দকে অর্পণ করিয়া সাহাপুর পরগণা নামে নতুন পরগণা সৃষ্টি করেন।

বসুগণের উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে উলপুর একটি ছোট গ্রাম ছিল, চারদিকে বিল; গ্রামের মাঝে কয়েকটি উঁচু ভিটা মাত্র ছিল; তাহার কয়েকটি ভিটাতে অল্প কয়েক ঘর লোক বাস করিত; অপরগুলো বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। মনে এই প্রশ্নের উদয় হতো যে পরগণার মধ্যে আড়ুয়াকংশুর, করপাড়া, হাটবাড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম উলপুর অপেক্ষা ভালো এবং উচ্চ থাকিতে মূল জমিদারগণ পরগণার এককোণে উলপুরে কেন তাহাদের বাসভূমি ও জামদারির কেন্দ্র করিলেন। পূর্বাবস্থা সম্যক আলোচনা করিয়া এখন মনে হয় তাদের এরূপ করার যথেষ্ট কারণ ছিল।

www.pathagar.com

● সাহাপুর পরগণা বিলময় দুরাধিগম্য প্রদেশ হইলেও ভূষণা হইতে বাকরগঞ্জ পর্যন্ত যে রাস্তা ['মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ও ইংরেজ রাজত্বের প্রথম আমলে এই দেশে একটি ভালো রাস্তা ছিল। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মেজর রেনেল বঙ্গদেশের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাহাকে উলপুর হইতে কোটালীপাড়ার মধ্য হইয়া বাকরগঞ্জ পর্যন্ত একটি রাস্তা (common road) বর্তমান থাকা দৃষ্ট হয়। এই রাস্তা ভূষণা হইতে আরম্ভ হইয়া জয়নগর, কালীনগর, মুকসুদপুর পর্যন্ত এসে, সেখান হইতে সোজা দক্ষিণ দিকে গান্দারহাটি, শিবরামপুর ও নিজেরহাট হইয়া উলপুর পর্যন্ত আসিয়া উলপুর হইতে দক্ষিণপূর্ব দিকে কামারপাড়া, তাড়াসী প্রভৃতি গ্রাম হইতে গৌরনদী ও তৎপর ইন্দ্রাকপুর, নলচিড়া, মাধবপাশা ও কাশীপুর হইয়া বাকরগঞ্জ পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছিল। কিন্তু ১০০ বছর পরে রেভিনিউ সার্ভে হইয়া যে মানচিত্র প্রস্তুত হয় তাহাতে ওইরূপ কোনো রাস্তার নির্দেশ ছিল না। এখন এইরূপ কোনো রাস্তা নাই। রেনেলের মানচিত্র হইতে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত আর একটি রাস্তা অঙ্কিত আছে। ওই মানচিত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মধুমতী তখন আড়পাড়া ও হরিদাসপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।] উলপুর তাহার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল এবং উলপুর হইতে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত একটি রাস্তা ছিল।

● মধুমতী নদী হইতে সহজে উলপুরে যাতায়াত করা যাইতো। মধুমতী তখন উলপুরের আরও নিকটে ছিল। পরগণার অন্য কোনো গ্রামে (তেঁতুলিয়া ব্যতীত) শীত ও গ্রীষ্মকালে সহজে যাতায়াতের উপায় ছিল না। স্ত্রীলোক ও মালপত্র লইয়া অন্যসব গ্রামে যাওয়া নিতান্ত কষ্টকর ছিল।

● উলপুরে বেশি লোকের বাস ছিল না এবং হিন্দু ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী কোনো অধিবাসী ছিল না। সুতরাং অনেক লোককে বাস্তু হইতে উঠাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল না। এরূপ স্থানে নতুন উপনিবেশ স্থাপন সহজসাধ্য।'

সম্ভবত এই সমস্ত কারণে অন্যান্য বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও প্রথমাগত জমিদারগণ এই গ্রামেই তাদের বাস নির্দেশ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

দক্ষিণ বাংলার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এটি গোপাল চান্দু শহরের সামান্য দক্ষিণে ৫৫ একর জমির ওপর অবস্থিত। ২০০১ সালের ১৩ই জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় ১৯৯৯ সালের ১৫ই নভেম্বর এবং প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত হন প্রফেসর ড. এম খায়রুল আলম খান এবং তাঁকেই ১৪ই জুলাই ২০০১ সাল থেকে ভাইস্-চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও জোট সরকার প্রকল্পটি স্থগিত ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। ২০০৯ সালের নভেম্বরে পুনরায় প্রকল্পটি চালু হয় এবং শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয় ২০১১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর, উপাচার্য নিযুক্ত হন ড. খায়রুল আলম খান।

www.pathagar.com

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৬টি অনুষদের ১৪টি বিভাগে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। অনুষদগুলো হলো– ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজনেস স্টাডিজ ও হিউমানিটিজ ইনস্টিটিউট ১টির নাম বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশ স্টাডিজ।

বিভাগগুলো হলো :

১. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
৩. ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক বিভাগ
৪. গণিত বিভাগ
৫. অ্যানালাইটিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি বিভাগ
৬. পরিসংখ্যান বিভাগ
৭. ফার্মেসি বিভাগ
৮. অর্থনীতি বিভাগ
৯. সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
১০. লোকপ্রশাসন বিভাগ
১১. ব্যবস্থাপনা বিভাগ
১২. একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ
১৩. ইংরেজি বিভাগ ও
১৪. বাংলা বিভাগ

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়টিতে রয়েছে একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ৩টি ছাত্র-ছাত্রী হল, উপাচার্য ভবন, ২টি ডরমিটরি, ক্যাফেটেরিয়া, মসজিদ, কর্মচারীদের বাসভবন, পানি শোধনাগার ও শহিদ মিনার। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘের।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ কেন্দ্র

বেতার কর্তৃপক্ষ শহরে নির্ধারিত স্থানে কেন্দ্রটি স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ করে এসেছে। এটি হবে ২০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন এবং এফ এম ব্যান্ডে অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। মূলত গ্রামীণ উন্নয়ন এবং কটকাকীর্ণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে।

চ. মুক্তিযুদ্ধ

ফুকরা গ্রাম ও ভাটিয়াপাড়া মুক্তিযুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পতন হলো। কিন্তু পাকিস্তানি উপনিবেশ থেকে রেহাই পেল না বাঙালি। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে শহিদ হলো রফিক, সফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে। তৎকালীন ছাত্রসমাজ রাজপথে মিছিল করে পাকিস্তান সরকারের প্রতিবাদ করলো, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিতসমাজ প্রতিবাদে সাড়া দিল। '৫২-এর পর থেকে প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে সারাদেশে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহিদ দিবস পালিত হতে থাকে। সাথে সাথে পাকিস্তান সরকার শহিদ দিবস পালনে বাঁধা সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে জনগণের সমর্থন গড়িয়ে পড়ে ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড বন্ধ করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে সকল বিরোধী দলের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রস্তাব বাঙালির মুক্তির সনদ পেশ করেন। বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন ঢাকায়, বিমান বন্দরে তরুণ নেতারা এবং ছাত্রলীগের সকল নেতাকর্মী বঙ্গবন্ধুকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। স্লোগানে স্লোগানে বিমানবন্দর মুখরিত হলো। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ৬ দফা দাবিকে গ্রাম-গঞ্জে সাধারণ মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিলো। আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হলো। সে মাত্রা স্বাধীনতার নতুন আন্দোলন। গ্রেফতার করা হলো বঙ্গবন্ধুসহ অনেক রাজনীতিবিদকে। গ্রেফতার করা হলো ছাত্রলীগের প্রথম কাতারের নেতৃবৃন্দকে। আন্দোলন সারা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, জনতা একাকার হয়ে গর্জে উঠল। ১৯৬৮ সালে ৬ দফার সাথে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা যোগ হয়। ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ আহুত ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহম্মদের সভাপতিত্বে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান ঘটে। বঙ্গবন্ধুর দাবি নির্বাচন দিতে হবে। জেনারেল ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর দাবি মেনে নিলো। ১৯৭০ সালের অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলো। দেশব্যাপী নির্বাচনের প্রস্তুতি, ছাত্র-সংগ্রামের নতুন নতুন স্লোগান জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। সমগ্র পাকিস্তানে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা প্রমাদ গুণতে শুরু করল, কি করে শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা যায়। ১লা মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসার কথা ছিল, হঠাৎ করে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিলেন অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদ অধিবেশন বন্ধ থাকবে। ঢাকা মিছিলের নগরীতে পরিণত হলো। স্লোগান উঠল বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ভাষণে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। দীর্ঘ এই

www.pathagar.com

ভাষণের মধ্যদিয়ে জাতি পেল দিক নির্দেশনা। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতি প্রমাণ করলো বঙ্গবন্ধুই জাতির অবিসংবাদিত নেতা এবং আলোর দিশারী ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। ৮ই মার্চ থেকে শুরু করে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এই সময় আন্দোলন এবং মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণে অনেকে শহিদ হন। ঢাকা মিছিলের নগরীতে পরিণত হলো।

১৯৭০ সালে যুদ্ধকালীন মুজিব বাহিনীর কমান্ডার ইদ্রিস আলী মিয়া ছিলেন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র এবং পরীক্ষার্থী। তখন তিনি সকল ছাত্রকে ডেকে একটা থানা কমিটি করলেন। ২৬শে মার্চের বর্বরোচিত হামলার খবর সারদেশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ল। কমিটি গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে সারা থানায় স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতে পারে। এপ্রিল মাসের ১-২ তারিখে খুলনা পুলিশ এবং বিডিআরের সঙ্গে পাকিস্তানি আর্মির যুদ্ধের খবর পেয়ে তাদের জন্য চিড়া, গুড় ও নগদ টাকা নিয়ে সাইকেলে করে খুলনার দিকে রওনা হন ইদ্রিস আলী মিয়া। পথে সেনহাটি এক বাড়িতে ওঠেন। ঐ বাড়িতে ছিল পুলিশের ওয়ারলেস সেট। সারারাত বসে বসে ওয়ারলেস সেটে আসা যুদ্ধের খবর শুনছিলেন। সকালে উঠে নদীর পাড়ে যেতেই দেখেন শত শত মানুষের লাশ রূপসা নদীতে ভাসছে। খুলনা থেকে ফিরে এলেন তিনি। এসে নুরুলকাদির জুন্নুর সাথে দেখা করেন। জুন্নু বললেন এভাবে আর বসে থাকা যায় না। কারণ মুসলীম লীগের লোকেরা পিস কমিটি গঠন করছে, রাজাকাররা ট্রেনিং নিয়ে আসবে ইত্যাদি। জুন্নু ইদ্রিস মিয়াকে বললেন, গোপালগঞ্জ থেকে পাওয়া ৬টা রাইফেল আমার কাছে আছে। রাইফেলগুলো আজ রাতেই নিয়ে তোমার কাছে রাখবা এবং প্রয়োজনে কাজে লাগাবা। রাইফেলগুলো তিনি নিয়ে এলেন বাড়িতে। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেলো, এপ্রিল পার হলো, রজাকাররা গ্রামে আসতে শুরু করেছে। মে মাসের প্রথম দিকে এলাকার একদল ছেলে নিয়ে রওনা হলেন ভারতের উদ্দেশ্যে। মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস মিয়ার সঙ্গে ছিলেন রামদিয়া কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান ড. আব্দুল জলিল মিয়া, ডা. আবুল খায়ের (বাচ্চু), গাজী বেলায়েত হোসেন, মোল্লা আবুল খায়ের (রতন), আবু বকর সিকদার, হাচান গাজী, মজিবর রহমান মোল্লা, সিরাজুল ইসলাম মোল্লা ও আরো অনেকে। মোট সঙ্গীসাথীর সংখ্যা ছিল ২২ জন। বাগদা বর্ডারের কাছে পৌঁছাতেই দেখেন প্রায় ৫ হাজার শরণার্থীকে রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকেরা আটক করেছে। টাকা দিয়ে ছাড়া পেতে হবে। ঐ দলের লোকেরাও বাদ পড়লেন না টাকা দেওয়া থেকে। পথ চলছেন, হঠাৎ বর্ডারের উভয় পাশ থেকে আরম্ভ হয় বোমবিং, থর থর করে কাঁপল মাটি। যে যেদিকে পারে দৌড়ে বর্ডার পার হলো। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ এই ইদ্রিস মিয়া ড. আব্দুল জলিলকে সঙ্গে নিয়েই পার হতে লাগলেন। একটু এগিয়ে দেখেন একটা ফুটফুটে ছেলে কাত হয়ে পড়ে আছে। কোনো কান্না নেই তার। স্যারকে বলে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন। সীমান্তের কাছে যেতেই বাচ্চাটার মা বাচ্চাটাকে চিনতে পেরে দৌড়ে এসে তাঁকেসহ বচ্চাটাকে জাড়িয়ে ধরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কিছু সময় পর তারা জ্ঞান ফিরে পায়। মা তার ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ছেলে হারানোর বেদনা এবং হারানো ছেলে ফিরে পাওয়ার আনন্দ এই দুয়ে মিলে অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

www.pathagar.com

এরপর তিনি বাসে করে (তার সঙ্গীদের নিয়ে) বনগাঁ বাজারে এসে খাওয়া-দাওয়া শেষ করেন এবং সেখানে থাকেন। পরের দিন সকালে টালীখোলা ক্যাম্পে এসে সকলকে ভর্তি করে দিলেন। স্যার আব্দুল জলিলকে সঙ্গে নিয়ে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা কলকাতা যান এবং আইডিয়াল হোটেলে ওঠেন। হঠাৎ দেখা হয় পূর্বপরিচিত ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের সাবেক ভিপি আফজালের সঙ্গে। তিনি বলেলন আর কোনো ছেলে আছে কিনা। আরও বলেলন ছাত্রলীগের মেট্রিক পাস করেছে এমন ছেলেদের নামের তালিকা তৈরি করতে হবে। টালীখোলা ক্যাম্পে ফিরে এসে এলাকার সমস্ত ছেলেদের নিয়ে মোট ৬৩ জনের নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং আফজালের কথামতো তোফায়েল আহমদের সাথে দেখা করেন। তোফায়েল সাহেব বললেন আগামীকাল শিয়ালদা ট্রেন স্টেশনে এসে আমার সাথে দেখা করবা এবং উত্তর প্রদেশে উচ্চতর ট্রেনিংয়ের জন্য যেতে হবে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী মিয়া তার ৬৩ জনকে নিয়ে শিয়ালদা এসেই তোফায়েল সাহেব এবং সিরাজুল আলমের দেখা পান। হাচান ভাই এবং সিরাজ ভাইকেও যোগ করলেন ঐ দলে। রাত ১০টায় ট্রেনে করে সকাল ৭টায় শিলিগুড়িতে পৌঁছান। এখানে রেট ক্যাম্পে দুইদিন থাকার পর সকলে কার্গো প্লেনে করে সাহারানপুর আর্মি বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছান। এখান থেকে আবার ট্রাকে করে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে দেরাদুনের তান্দুয়া ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছান। সেখানে শুরু হলো ট্রেনিং। প্রায় দুইমাস প্রশিক্ষণ শেষে একদিন প্রশিক্ষণে সকালের পি.ডি প্রায় ১ ঘণ্টা অতিরিক্ত করানোর কারণে সকালে নাস্তা করার সময় হলো না। না খেয়ে ক্লাস করার জন্য দুপুরে তিন ব্যারাকের ছেলেদের নিয়ে অনশন আরম্ভ করেন। ক্যাম্প কমান্ডার জেনারেল উবানের অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধারা। এই প্রেক্ষাপটে মুজিব বাহিনীর চার নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক এবং সিরাজুল আলম খান এই তান্দুয়া ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছান। তোফায়েল আহমেদ এবং সিরাজুল আলম খান বলেন, পরের দেশে এসে কেন অনশন করলে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস মিয়া তাদের দোষ তুলে ধরতে সক্ষম হলেন।

এর কয়েক দিন পর প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে এলেন পশ্চিম বাংলার ব্যারাকপুরের রেট ক্যাম্পে। কয়েক দিন থাকার পর তোফায়েল আহম্মদ মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ৯-১০ জন করে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। কাশিয়ানী থানার ছেলে বেশি ছিল বিধায় এখানে দুইটা টিম করে দিলেন। ভারত থেকে আসার সময়টাই ছিল তাদের বিপদ মুহূর্ত। এই বিপদ সংকুল পথের একমাত্র দিশারী ছিলেন সীতারামপুরের মোকছেদ সিকদার এবং ঘোনাপাড়ার রহমান, যাদের কথা স্মরণ করতেই হয়। ভারত থেকে আসার পথে আর্মস চেম্বারে গুলি উঠিয়ে পথ চলতে হয়েছিল। শুধুমাত্র ট্রিগার চাপ দিলেই ফায়ার হবে। কালীগঞ্জের প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ দিয়ে সিএমবি রাস্তা পার হওয়ার সময় দলের এক অংশ রাস্তা পার হওয়া মাত্র কয়েকটা আর্মির গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। আর্মস ধারী কেউই অবশ্য রাস্তার উপর ছিল না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিছু সময় পরে তারা আবার এক জায়গায় জড় হয়ে শুরু করে পথচলা। প্রায় দুই ঘণ্টা পথচলার পর একটা বাজারে পৌঁছান। তখন সকাল হয়ে যায়। তাড়াহুড়া করে পাশে এক বাড়িতে আশ্রয় নেয় তারা। বাড়িওয়ালা অবশ্য আওয়ামী লীগের লোক ছিলেন। তারই চেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধাদের পারের জন্য নৌকা ঠিক করা এবং খাবারের ব্যবস্থা হয়। অস্ত্রধারীদের গায়ের কাঁদা ধোয়ার সময় হঠাৎ ফায়ার হয় খালেকের অস্ত্রে। আহত হয় নিজগার আকবর আলী,

www.pathagar.com

মতিয়ার রহমান, আর একজন ঐ বাড়ির ১০-১২ বছর বয়সী একটা ছেলে। তারা প্রত্যেকেই ভালো হয়। ওখানে খাবার খাওয়া হয় না তাদের। কেননা মাত্র তিন মাইল দূরেই ছিল পাক আর্মি ক্যাম্প। পুরো দুই দিন পরে রাত ১১টার সময় ছাইফুর রহমান ছাইফু ভাইয়ের বাড়িতে খাবার খায় তারা। পরের দিন সকাল হতে না হতেই নূরুল কাদীর, জুন্নুমিয়া এবং ডা. আব্দুস সামাদ মুক্তিযোদ্ধাদের এনে ঘৃতকান্দী গ্রামে থাকার ব্যবস্থা করেন। এখানে ইদ্রিস মিয়া এবং বেলায়েত ছাড়া আরো একটা দল জগলুল কাদির জুলু ভাইয়ের। এই সময় জুন্নু ভাইয়ের নেতৃত্বে একটা সিভিল প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। আওয়ামী লীগের যারা দেশে ছিলেন তাদের নিয়ে এই প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। পরে এই সিভিল প্রশাসন বৃহত্তর ফরিদপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনা পর্ষদ নামে পরিচিত হয়। তখন এর অফিস হয় ওড়াকান্দিতে। অক্টোবরের শেষের দিকে ক্যাপ্টেন বাবুল সাহেব আসেন এখানে। এই সময় ডা. সালেক সাহেবও এসে এই ওড়াকান্দিতে যোগ দেন। জুন্নু ভাইয়ের নিরলস প্রচেষ্টার ফসলই ওড়াকান্দি মুক্তিযোদ্ধাদের বিশাল এই ক্যাম্প। মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারের ব্যবস্থা করতো এই সিভিল প্রশাসন। এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন জুন্নু ভাই, যে ব্যক্তিটি বার বার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। আরও ছিলেন ডা. আব্দুস সামাদ, চেয়ারম্যান, পুইশুর ইউ.পি, আব্দুস সালাম সরদার, চেয়ারম্যান, ওড়াকান্দি, টেপুমিয়া, চেয়ারম্যান, মাহমুদপুর ইউ.পি, এবং আরো অনেকে। ১৯৭১ সালের ডায়েরি হারিয়ে যাওয়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস মিয়া তারিখ দিতে ব্যর্থ হলেও মাস-সপ্তাহ ঠিক আছে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ভারত থেকে দেশে আসেন সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে। এসেই তিনি উপরের নির্দেশ মতো বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিং সেন্টার খুলে ছেলেদেরকে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা ভাটিয়াপাড়া আক্রমণ করে। তুমুল যুদ্ধ হয় সেখানে।

মুক্তিযোদ্ধারা ২০ রাউন্ড গুলি ছুড়লে শত্রুপক্ষ ছাড়ে কম করে দুই হাজার রাউন্ড। এভাবেই শত্রু পক্ষকে বিব্রত করত মুক্তিযোদ্ধারা যাতে করে শত্রুপক্ষ গ্রামে ঢুকে লুট-পাট, জ্বালাও-পোড়াও না করতে পারে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ঘৃতকান্দি থাকা অবস্থায় খবর পেলেন ফুকরায় পাক আর্মি আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ইদ্রিস মিয়ার যোদ্ধা এবং বেলায়েত গাজীর বিশ মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ফুকরা গ্রামে আসেন এবং দেখেন তারা নদীর ঘাটে লঞ্চ ভিড়িয়ে ট্রেনিং দিচ্ছে। তখন ইদ্রিস মিয়া তার এবং চান সরদার সাহেবের সকল সহযোদ্ধাদেরকে জঙ্গলের মধ্য গিয়ে পজিশান নিয়ে পরামর্শ করেন—প্রথম আক্রমণ কি পদ্ধতিতে করলে শত্রুদেরকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে। ঠিক এমন সময় একটা মিস ফায়ার হয়। সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় শুরু হলো। যুদ্ধ চলল প্রায় এক ঘণ্টা। পরে আস্তে আস্তে উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণ থেমে যায়। দেখা গেলো পরের দিন পাকআর্মি আর গ্রামে অত্যাচার করতে নামেনি।

উক্ত ঘটনার একসপ্তাহ পরে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সন্ধ্যার সময় খবর এলো ফুকরাতে পাক আর্মি আবার এসেছে। যোদ্ধারা বুঝতে পারল আগামী দিনে পাকআর্মি বা রাজাকাররা গ্রামে নেমে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে গুলি করে হত্যা করা থেকে শুরু করে কোনো প্রকার অত্যাচার করতে আর বাকি রাখবে না। খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইদ্রিস মিয়ার টিমের এবং বেলায়েত গাজীর টিমের সকলকে নিয়ে ফুকরাতে পৌঁছালেন। যেয়ে দেখলেন

www.pathagar.com

আর্মিদের লঞ্চ ভিড়ছে দক্ষিণ ফুকরার পুরাতন লঞ্চ ঘাটে এবং লঞ্চের উপর ও নীচে টর্চ জ্বালিয়ে সেন্টি পাহারা দিচ্ছে। নদী তখন কানায় কানায় ভরপুর। নদীর কূল বেয়ে গ্রামে ঢোকার সুযোগ নেই বললেই চলে। ঢোকার রাস্তা মাত্র একটা। সবকিছু দেখে শুনে এ্যাম্বুশের ব্যবস্থা করলেন। এলএমজি কভারিংয়ে রেখে একটা শক্তবুশ তৈরি করলেন। রাস্তায় ছিল একটা বাঁশের সাঁকো হিটিং পয়েন্টে রাখলাম, ওরা বাঁশের সাঁকো পার হলেই হিট করা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক করতে প্রায় ৪টা বেজে গেলো। আর্মিদের আসার রাস্তার দুই পাশেই পানি ছিল। আস্তে আস্তে সময় পার হতে লাগল। পূর্ব আকাশে লাল সূর্য টকটক করে উপরে উঠছে, এমন সময় সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দেওয়া হলো-ওরা বাঁশের সাঁকো পার হলেই আক্রমণ করতে হবে। বলতে না বলতেই পাকআর্মি ও রাজাকাররা বাঁশের সাঁকো পার হলো। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারও ওপেন করা হলো। মুক্তিযোদ্ধারা আমগাছে ভরা একটা পুকুর পাড়ে পজিশন নিয়েছিল। আম গাছের দূরত্ব রাস্তা থেকে মাত্র ২৫ গজ হবে। ইদ্রিস মিয়ার সঙ্গে ছিল ফরিদ আহমেদ মোল্যা, সিরাজুল ইসলাম তিলছাড়া, মোরতোজ আলী মৃধা, জোনাসুর ও আয়ুল হক শরীফ বাহিরবাগ। ফরিদ গুলি করার সাথে সাথে বলে উঠল ভাইজান আমার গুলিতে একজন পড়ে গেছে। কমান্ডারের নিষেধ সত্ত্বেও জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে দেয়। প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে তুমুল যুদ্ধ চলল। কমান্ডার ইদ্রিস মিয়ার কাভারিংয়ে ছিল গাজী বেলায়েত হোসেন, আবুল খায়ের রতন, মজিবর রহমান মোল্যা, আজিবর রহমান, গোলাম মোস্তফাসহ আরো অনেকে। পাকআর্মি ও রাজাকাররা রাস্তার আড় নিয়ে তীব্রভাবে গুলি করছে ও এগুচ্ছে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর পজিশনটা এমন একটা জায়গায় ছিল, যেখান থেকে সরে আসতে হলে ওদের থেকে ১০ গজের ভিতর দিয়ে আসতে হবে। মুক্তিবাহিনীর পিছনে ছিল বর্ষার পানি। প্রথমে ভাবতেই পারেনি যে মুক্তিবাহিনীদের পিছু হটতে হবে। এমনভাবে কভারিংটা সাজানো ছিল যে, ওরা রাস্তায় আড় নিলেই মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কভারিং ফায়ার দিলেই ওদের একটা সৈনিকও ফিরে যেতে পারবে না। ওদের হেলমেট দেখা যাচ্ছে যে ওরা এগুচ্ছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় মুক্তিবাহিনীর কভারিং থেকে কোনো ফায়ার আসছে না। তখন ইদ্রিস মিয়া দেখলেন আমরা আটকা পড়ে গেছি। কিন্তু আমাদের পাঁচজনের মৃত্যু জেনেও ওদের সামনা-সামনি ১০ গজের মধ্যে ক্রোলিং করে গুলি করতে করতে পিছু হটতে শুরু করেন মুক্তিযোদ্ধারা। আল্লাহর অশেষ রহমত কোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই প্রাণে বেঁচে গেলো তারা। এদিনও পাকআর্মি গ্রামে কোনো অত্যাচার করেনি। সম্ভবত অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে শেখ শহিদ ভাই খবর দিলেন দুজন বিদেশি সাংবাদিক এবং আমাদের দেশের একজন দোভাষী কমান্ডার ইদ্রিস মিয়ার কাছে যাবে। ঐ সাংবাদিকদেরকে ভারতীয় কোনো আর্মস দেখানো যাবে না। ওদের দেখাতে হবে যা বাংলাদেশের ভিতর থেকে জোগাড় করা হয়েছে। ঠিক সেইভাবেই তাদের সাথে কাজ হলো।

তারা জানতে চাইল মুক্তিবাহিনীরা পাকআর্মি ও রাজাকারদের সঙ্গে কি কি ভাবে যুদ্ধ করে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা বলল আমরা দিনের বেলায় ভাটিয়াপাড়ায় আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করলে সঙ্গে সঙ্গে ওদের যুদ্ধবিমান এসে গুলিবর্ষণ করবে। সাংবাদিকরা তখন এই অবস্থান স্বচক্ষে দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। তখন কমান্ডার ইদ্রিস মিয়া ১৫ জন সহযোদ্ধা নিয়ে ভাটিয়াপাড়া আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে যুদ্ধ বিমান এসে আকাশ থেকে ড্রাইভ দিয়ে নীচে

www.pathagar.com

এসে এলএমজি দিয়ে গুলিবর্ষণ করতে করতে উপরে উঠে যায়। বার বার এভাবে গুলি করতে থাকে। সাংবাদিকরা সব ছবি তুলে নিতে সক্ষম হলেন। কমান্ডার ইদ্রিস মিয়া সারাদিন তাদের সঙ্গে কাটালেন। সম্ভবত অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখ দক্ষিণ ফুকরা লঞ্চঘাটে পাকআর্মি ও রাজাকাররা তিনটা লঞ্চে এসে ফুকরা গ্রামে নেমে বাড়িঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় এবং পরে লঞ্চে করে তারা ভাটিয়াপাড়ার দিকে চলে যায়। তখন ঐ এলাকার মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিল, সকল দলের কমান্ডাররা ফুকরা স্কুলে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেয় পাক আর্মিরা ভাটিয়াপাড়া থেকে ফেরার পথে তাদেরকে আক্রমণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত মোতবেক মুক্তিবাহিনীরা মধুমতীর কূল ঘেষে প্রায় ২ কিলোমিটার নিয়ে পরিখা খনন করে পজিশন নিয়ে নেয়। মরিচা গ্রামবাসী মুক্তিবাহিনীকে পরিখা খনন থেকে শুরু করে খাবারের ব্যবস্থা করে দিবে। সর্বোপরি গ্রামবাসীর মনে আনন্দ আর ধরে না। তাদের ধারণা পাকআর্মিদের সাথে যুদ্ধ হবে আর তারা পরাজিত হবে। বাড়িঘর জ্বালানোর চরম প্রতিশোধ নিতে পারবে বলে তাদের উল্লাস। পাকআর্মিরা ২ দিন পরে সম্ভবত ৩১শে অক্টোবর দক্ষিণ ফুকরা লঞ্চঘাট সোজা এলে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে লঞ্চকে লক্ষ্য করে প্রথমে এনেগা গ্রেনেট ফায়ার করে। শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছে। পাকআর্মিরা সামনা-সামনি নদীর পাড়ে উঠতে পারছে না। পাকহানাদার বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা অগণিত। উভয়পক্ষের গোলাবর্ষণে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। মুক্তিবাহিনীর বিজয় সুনিশ্চিত প্রায়। ঘণ্টা খানেক পরে উত্তর পাশ থেকে একদল হানাদার বাহিনী ক্রোলিং করে মুক্তিবাহিনীর অতি সন্নিকটে এসে ফায়ার শুরু করে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং লঞ্চের সামনে যারা মরিচায় ছিল তারা আর মরিচা থেকে উঠে আসার সুযোগ পায়নি। এই যুদ্ধের শেষের দিকে শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। পরে হানাদার বাহিনী গ্রামে ঢুকে ১২৫ জন সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। পাকহানাদার বাহিনীর গুলিতে মুক্তিবাহিনীর ১৪ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখযুদ্ধে শহিদ হন। যারা বীরত্বের সাথে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে আত্মাহুতি দিয়েছেন এই ফুকরা রণাঙ্গনে, পরম শ্রদ্ধার সাথে তাদের স্মরণ করে এলাকাবাসী। এ যুদ্ধে শহিদ হন–

১. শহিদ আলী আকবর সরদার, পিতা- মহিদুল সরদার, গ্রাম : ফুকরা

২. শহিদ রেজাউল কারিগর, পিতা- ছারেন উদ্দিন কারিগর, গ্রাম- দঃ ফুকরা

৩. শহিদ আবু কারিগর, পিতা- কানাই কারিগর, গ্রাম- দঃ ফুকরা

৪. শহিদ রবিউল সিকদার, পিতা- মোকসেদ সিকদার, গ্রাম- দঃ ফুকরা

৫. শহিদ ইমাম হোসেন মিয়া, পিতা- মোকছেদ মিয়া, গ্রাম-ছোট বাহিরবাগ

৬. শহিদ হাবিবুর রহমান সরদার, গ্রাম- ছোট বাহিরবাগ

৭. শহিদ আবুল হোসেন, গ্রাম- সাতাকিয়া

৮. শহিদ আব্দুল মান্নান, গ্রাম- দহিসারা

৯. শহিদ চাঁন মোল্লা, পিতা- মজিদ মোল্লা, গ্রাম : খাগাইল।

১০. শহিদ নূরু মিয়া প্রমুখ।

বৃষ্টি শেষে সন্ধ্যা নেমে এলো। শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে পৌছানোর ব্যবস্থা করলেন সহযোদ্ধারা। সারা এলাকায় নেমে এলো শোকের ছায়া। সহযোদ্ধারা ভাই

www.pathagar.com

হারানোর ব্যথায় ভেঙে পড়ে তারা একে অপরের গলা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ নিস্তব্ধতা বড় করুণ নিস্তব্ধতা। কতটা মর্মাহত ছিল ভাষা দিয়ে তা বোঝানো যায় না। হাজার হাজার মানুষ শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের দেখতে এসেছে, মুখে কোনো শব্দ নেই। সবারই চোখে জল। সে কি নিদারুণ ব্যথা। শোকাহত মানুষ। এ দৃশ্য সেদিন যে দেখেছে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার এ ব্যথার স্মৃতি জাগ্রত থাকবে। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা পরিকল্পনা করে ফরিদপুর থেকে যাতে আর্মি না আসতে পারে সেজন্য ঘোড়াখালির ট্রেন ব্রিজ ভেঙ্গে দিতে হবে। ইসমত কাদির গামাসহ ১৫ জন ব্রিজের দিকে রওনা হয়। গোপালগঞ্জ থেকে আনা হয় Explosive-এর কাজের জন্য জয়ন্ত সরকারকে। প্রথমে আবু জাফর সিদ্দিকির সঙ্গে যোগাযোগ করায় তিনি বিরক্ত বোধ করলেন। পরে ব্রিজের পশ্চিম পাশে এক মাস্টারের সাথে, সে আমাদের ৪ খানা সাবল আধা ঘন্টার মধ্যে ব্রিজের কাছে পৌঁছে দিলেন। সবাইকে নিয়ে ব্রিজের কাছে গিয়ে আমরা Explosive-এর কাজ শুরু করলাম। প্রেসার চার্জ বসাতে প্রায় শেষ রাত্রি হয়ে গেলো। চার্জ বাস্ট করানো হলো, রেলের ব্রিজের কোনো চিহ্ন রইল না। কাজ সম্পন্ন করায় আনন্দ ছিল পৃথিবী জয় করার মতো। এ কাজের সঙ্গে আমি নিজে, ইসমত কাদিরগামা, গোপালগঞ্জের জয়ন্ত সরকারসহ আরো ১২-১৪ জন যুক্ত ছিলাম। এরপর মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প রামদিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। রামদিয়াতে পাক-আর্মি আক্রমণ করতে পারে এই ভেবে রামদিয়ার দক্ষিণ পাশে নড়াইল গ্রামে খাল পাড়ের নাপিত বাড়িতে সেন্ট্রির ব্যবস্থা করলাম। হঠাৎ একদিন সেন্ট্রির চোখ ফাঁকি দিয়ে পাকরা রামাদিয়া চলে আসে। মুক্তিবাহিনী তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে, পজিশন নেওয়ার আর কোনো সময় থাকে না। শুধুমাত্র অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পালাতে বাধ্য হলো। বাকি যা পড়ে ছিল আর্মিরা তা সব তছনছ করে দিলো। কয়েকদিন যাওয়ার পর মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প রাতৈল স্থানান্তরিত করা হয়। এই রাতৈল থেকে ভাটিয়াপাড়া আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করার সাথে সাথে শুরু হলো তুমুল গোলাগুলি। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনী। কোনো কোনো দিন মুক্তিবাহিনীরা ওদের বের হবার পথে অ্যামবুশ পাতে, কারণ অ্যাম্বুশের ভিতর খুব সহজে পাক-আর্মিদের ঘায়েল করা যাবে।

একদিন খুব ক্লোজে গিয়ে অ্যামবুশ পাতেন কমান্ডার ইদ্রিস মিয়া। অ্যামবুশ থেকে উঠে আসার সময় আমার এক সহযোদ্ধা আর্মি ক্যাম্পকে লক্ষ করে ২ রাউন্ড ফায়ার করে। সারা নভেম্বর মাস ধরে ভাটিয়াপাড়া আর্মি ক্যাম্পে নিয়মিত অ্যামবুশ আক্রমণ চলে। একদিন নভেম্বরের ২য় সপ্তাহে ইসমত কাদির গামা নিজেই তার লোকজন নিয়ে ডিফেন্সে যান। ভোর হয়ে আসছে, পরক্ষণে ভাটিয়াপাড়ার দিকে লঞ্চের শব্দ শোনা গেলো। আমি তাড়াহুড়া করে আমার সহযোদ্ধাদের রেডি করে গন্তব্যস্থলে হাজির হয়ে ইসমত কাদির ভাইয়ের অবস্থান দেখে আমার সহযোদ্ধাদের পজিশনে দিয়ে দাঁড়িয়েছি। এ জায়গা ছিল রাজাকার রউফ মৌলভীর বাড়ির উত্তর পাশে রাস্তার ধারে। হঠাৎ পাক-আর্মিরা রাস্তায় নেমে আসে। ইসমত কাদির গামার কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি ফায়ার ওপেন করা। তখন দৌড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমি তখন আমার সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলাম ফায়ার করার। সেই সাথে ইসমত কাদির গামাসহ সকলেই বেঁচে যায়। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে একটি রাত্রিও বাদ যায়নি ভাটিয়াপাড়া অ্যাম্বুশ

www.pathagar.com

ও গোলাবর্ষণ থেকে। ক্রমেই মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ জোরদার হচ্ছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ আক্রমণ আরো জোরদার হয়। কেননা ভাটিয়াপাড়া আর্মি ক্যাম্পে গোলাবারুদ আসার কোনো সুযোগ থাকে না। এক কমান্ডারের সহযোদ্ধা ও অন্য কমান্ডারের সহযোদ্ধারা এক হয়ে গেছে। ফলে দলও বেড়ে গেছে, যুদ্ধের গতিও বেড়ে গেছে। সম্ভবত ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ১৩ তারিখ তিন টিমের মুক্তিযোদ্ধা একত্রে ভাটিয়াপাড়ার আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করে। ১৬ই ডিসেম্বর সারাদেশে পাক আর্মি আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু ভাটিয়াপাড়ার পাক-আর্মিরা আত্মসমর্পণ করছিল না। তখন এলাকার সকল মুক্তিযোদ্ধা এক হয়ে বিরামহীনভাবে গুলিবর্ষণ শুরু করে। ২ দিন অবিরাম গুলিবর্ষণের পর তৃতীয় দিনে ১৯শে ডিসেম্বর ১০টার দিকে মাইকে বলা হলো তোমরা আত্মসমর্পণ কর। এ ছাড়াও প্রায় দেড় মাস পূর্বে সাব্বির খান নামে এক পাকআর্মির নায়েক অ্যাম্বুশের গুলি খেয়ে ধরা পড়ে। তাকে দিয়ে ওদের ভাষায় বলানো হয় এবং সকল আর্মি আত্মসমর্পণ করেছে এটা জানানো হয়। তাদের মেরে ফেলানো হবে না এ আশ্বাস দেওয়া হয়। এমনকি কুরান শপথে এ কথা বলা হয়। তখন পাকআর্মিরা আত্মসমর্পণ করতে স্বীকার করে।

কথা অনুযায়ী কমান্ডারদের সিদ্ধান্ত হলো কমান্ডার ইদ্রিস মিয়া একা পাক আর্মিদের ক্যাম্পের ভিতর ঢুকবে। ইদ্রিস মিয়া ঢুকে দেখেন ওরা তখন বিড় বিড় করে সুরা কালাম পড়ছে। ভিতরে গিয়ে ইদ্রিস মিয়া তাদের অস্ত্র ও গুলি ক্লোজ করেন। একজন বেলুচ সৈন্য ঘরের সিঁড়িতে তার হাতে থাকা একটা চাইনিজ স্টেনগান পেটে ঠেকিয়ে পা দিয়ে ট্রিগার চাপ দিল। ওদের সকলকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে অন্যান্য রাজাকার আলবদর এবং পুলিশ দারোগাকে অন্য লাইনে দাঁড় করিয়ে চোখ এবং হাত বেঁধে ফেলা হলো। পরের দিন সকাল ১০টার সময় পাক আর্মিদের সঙ্গে করে ইসমত কাদির গামা ও কমান্ডার ইদ্রিস মিয়া আরো ১৫-১৬ জন সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে যশোরে ওদেরকে এবং ওদের আর্মসগুলো জমা দিয়ে আসে। তখন যশোরে দায়িত্বে ছিলেন ২ জন বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা।

এমন একটি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে কখনও কোনো লেখক বা কোনো ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেননি। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে বলেও এলাকাবাসী এর কোনো সদুত্তর বা ব্যবস্থা পায়নি বিধায় তাদের স্বজন হারানোর ব্যথা গুমরে গুমরে ফিরছে। স্বজন হারানোর বেদনা আজও তারা চেপে রাখতে পারে না। তাদের মনের প্রবল ইচ্ছা এই ফুকরা গ্রামে সরকারিভাবে একটা শহিদ মিনার হোক। যাতে করে তারা প্রতিবছর অন্তত একবার দোয়া মাহফিলের ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধে কোটালীপাড়া

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে কোটালীপাড়ায় ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। পাকহানাদার বাহিনীর পৈশাচিক নির্যাতনে অসংখ্য মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় ভারতে। অসংখ্য মানুষ নিহত হন পাক দস্যুদের হামলায়। সেনাবাহিনীর বীর সৈনিক হেমায়েত উদ্দীনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী। তাঁর দক্ষ

www.pathagar.com

পরিচালনায় পুরো ৯টি মাস কোটালীপাড়া মুক্ত থাকলেও হানাদার বাহিনী প্রায়ই হানা দিয়ে শত শত বাঙালি সন্তানকে গুলি করে হত্যা করেছে। এসব শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মো. ইব্রাহীম, মো. গোলাম আলী, মো. মোক্তার হোসেন, আবুল বাসার হাওলাদার, আবুল খায়ের খান, মোতাহার খান, আকবর গাজী, মোক্তার হোসেন, আবু তালেব আলী, বেলায়েত হোসেন শেখ, শ্রী রতন কুমার, ওসমান শেখ, বেলায়েত হোসেন, মকবুল হোসেন, আব্দুস সালাম তালুকদার, আব্দুস সাত্তার মৃধা, আবুল বাশার খান, সেকেন্দার আলী, নূরু বেপারী, পরিমল শীল, জহিরুল হক ফকিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কোটালীপাড়ার হেমায়েত বাহিনীর স্মৃতি ফলকে শহিদদের তালিকা

কোটালীপাড়ার মুক্তিযুদ্ধের বিমান বাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার শেখ জাবেদ আলী, কাজী আশরাফ উদ্দীন আহমেদ, শেখ আবদুল আজিজ, আবদুল গফুর পাইক, চিত্তরঞ্জন গাইন, নোমান খন্দকার, শেখ আবদুল আজিজ ছোট, মো. লিয়াকত আলী মোল্লা, শেখ হাবীবুর রহমান, কমলেশ বেদজ্ঞ ও আশালতা বৈদ্য বিশেষ অবদান রাখেন। মুক্তিসেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রথমে কোটালীপাড়া কলেজ, পরে কুমরিয়া ও জহরের কান্দিতে ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়। ট্রেনিং সেন্টারের মূল দায়িত্ব পালন করেন হেমায়েত উদ্দীন বীর বিক্রম ও শেখ জাবেদ আলী। কোটালীপাড়া থানা প্রথম অপারেশনে হেমায়েত উদ্দীনের নেতৃত্বে মুজিবুর রহমান, তৈয়াবুর রহমান, মতিয়ার রহমান ও ইব্রাহিম প্রমুখ অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ৯ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর (অব.) জলিল কমান্ডার হেমায়েত উদ্দীনকে সুবেদার পদে উন্নীত করেন।

www.pathagar.com

ছ. রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জন্ম. টুঙ্গিপাড়া গ্রাম, গোপালগঞ্জ, ১৭ মার্চ ১৯২০। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও রাষ্ট্রনায়ক। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন একজন জোতদার ও গোপালগঞ্জ আদালতের নাজির। মাতা সায়রা খাতুন। চার বোন, দুই ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয়। তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখন তিন বছর বয়স্কা জ্ঞাতিভগ্নী ফজিলাতুন্নেসা (রেনু) সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ১৯৪১-এ মেট্রিক, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৪-এ আই.এ. এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৬-এ বি.এ. পাস। স্কুলজীবনে গোপালগঞ্জ সফরে এলে বাংলার তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নজরে পড়েন। ইসলামিয়া কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়ার পর পর এই সম্পর্ক গাঢ় হয়। সে সময় থেকে সোহরাওয়ার্দীর একজন অনুসারী হিসেবে কলকাতায় মুসলিম ছাত্র আন্দোলন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আবুল হাশিম নেতৃত্বাধীন বামপন্থি গ্রুপের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। 'নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন', নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের' কাউন্সিলার এবং 'গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের' সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত। ১৯৪৬-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। সিলেটের গণভোট অনুষ্ঠানকালে (৬ ও ৭ জুলাই-১৯৪৭) মুসলিম লীগের পাঁচশত কর্মী তাঁর নেতৃত্বে কাজ করে। এই গণভোটে মুসলিম লীগের বিরাট সাফল্য অর্জনের পশ্চাতে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার দরিদ্র মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট-১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ল' ক্লাসে ভর্তি। মুসলিম লীগ সরকার জনকল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক, গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ না করার প্রতিবাদে এ সময় মুসলিম লীগ ত্যাগ। সরকারের জনস্বার্থবিরোধী স্বৈরাচারী নীতির বিরোধিতা ও পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ১৯৪৮-এ ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' গঠিত। তিনি ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। একই বছর 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত (২ মার্চ-১৯৪৮) হলে এর সঙ্গে যুক্ত। এবছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে হরতাল পালনের সময়ে ঢাকায় গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ। 'বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে পূর্ববঙ্গ পরিষদে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে' এ মর্মে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নাজিমুদ্দীন সরকার চুক্তিবদ্ধ হলে জেল থেকে মুক্তিলাভ (১৫ মার্চ ১৯৪৮)। ১৯৪৯-এর মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি দাবির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ও গ্রেফতার। একই বছর ২৩ জুন (১৯৪৯) পুরনো ঢাকার রোজগার্ডেনে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হলে কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় এর যুগ্ম-সম্পাদকের পদ লাভ। খাদ্য সংকটের ব্যাপারে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে ১৯৪৯-এর অক্টোবর মাসে আর একবার গ্রেফতার। বন্দীদশায় বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে ফরিদপুর কারাগারে অনশন ধর্মঘট পালন (১৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। ২৮ ফেব্রুয়ারি

www.pathagar.com

(১৯৫২) মুক্তি লাভ। ১৯৫৩-তে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৪-র মার্চের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে গোপালগঞ্জ এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। অতৎপর শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রী নিযুক্ত (৪ মে ১৯৫৪)। একই বছর ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা প্রয়োগ করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ববঙ্গে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করলে গ্রেফতার হন। একই বছর ডিসেম্বর মাসে মুক্তি লাভ। ১৯৫৫-র জুন মাসে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর ২২ অক্টোবর কাউন্সিল সভায়, 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে দলকে অসাম্প্রদায়িক করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। ১৯৫৬-র ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত 'পুর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের' শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত। আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করে গড়ে তোলার উদ্দেশে দলের কাউন্সিল সবার প্রস্তাব অনুসারে ১৯৫৭-র জুলাই মাসে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে কারারুদ্ধ ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত। সামরিক সরকার কর্তৃক বিভিন্ন অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ডজনখানেক মামলা দায়ের। আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সব মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে মুক্তি লাভ করলেও গৃহে অন্তরীণ অবস্থায় বছর দুয়েক দিনযাপন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারকে (৩০ জানুয়ারি ১৯৬২) কেন্দ্র করে ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-বিক্ষেভ শুরু হলে পুনরায় গ্রেফতার। ১৯৬২-১৯৬৩-তে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এনডিএফ (ন্যাশনাল জেমোক্রিটিক ফ্রন্ট) দেশব্যাপী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন চালালে তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। সোহরাওয়ার্দীর আকস্মিক মৃত্যুতে (৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩) এনডিএফ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে দেশকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে উদ্ধারকল্পে ১৯৬৪-র ২৫ জানুয়ারি তৎকর্তৃক আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবন। একই বছর ২৫ জুলাই (১৯৬৪) 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (কপ) গঠন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এবং আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় অনুষ্ঠিত (২ জানুয়ারি ১৯৬৫) দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ফাতেমা জিন্নার নির্বাচনী প্রচার অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (৬-২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫) সমাপ্তির পর উভয় দেশের মধ্যে 'তাসখন্দ চুক্তি' স্বাক্ষরের (১০ জানুয়ারি ১৯৬৬) পটভূমিকায় ১৯৬৬-র ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের এক সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে ৬ দফা কর্মসূচি পেশ। সর্বজনীন ভোটাধিকা, ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, কেন্দ্র ও প্রদেশের জন্য পৃথক মুদ্রা (দুই মুদ্রা) ব্যবস্থা, প্রাদেশিক সরকারকে কর ও শুল্ক ধার্যের ক্ষমতা প্রদান, প্রাদেশিক সরকারকে বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণের ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পণ এবং প্রদেশগুলোকে আঞ্চলিক বাহিনী সংরক্ষণের অধিকার দেওয়ার দাবি ৬ দফায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই বছর ২০ মার্চ (১৯৬৬) আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত। অতঃপর ৬ দফার পক্ষে জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার অভিযান শুরু। এ কর্মসূচির ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন এবং তা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের

www.pathagar.com

কাছে মূল দাবি হিসেবে ধরা দেয়। ১৯৬৬-র ৮ মে সরকার কর্তৃক নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার। তাঁর মুক্তি ও ৬ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ৭ জুন (১৯৬৬) আওয়ামী লীগের ডাকে পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত। ১৯৬৮-র ১৭ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ। কিন্তু একই রাতে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে তাঁকে ঢাকা ক্যান্টমেন্ট স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁকে প্রধান আসামি করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' (১৯ জুন ১৯৬৮-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯) সূত্রপাত। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছিল : 'অভিযুক্তরা ভারতীয় অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিয়ে কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র করেছিলেন।' ৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের গণ-অভ্যুত্থানের চাপে আইয়ুব সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্তি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান এবং 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত। দেশের বিবাদমান রাজনৈতিক সংকট মীমাংসাকল্পে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক রাওয়ালপিণ্ডিতে আহূত গোলটেবিল বৈঠকে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১০-১২ মার্চ ১৯৬৯) যোগদান। গোলটেবিল বৈঠকে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেব (ক) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, (খ) ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, (গ) ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, (ঘ) জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে প্রদেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব, ও (ঙ) পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল– এ পাঁচ দফা প্রস্তাব উত্থাপন। পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এই দুই দফা দাবি ব্যতীত অবশিষ্ট তিন দফা দাবি নাকচ করা হলে বৈঠক ত্যাগ। অতঃপর বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গ্রহণ। বাঙালির জাতিসত্তাকে শাণিত করার লক্ষ্যে 'জয় বাংলা' স্লোগান উদ্ভাবন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক জাতিসত্তার ভিত্তিতে পাঞ্জাবি, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ নামে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পটভূমিকায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। জাতীয় নির্বাচনকে (১৯৭০) সামনে রেখে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' (গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্র কায়েম) প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি উপস্থাপন। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তাঁর নেতৃত্বে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের একক বিজয় অর্জন। নিজে তিনটি আসন (ঢাকা-৮, ঢাকা-৯ ও ফরিদপুর-৫) থেকে নির্বাচিত। জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৩০০ আসনের মধ্যে ১৬০ আসনের অধিকারী) দলের নেতা হিসেবে তাঁর সরকার গঠনের কথা। সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ১৯৭১-এর ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান। ১ মার্চ (১৯৭১) ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা। ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক। ৩ মার্চ থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাঁর নির্দেশে পরিচালিত। ৭ মার্চ তৎকালীন ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান। তিনি ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকটের পটভূমিকায় ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো

www.pathagar.com

ত্রিপক্ষীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত (২২-২৫ মার্চ ১৯৭১)। এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু। একই রাতে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ স্বীয় বাসভবন থেকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে গ্রেফতারবরণ এবং গ্রেফতারের আগে (২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। গ্রেফতারের পর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ। ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং এম.এ.জি. ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করে মুজিবনগরে (বৈদ্যনাথতলা গ্রাম, মেহেরপুর) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত। এ সরকারের নেতৃত্বে নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলার পর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ১২ জানুয়ারি বাংলদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র সমর্পণ (জানুয়ারি ১৯৭২) ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগ (১৫ মার্চ ১৯৭২)। তাঁর শাসনামলে রাশিয়া, ইটালি, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, বেলজিয়াম, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ইরাক, ইরানসহ ১০৪টি দেশ কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর নেতৃত্বের ফলে কমনওয়েলথ, জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভ। লাহোরে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) এবং এর অব্যবহিত পূর্বে পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪)। তাঁর নেতৃত্বে গণপরিষদের (১৯৭২) সদস্যদের নিয়ে গঠিত 'শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি' গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে স্বল্প সময়ে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের' সংবিধান রচনা করে এবং ১৯৭২-এর ৪ নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান গৃহীত। ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭২) উক্ত সংবিধান চালু। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার প্রবর্তিত। এই শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত। চারটি আসন (ঢাকা-১২, ঢাকা-১৫, ফরিদপুর-১১ ও বাখরগঞ্জ-৪) থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে ১৬ মার্চ (১৯৭৩) দ্বিতীয়বার সরকার গঠন। ১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত। এই সংশোধনীর বলে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্টপতি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত। একই দিন (২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫) রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৫) দেশের রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে দিয়ে তাঁর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একক জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন। ৭ জুন (১৯৭৫) বাকশালের সাংগঠনিক কমিটি গঠন। জেলার শাসনব্যবস্থায় গভর্নর পদ্ধতির প্রবর্তন ও বহুমুখী গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে দেশের কৃষি-অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ছিল বাকশালের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি প্রদান। শিল্প-কারখানা ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি জাতীয়করণ, রক্ষী বাহিনী গঠন, সামরিক

www.pathagar.com

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

একাডেমী প্রতিষ্ঠা, ঢাকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ, শহীদ পরিবারকে অনুদান ও ভাতা প্রদান, যুদ্ধবিধস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দান, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স (১৯৭৩) ও জাতীয় বেতন স্কেল চালু ইত্যাদি তাঁর সরকারের উল্লেখযোগ্য কাজ। এছাড়া ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পঁচিশ বছর মেয়াদি 'বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি' (১৯৭২), গঙ্গার পানি বন্টন সংক্রান্ত অস্থায়ী 'ফারাক্কা চুক্তি' (১৯৭৪) সম্পাদন। 'বিশ্ব শান্তি পরিষদ' প্রদত্ত 'জুলিও কুরী পদক' লাভ। ১৯৭৩-এর ২৩ মে 'বিশ্ব শান্তি পরিষদের' সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্র কর্তৃক ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে পদক প্রদান। তিনি প্রথম বাঙালি যিনি ১৯৭৪-এর ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বাংলায় ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। পূর্ব বাংলার (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধীকার আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা এবং তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা পালন করায় এবং এর ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি 'জাতির পিতা' হিসেবে স্বীকৃত। ২০১২-এ তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মৃত্যু, ঢাকার ধানমন্ডিস্থ স্বীয় বাসভবনে সামরিক বাহিনীর স্বাধীনতা-বিরোধী একটি চক্রের হাতে সপরিবার নিহত, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সাল।

লোকজসংস্কৃতি বিকাশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

লোকজসংস্কৃতি লোকজীবনেরই প্রবহমান ধারা। কোন জনগোষ্ঠির (Group) যাপিত জীবনের অংশীদারমূলক (Shared) নান্দনিক কর্মকাণ্ডের (Artistic Communication) সদাপ্রবহমান ধারাই আমাদের লোকজসংস্কৃতি। লোক সংস্কৃতি মুলত Group Earning. এই সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনমূলক জাতীয় উদ্যোগের অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে।

গোপালগঞ্জ মহকুমা শহর হলেও পরিবেশ ছিল গ্রামের মতো। মধুমতী পাড়ের এই শহরে স্থায়ী বাসিন্দা বলতে সরকারি কর্মচারী ও পরিবার-পরিজনদের বোঝাতো। একটি কথা না বললেই নয়– পুরো জেলাটি প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত। প্রতিটি উপজেলা ও গ্রামে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণ তখন লেগেই থাকতো। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শহরে হয়নি। টুঙ্গীপাড়ার জলেডোবা খাল-বিল আর সবুজ ধান-পাটের মাঠে কেটেছে তাঁর কৈশোর। সে সময় পল্লিবাংলার সংস্কৃতিতে যাত্রাপালা, রয়ানী, গাজীর গীত, পূজা-পার্বণ, হালখাতা, গার্সি, নৌকাবাইচ, নবান্ন, কবির লড়াই, লাঠিখেলা, সারিগান ও গরুর লড়াইয়ের প্রাধান্য ছিল। বঙ্গবন্ধু গ্রামে থেকেই এসব বিনোদন উপভোগ করেছেন।

গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম উৎসব মেলা। গোপালগঞ্জে প্রায় প্রতিটি গ্রামে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসব মেলা দেখেই তিনি বড় হয়েছেন। অন্যদিকে কালিপূজা, লক্ষ্মীপূজা

www.pathagar.com

ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে খাল-বিল-নদীর দেশ গোপালগঞ্জের ঘাঘর, মধুমতী ও বাঘিয়ার বিলের নৌকাবাইচ তিনি দেখেছেন বাবার বড়ো পানসী নৌকায়।

বঙ্গবন্ধুর প্রিয়জন ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষ। আর সাধারণ মানুষের লোকাচার ও লোকাচারণ এবং লোকজসংস্কৃতির প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা। লোকজসংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ পাই রাজনৈতিক জীবনের সভা-সমাবেশ ও অনুষ্ঠান এবং উৎসবে। সেকালে রাজনৈতিক সভার কাজ শুরুর পূর্বে মঞ্চে গান পরিবেশনের রেওয়াজ ছিল। শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর জনসভায় প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহমদ গান গাইতেন। বঙ্গবন্ধুর জনসভায়ও এমনটি হতো। সুনামগঞ্জের লোকশিল্পী শাহ আবদুল করিম বঙ্গবন্ধুর সভায় গান গাইতেন। তাঁকে তিনি ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর কাগমারী সম্মেলনে নিয়ে যান। একবার কোটালীপাড়ার জনসভায় এক কিশোরের গান শুনে তিনি বিমুগ্ধ হন এবং সেই কিশোর ছেলেটিকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। সেই কিশোর ছেলেটিই আজকের গীতিকার ও সংগীতশিল্পী কেএম চাঁদ মিয়া। গান লোকজসংস্কৃতির আদি উপকরণ। যেকোনো ধরনের গান তিনি পছন্দ করতেন। তবে লোকজসংগীতের প্রতি ছিল ভীষণ টান। তাঁর আজীবন সংগ্রামের ফসল বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা। দেশ পাক-হানাদারমুক্ত হলে তাঁর উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে ঢাকার বাংলাদেশ বেতারের শাহবাগস্থ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় ৭ দিনের লোকজ উৎসব। এই উৎসব উদ্বোধন করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। একদিনের উৎসবে প্রধান অতিথি হয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু।

উত্তরাগণভবনে একবার তিনি শিল্পী আবদুল লতিফ ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে লোকগানের আসর বসান। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা গানের প্রখ্যাত শিল্পী কুতুবুল আলম, রকিবুদ্দীনকে এনে গম্ভীরা গান শোনেন। গ্রামবাংলার লোকজসংস্কৃতির বিকাশ ও লালনের লক্ষ্যে তাঁর উদ্যোগেই লোকশিল্প জাদুঘর, শিল্পকলা একাডেমি এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সুনামগঞ্জে হাসন রাজার জন্মোৎসব পালন করা হয়। এই উৎসবের পূর্বে হাসন রাজা স্মৃতি পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন এবং উৎসব উদ্বোধনের অনুরোধ জানান। হাসন রাজা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রিয় এক শিষ্য , লোক কবি এবং মরমী গায়ক। তিনি ঐ উৎসবে যোগদান করেননি ঠিকই, কিন্তু হাসন রাজার গান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, লোকজসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্য গবেষণা করার জন্য উৎসব কমিটিকে নগদ চব্বিশ হাজার টাকা প্রদান করেন। লোকজসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর এমন দরদের কথা আমরা অনেকেই জানি না। গ্রামবাংলায় বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু আজীবন লোকজসংস্কৃতি বিকাশে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে পরামর্শ করে বাংলাদেশের সংবিধানের পুস্তানিতে নকশি কাথা ব্যবহার করে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার যে সমন্বয় ঘটান যা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

www.pathagar.com

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা

শেখ ফজিলাতুন্নেসা ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ জহুরুল হক এবং মাতার নাম শেখ হোসনে আরা বেগম। তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

শেখ ফজিলাতুন্নেসা

অল্প বয়সে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকাকালীন তিনি মামলা পরিচালনা করা, দলকে সংগঠিত করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী হিসেবে সবসময় তাঁর পাশে থেকে তাঁকে অনুপ্রেরণা দান করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ জাতির জনকের গ্রেফতারের সময় তিনি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে গৃহবন্দি হন। ১৯৭১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলে তিনিও বঙ্গবন্ধুর সাথে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে নির্যাতিতা মা-বোনদের সহযোগিতা ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে দেশ ও জাতির সেবা করে যান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল কতিপয় সামরিক ঘাতকের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। তাঁর নামে, গোপালগঞ্জ শহরে বেগম ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা। তিনি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম শহিদ ফজিলাতুন্নেসা। শেখ হাসিনা শিক্ষাজীবন শুরু করেন টুঙ্গীপাড়ার এক পাঠশালায়। পরবর্তীতে ঢাকায় ১৯৫৬ সালে তিনি ভর্তি হন টিকাটুলির নারীশিক্ষা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ে। ১৯৬৫ সালে আজিমপুর সরকারি

www.pathagar.com

বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৭ সালে ঢাকার বকশী বাজারে পূর্বতন ইন্টারমিডিয়েট গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজ (বর্তমানে বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে সে বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১১-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানে তিনি ছাত্রলীগের নেত্রী হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনী তাঁকে তাঁর স্বামী, মা, বোন ও ছোট ভাই শেখ রাসেলের সাথে বন্দি করে রাখে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২৭ জুলাই শেখ হাসিনা গৃহবন্দি অবস্থায় তাঁর প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় জন্মলাভ করে। পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট তিনি এবং তাঁর ছোটবোন শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় খুনিদের হাত থেকে রেহাই পান।

শেখ হাসিনা

নির্বাসিত জীবনে শেখ হাসিনা জাতির পিতার হত্যার বিচার, সামরিক শাসনের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছুটে বেড়িয়েছেন দেশে দেশে আর নিবিড় যোগাযোগ রেখেছেন দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে। ১৯৮১ সালের ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই তাঁকে দলের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। দেশের মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেবার প্রত্যয় নিয়ে সামরিক শাসকদের রক্তচক্ষু ও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনে তাঁর নেতৃত্ব ও লড়াকু ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ১৯৯১-এর নির্বাচনে তাঁর দল ভোট বেশি পেয়েও সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা

www.pathagar.com

লাভে ব্যর্থ হয়। এ সময় তিনি দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচনে তাঁর দল জয়ী হয় এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তাঁর সরকারের আমলেই ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি। সম্পাদিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি। বাংলাদেশ অর্জন করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। ২০০১ সালের নির্বাচনে সূক্ষ্ম ভোট কারচুপির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করা হয়। হাওয়া ভবনের নীলনকশায় ২০০৪ সালের একুশে আগস্ট শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের সমাবেশে চালানো হয় পরিকল্পিত গ্রেনেড হামলা। গুরুতরভাবে আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান তিনি। তবে এই হামলায় আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমান সহ নিহত হয় ২৪ জন নেতা-কর্মী। চিরতরে পঙ্গু হয়ে যান অসংখ্য নেতা-কর্মী। বিএনপি-জামাতের প্রত্যক্ষ মদদে ধর্মীয় জঙ্গি ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর উত্থান ঘটিয়ে বাংলাদেশকে পরিণত করা হয মৃত্যু উপত্যকায়। এই অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান অকুতোভয় শেখ হাসিনা, রাজপথে নেমে আসে বাংলার আপামর মানুষ। ২০০৬ সালে ২৮ অক্টোবর বিএনপি-জামাত জোট সরকারের অপশাসনের অবসান ঘটান। তারপর তথাকথিত কেয়ারটেকার সরকার ও সামরিক বাহিনী সমর্থিত সরকার দু'বছর দেশ শাসন করে। এই সময় তিনি বন্দি হন।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট বিপুলভাবে জয়লাভ করে। এককভাবে আওয়ামী লীগই লাভ করে তিন-চতুর্থাংশের বেশি আসন। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। গঠিত হয় মহাজোট সরকার। শুরু হয় রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের কাজ। তার শাসনামলে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, আশ্রয়ন প্রকল্প, একটি বাড়ি, একটি খামার, ঘরে ফেরা কার্যক্রম, দুঃস্থ ভাতাসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীয় কার্যক্রম প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনীদের ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় অঙ্গীকারের ফলেই একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধী গনহত্যার নায়কদের বিচার হচ্ছে এবং বিচারের রায় কার্যকর হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে সাড়ে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল জুড়ে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে।

একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ইতোমধ্যে শান্তি, গণতন্ত্র, দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়নের জন্য বহু পদক ও সম্মামনা পেয়েছেন তিনি। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : সম্মানসূচক ডক্টর অব ল, ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় (জাপান), দেশিকোত্তম, বিশ্বভারতী (ভারত), সম্মানসূচক ডক্টর অব ল, অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় (অষ্ট্রেলিয়া), সম্মানসূচক ডক্টর অব হিউমেন লেটার্স, ব্রিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাজ্য), ইউনেস্কোর ফেলিক্স হোফে বোইনি শান্তি পুরস্কার, পার্ল এস বাক পদক, ম্যাকন উইমেনস কলেজ, (যুক্তরাষ্ট্র), মাদার তেরেসা পদক , ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার, ১২ জানুয়ারি, ২০১০,

www.pathagar.com

সেরক পদক, জাতিসংঘ খাদ্য সংস্থা (এফএও), মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কার, মহাত্ম গান্ধী ফাউন্ডেশন, শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনায় এমডিজি পুরস্কার, জাতিসংঘ, ২০১০ সাল স্বাস্থ্য খাতে যুগান্তকারী অর্জনের জন্য সাউথ-সাউথ পুরস্কার, ২০১১ সাল। তিনি গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার, স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা পালনের জন্য দেশরত্ন উপাধিতে ভূষিত হন।

রাজনীতির পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চা তথা সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক লেখালেখি করে থাকেন। এ পর্যন্ত তাঁর অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে *ওরা টোকাই কেন, বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম, সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কিছু উপায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, ডেভেলপমেন্ট অব দ্য সেকেন্ড ঢাকা, পিপল অ্যান্ড ডেমোক্রেসি, বিপন্ন গণতন্ত্র, লাঞ্ছিত মানবতা, সহেনা মানবতার অবমাননা, লিভিং ইন টিয়ার্স, আমার স্বপ্ন আমার সংগ্রাম (সম্পাদনা) বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে শেখ মুজিবুর রহমান (সম্পাদনা)* এবং *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর* সম্পাদনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দেশে বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছেন।

মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ

মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ

মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী। তিনি ১৯২৬ সালে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বড়ফা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ এবং ১৯৫৩ সালে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তিনি ছিলেন খুব স্নেহধন্য। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৩-এর উপনির্বাচন এবং ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে বন, মৎস্য ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। তিনি ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর অন্যতম কৌসুলী ছিলেন। ১৯৭৯ সালে মোল্লা জালাল উদ্দীন পরলোক গমন করেন।

www.pathagar.com

শেখ ফজলুল হক মণি

শেখ ফজলুল হক মণি

শেখ ফজলুল হক মণি গোপালগঞ্জ জেলার কৃতী সন্তান এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, রাজনীতিক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ নুরুল হক, মায়ের নাম আছিয়া বেগম। ঢাকার নবকুমার স্কুল থেকে ১৯৫৬-তে এসএসসি, ১৯৫৮-তে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে এইসএসসি, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৬০-এ বিএ এবং ১৯৬২-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ ও আইন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬২-তে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়ে গ্রেফতার হন এবং ছয়মাস বিনা বিচারে কারাভোগ করেন।

১৯৬১ সালে শেখ মনি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৪'র এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলর ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোমেন খানের কাছ থেকে সনদপত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং সরকারের গণবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে সমাবর্তন বর্জন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁর ডিগ্রি কেড়ে নেয়া হয়। ১৯৬৫-তে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হয়ে দেড় বছর কারাভোগ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িত।

৬ দফা আন্দেলনে (১৯৬৬) বিশেষ ভূমিকা পালন করায় তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয় এবং ১৯৬৬-র জুলাই মাসে কারারুদ্ধ হন। এ পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সাজানো অভিযোগে আটটি মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৯–এর জানুয়ারি-মার্চের গণআন্দোলনের চাপে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭০'-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহারের অন্যতম প্রণেতা। ১৯৭১'-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ) বা 'মুজিব বাহিনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা, কুমিল্লা নোয়াখালী, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বয়ে গঠিত পূর্বাঞ্চল সেক্টরে মুজিব বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ১৯৭২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী' দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৩-

www.pathagar.com

এর ২৩ আগস্ট তাঁর প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক 'সিনেমা' প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭২-এর ১১ নভেম্বর তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৭৪-এর ৭ জুন তাঁর সম্পাদনায় দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫-এ বাকশাল প্রতিষ্ঠিত করে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজনে অবদান রাখেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি সাহিত্য চর্চাও করতেন। *গীতারায়* নামে তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সামরিক বাহিনীর স্বাধীনতা-বিরোধী একটি চক্রের হাতে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঢাকায় নিহত।

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী শুধু গোপালগঞ্জেই নয়, বাংলাদেশসহ দেশের বাইরেও তিনি একজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে সুপরিচিত। অনেকের কাছে তিনি 'সদরসাব হুজুর' নামেও সমাদৃত। সদরসাব হুজুর ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলাধীন গওহরডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত শহিদ সৈয়দ আহমেদ। সৈয়দ আহমেদ ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন।

ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী পরিবারের সন্তান ইসলামকে সম্যক ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার মানসে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং তখনই তিনি হযরত আশরাফ আলী খানবী (রহ.)-এর দরবারে যান এবং তাঁরই উপদেশে প্রথমে মাজাহির-আল উলুম-সাহারানপুর ও দেওবন্দের দার-উলুম-এ শিক্ষা গ্রহণ করেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি ১৯৩৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ৫ বছর এবং ১৯৩৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ঢাকার আশরাফ-আল-উলুম মাদ্রাসায় হাদিস শাস্ত্রে অধ্যপনা করেন। মাতৃভাষায় ইসলাম চর্চার জন্য বহু ইসলামি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। সমাজের সার্বিক সংস্কারের লক্ষে তিনি গঠন করেন খাদিম আল–ইসলাম নামে একটি সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠা করেন বহু ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ। ঢাকার লালবাগসহ খাদিম আল ইসলাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইসলামি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন প্রকাশনী সংস্থা খাদিম আল ইসলাম জামাত।

তাঁর রচিত ও অনূদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো–তাফসীরুল কুরআন, তাবলীগে দ্বীন, বেহেশতী জেওর, বেদাআত ও ইজতেহাদ, ব্রিটিশ শাসনের বি...ফল, চরিত্রগঠন, জেহাদের ফজিলত, বিশ্ব কল্যাণ, বাংলা ফরায়েজ, মানুষের পরিচয় ও তাছাউফ তত্ত্ব। ১৯৬৮ সালে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী মৃত্যুবরণ করেন।

শেখ কামাল

শেখ কামাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়াপ্রেমী এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সৈনিক ছিলেন। শেখ কামাল গোপালগঞ্জ তথা টুঙ্গীপাড়ার কৃতীসন্তান। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ আগস্ট টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার শাহীন স্কুল থেকে এসএসসি, ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে অনার্সসহ এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময় তিনি ছায়ানটে ভর্তি হয়ে সেতার বাদনে ডিগ্রি নেন এবং সংগীত

www.pathagar.com

শিল্পীদের নিয়ে গঠন করে স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠী। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ছিলেন ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়াবিদ।

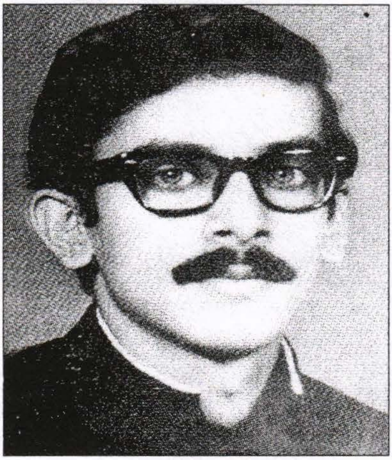

শেখ কামাল

১৯৭১ সালের ২৫মে মার্চের পরে মা-বোন ও ভাইদের সাথে বন্দি হন। কিন্তু পাকসেনাদের ফাঁকি দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ছিলেন মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানীর এডিসি।

আবাহনী ক্রীড়াচক্রের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এবং ঢাকা থিয়েটারেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন সকলের কাছে প্রিয় মানুষ। বঙ্গবন্ধুর ছেলে হিসেবে তাঁর কোনো গর্ব বা অহমিকা ছিল না। শেখ কামাল পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট কালরাত্তিরে মা-বাবা-ভাই-চাচা, ছোট ভাইয়ের স্ত্রী এবং নিজের স্ত্রীর সাথে একদল কুলাঙ্গারের হাতে নিহত হন। তাঁকে বনানী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

শেখ ফজলুল করিম সেলিম

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শেখ ফজলুল করিম সেলিম গোপালগঞ্জ জেলার কৃতী সন্তান। তিনি ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্র এবং রাজনীতি ও সংস্কৃতির একটি পরিচিত নাম। তিনি ১৯৬৩ সালে এসএসসি, ১৯৬৫ সালে এইচএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক, আওয়ামী যুব লীগের প্রচার সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে যুবলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি গোপালগঞ্জ-২ আসন থেকে ১৯৮০, ১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮ ও ২০০৮ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জাতীয় সংসদের বহু কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে তিনি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী।

www.pathagar.com

শেখ ফজলুল করিম সেলিম

শেখ ফজলুল করিম সেলিম একজন খ্যাতিমান সম্পাদক। তাঁর সংসদের প্রদত্ত বক্তৃতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলার বাণী-র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

শেখ শহীদুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও রাজনীতিক শেখ শহীদুল ইসলাম ১৯৪৩ সালের ২রা জানুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ মো. মুসা। তিনি রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির পাশাপাশি ১৯৭৪ সালে 'ল' পাস করেন। তার ছাত্র জীবন নানা ঘটনায় উজ্জ্বল। তিনি ১৯৬২'র শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। '৬৬-এর ৬ দফা ও ৬৯'-এর ১১ দফা আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৭২ সালে তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ সালে যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী এবং ১৯৮৮ সালে পূর্তমন্ত্রী ও পরবর্তীতে শিক্ষামন্ত্রির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি সাপ্তাহিক পদক্ষেপ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং নিজেই সম্পাদনা করেন। প্রখর জ্ঞানের অধিকারী শেখ শহীদুল ইসলাম অমায়িক ও সদালাপী হিসেবে সর্বজন প্রিয়। বর্তমানে তিনি জাতীয় পার্টি (জেপি)র মহাসচিব।

শেখ শহীদুল ইসলাম

www.pathagar.com

কাজী ফিরোজ রশিদ

কাজী ফিরোজ রশিদ

কাজী ফিরোজ রশিদ ১৯৪৮ সালে কোটালীপাড়ার কুরপালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী মোজাফফর হোসন। কাজী ফিরোজ রশিদ ছাত্রাবস্থায়ই রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনে তিনি কারা বরণ করেন। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ১ বছর কারা বরণ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র সংসদের ভি.পি নির্বাচিত হন। কাজী ফিরোজ রশিদ আইনের ছাত্র থাকাকালীন সময় জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদে ১৯৭০-৭৩ সাল পর্যন্ত জিএস এবং ভিপি নির্বাচিত হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান আইন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। কাজী ফিরোজ রশিদ একসময়ে ঢাকা মহানগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ও বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৮৯ সালে ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ ফারুক খান

মুহাম্মদ ফারুক খান

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ফারুক খান ১৯৫১ সালে মুকসুদপুর উপজেলায় বেজড়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত খান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে তিনি সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন। অতপর পাকিস্তান সামরিক একাডেমী থেকে গ্র্যাজুয়েশন এবং ১৯৯৪ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিফেন্স স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ২৬ বছর সেনা বাহিনীতে চাকরি করার পর ১৯৯৫ সালে লে. কর্ণেল পদে দায়িত্বরত অবস্থায় স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। বর্তমানে তিনি মহাজোট সরকারের পর্যটন ও বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন।

জ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গায়ক ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মধুসূদন সরস্বতী

সংস্কৃত পণ্ডিত ও দার্শনিক। কোটালীপাড়ার উনশিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা প্রমোদ পুরন্দর আচার্য ছিলেন একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। মধুসূদনের প্রকৃত নাম ছিল কমল জয়নয়ন। প্রথম জীবনে সংসার ত্যাগ করে তিনি গুরু বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তখন তাঁর নাম হয় মধুসূদন। শৈশবে তিনি পিতার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি নবদ্বীপ যান। সেখানে বিখ্যাত দার্শনিক হরিরাম তর্কবাগীশ ও মথুরানাথ তর্কবাগীশ ছিলেন তাঁর শিক্ষক; গদাধর চক্রবর্তী সতীর্থ এবং পরবর্তীকালে পুরুষোত্তম সরস্বতী তাঁর ছাত্র। মধুসূদন সরস্বতী ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মৃতুবরণ করেন। মোগল সম্রাট তাঁকে সম্মাননা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর

মানবকল্যাণে যুগে যুগে যেসকল পুরুষোত্তম ও মহামানব ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যে হরিচাঁদ ঠাকুর অন্যতম। ঠাকুরের আদিপুরুষ রামদাস ছিলেন রাঢ় দেশবাসী। তাঁর পূর্বপুরুষগণ বংশ পরম্পরায় বৃন্দাবন, নবদ্বীপ বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে পর্যটন করতো।

কালক্রমে তাঁরা নড়াইল জেলার লক্ষ্মীপাশায় নবগঙ্গা নদীর তীরে জয়পুরে বসতি স্থাপন করেন। পরে সেখান থেকে চলে আসেন কাশিয়ানী উপজেলায় শাফলীডাঙা গ্রামে। এই শাফলীডাঙায় ১২১৮ বঙ্গাব্দে হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা যশোমন্ত ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। মা অন্নপূর্ণাদেবীও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। ঠাকুর ব্রজ, নান্টু, বিশ্বনাথ ও অন্যান্য খেলার সাথীদের নিয়ে মাঠে ধেনুচরাতেন। খেলার সাথীরা উপলব্ধি করতেন ঠাকুর ঠিক যেন বৃন্দাবনে ব্রজের রাখাল। অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি বিকশিত হতে থাকে।

ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি দেখে সকলে বিস্মিত হতেন। কৈশোরে পা দিয়েই তিনি বাইরের দুনিয়ায় দৃষ্টিপাত করলেন। দেখতে পান নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অধিকার হারা মানুষ অন্ধকূপে তলিয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাধারা ও অন্ধধর্মের জালে জড়িয়ে পড়ছে। কুসংস্কারে তারা নিমজ্জিত হয়ে আছে। ঠাকুর বুঝতে পারলেন এই দিশেহারা জাতিকে অন্ধকার মায়াজাল থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এগিয়ে এলেন তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে। ধর্মীয় আন্দোলনের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগিয়ে না তুললে

www.pathagar.com

এ জাতি ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। নিজেদের মধ্যে যে অমিয় শক্তি লুকানো রয়েছে এই উপলব্ধি জাগিয়ে দিলে এরা বুঝতে পারবে শৌর্যে, বীর্যে, শক্তিতে, সামর্থে আমরা মোটেই পিছিয়ে নেই। ঘুমন্ত জাতিকে মাতিয়ে তুলতে তাই মতুয়াবাদের সৃষ্টি। মতুয়াবাদের মতাদর্শে নিহিত আছে ঘুম ভাঙানোর বৈশিষ্ট্য। এ আদর্শে পশ্চাৎপদের শিক্ষা নেই। অগ্রগতির ভাবাদর্শে পতিত জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার এটি একটি কালজয়ী সনদ। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্ত রাখতে এই আদর্শ খুবই সহায়ক। শ্রাদ্ধ তর্পণে ব্রাহ্মণ্যবাদের রহিতকরণের বিধান এতে বিদ্যমান। মানব দরদি সমাজ গঠন এই আদর্শের একটি অন্যতম দিক। তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এই নীতিমালায় অনুপস্থিত। এতে বাস্তবতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মানুষকে ভালোবাসাই জীবের শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি বলতেন–

'জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা
এই ভিন্ন অন্যসব ক্রিয়া কর্ম ভ্রস্টা।'

এই মতাদর্শে নারী-পুরুষের সমাধিকার রক্ষিত হয়েছে। সন্ন্যাস গ্রহণ না করে গার্হস্থ্য জীবনে সুখ, সৌন্দর্য ও শান্তি বজায় রাখাই এর মহান আদর্শ। গার্হস্থ্য ধর্ম বর্জন করে অন্য-আদর্শ বাঞ্ছনীয় নয়। তাই ঠাকুর বলেছেন–

'করিবে সংসার ধর্ম লয়ে নিজ নারী
(হবে) গৃহে থেকে সন্ন্যাসী বান প্রস্থ্য ব্রহ্মচারী।'

শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কেউ এই মতুয়া আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। এতে ধার্মীকতার ভান বা কোনো বাগাড়ম্বর স্থান পায়নি। কেবলমাত্র কয়েকটি উপদেশ পালন করার বিধান রাখা হয়েছে, যাকে দ্বাদশ আজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয়। একমাত্র হরিচাঁদ ঠাকুর ভিন্ন অন্যকোনো পুরুষোত্তম বা মহামানব নমশূদ্র কুলে জন্মগ্রহণ করেননি।

তিনিই একমাত্র ও অদ্বিতীয় যিনি 'মতুয়া' সমাজের পতাকাতলে সবাইকে একীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের পথ দেখিয়েছেন। মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি হরিচাঁদ ঠাকুরের পঞ্চম পুরুষ শ্রী হিমাংশুপতি ঠাকুর জানান 'তৎকালীন পূর্ববঙ্গের শোষিত মানুষ মূলত দুটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে। প্রথমত, হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম

www.pathagar.com

আন্দোলন; দ্বিতীয়ত, তারই সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা আন্দোলন। গুরুচাঁদ ঠাকুর এ জাতিকে জাগিয়ে তুলতে যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়।' হরিচাঁদ ঠাকুর ১২৮৪ সনের ২৩ শে ফাল্গুন বুধবার পরলোক গমন করেন।

এ জেড খান

মোগল আমলের সময় উপমহাদেশের পরগণাগুলো ভেঙে জেলা ও মহকুমায় বিভাজন করা হয়। ব্রিটিশ আমলে অনেকেই গোপালগঞ্জ মহকুমার এসডিওর দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁদের মধ্যে এ জেড খান ছিলেন অন্যতম। এ জেড খানের প্রকৃত নাম খান বাহাদুর আকরামুজ্জামান খান। তাঁর স্থায়ী নিবাস ছিল মানিকগঞ্জ জেলাধীন হরিরামপুর উপজেলার দাদরোখী গ্রামে।

মহকুমা প্রশাসক হিসেবে সেকালে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তাঁর নামে তখন গোপালগঞ্জে ফুটবল টুর্নামেন্ট 'এ জেড খান শিল্ড' চালু ছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কুলে পড়ার সময় এই শিল্ডের শেষ খেলায় অংশ নেন। তখন তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল বঙ্গবন্ধুর পিতার দল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসমাপ্ত *আত্মজীবনীতে* এই দক্ষ ও জনপ্রিয় মহকুমা প্রশাসকের কথা উল্লেখ করেছেন। মহকুমা প্রশাসক এ জেড খানের তিন পুত্রের মধ্যে আমির-উজ-জামান ও আহমদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বাল্যবন্ধু। আমির উজ-জামান খান বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টিভির মহাপরিচালক ছিলেন। তাঁর অপর পুত্র প্রখ্যাত কথাশিল্পী আশরাফ-উজ জামান খান। তিনিও বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক ছিলেন। এ জেড খান গোপালগঞ্জ শহরে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। উল্লেখ্য, তাঁর ভাইপোর ছেলে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ফোকলোরবিদ এবং শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর এর সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।

সেন্ট মথুরানাথ বোস

সেকালে গোপালগঞ্জ শহর এবং শহরের আশপাশ এলাকায় শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন সেন্ট মথুরানাথ বোস। গোপালগঞ্জ শহরে সরকারি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে তাঁর স্মৃতিসৌধ বিদ্যমান। নতুন প্রজন্মের কাছে এই সাধু পুরুষের জীবন ও কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মথুরানাথ ইনস্টিটিউশন (মিশন স্কুল) থেকে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গোপালগঞ্জ শহরের এসএম মডেল স্কুল। ১৯৪৭ সালে মথুরানাথ ইনস্টিটিউটে কায়েদ-ই-আজম কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন স্কুলটি স্থানান্তর করা হয় বর্তমানের এসএম মডেল স্কুলের জায়গায়। ওই জায়গাটি ছিল জনৈক সীতানাথ বাবুর। সীতানাথ বাবু জায়গা দেওয়ার কারণে তাঁর এবং মথুরানাথের নাম সংযুক্ত করে স্কুলটির নতুন নামকরণ করা হয় সীতানাথ মথুরানাথ মডেল হাই স্কুল, সংক্ষেপে এস এম মডেল হাই স্কুল।

www.pathagar.com

সেন্ট মথুরানাথ বোস

সেন্ট মথুরানাথ বোস ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে যশোর জেলার কোটচাঁদপুরে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সদানন্দ বসু। শৈশবে নিজগৃহে, কৈশোরে যশোর জেলা স্কুল, কলকাতার স্কটল্যান্ড মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত ডাক কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৬০ সালে বিএ পাসের পর আইন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরে ওকালতি বাদ দিয়ে ১৮৬৫ সালে ভবানীপুর মিশন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। নয় বছর শিক্ষকতা করার পর রাজগঞ্জের হাটে (গোপালগঞ্জে) মিশনারির কাজে চলে আসেন। এরমধ্যেই স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

গোপালগঞ্জ শহরে এসে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গোপালগঞ্জ আদালতের প্রথম বিচারক নিযুক্ত হন। পাশাপাশি শিক্ষা ও মিশনারির কাজে অগ্রদূতের ভূমিকা রাখেন। মথুরানাথ ছিলেন উদার ব্যক্তি। সারাজীবন তিনি গোপালগঞ্জে থেকেছেন। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমণ করেন।

ফটিক গোঁসাই

গোপালগঞ্জের মাইচকান্দি গ্রামে ১৮৪২ সালে ফটিক গোঁসাই জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি সংসার ত্যাগী হন। গোপালগঞ্জ শহরের কাছে মালিবাতা গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রম আছে। এই জনপদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফটিক গোঁসাইয়ের গান শোনা যায়। তিনি বাউল সাধক, লোক কবি ও সাধক হিসেবে সমধিক পরিচিত। ১৯৫৭ সালে ফটিক গোঁসাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কবিয়াল হরিবর সরকার

চারণ কবি হরিবর সরকার ১৮৬৯ সালে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চারণ মহাকবি তারক সরকারের মতো হরিবর সরকারও বেশি লেখাপড়া জানতেন না। এই দুইজন প্রতিভাবান চারণ কবি হরিচাঁদ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের আশীর্বাদে কবি খ্যাতির শীর্ষে পৌছান। এতে তাঁরা দৈব্য শক্তির বলে বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। কবি হরিবর শ্রীশ্রী হরি লীলামৃত রচনা করার সময় কবি রসরাজ তারক সরকারকে সার্বিকভাবে সহায়তা

www.pathagar.com

করেছিলেন। হরিবর সরকার বিভিন্ন জায়গায় কবি গান গাইতে গিয়ে নানা প্রকার উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন যেমন–কবিরত্ন, কবিরঞ্জন, কবি চুড়ামণি ইত্যাদি। তিনি *মহাসংকীর্ত্তন* নামে একখানা পুস্তক সম্পাদনা করেন। তাঁর গানের রূপ রস ছিল উচ্চস্তরের। যেমন :

ব্রহ্ম, ইন্দ্র, পশুপতি
ভেবে পায় না দিবারাতি
পদারবিন্দ যার
জীবনের ভাগ্য বসে সেজন এসে
হরিনাম করেছে প্রচার।

●

এলো গোলক ত্যাজে
ভবপারের কর্ণধার
তরবি যদি ভব নদী
ওড়াকান্দি চল এবার।

বাংলায় কবিয়ালদের মধ্যে হরিবর সরকার অন্যতম। খুলনা জেলার চুনখোলা গ্রামে বাংলার আরেক কালজয়ী কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার। তিনি হরিবর সরকারের ভাগ্নে।

কবিয়াল মনোহর সরকার

আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হরিবর সরকার ও মনোহর সরকার একই বাড়িতে একই বংশোদ্ভূত। 'মনোহর সরকার ও জটাধর সরকার এঁরা দুই ভাই। পিতা নাগর চাঁদ সরকার। মনোহর সরকারের গুরু স্বরূপ গোঁসাই। গণেশ পাগলকে সরকার মহাশয় মামা বলে সম্বোধন করতেন। চারণ কবি সম্রাট বিজয়কৃষ্ণ অধিকারি মনোহর সরকারের বাড়িতে কাজ করতেন। কবি রসরাজ শ্রীমৎ তারকচন্দ্র সরকার ও মনোহর সরকার ছিলেন তৎকালীন কবিগানের খুব জনপ্রিয় জুটি।' দক্ষিণ বাংলায় বিখ্যাত কবিগান রচয়িতা ও সু-গায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আজও লোকের মুখে শোনা যায়। এমনও কিংবদন্তি আছে, 'মনোহর সরকারের গান শুনে জলের কুমির ডাঙায় উঠে যেত। অনেক কবিয়াল তাঁর কাছে কবিগান শিক্ষা করে অশেষ সুনাম কুড়িয়েছেন। দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসএম দেলোয়ার হোসেন বলেন, 'মালিবাতার ফটিক গোঁসাই, কাটরবাড়ির ফেলারাম পাগল, দুর্গাপুরের হরিবর সরকার ও মনোহর সরকার আমাদের গর্ব। আমি মনে করি এই মাটি ধন্য হয়েছে। এলাকার আরও ঐতিহ্যের মধ্যে এই দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌষ সংক্রান্তির মেলা হয়। এই লোকউৎসবকে আমরা বাংলার কৃষ্টি হিসেবে লালন করে আসছি।'

কাজী দীন মোহাম্মদ

গোপালগঞ্জ জেলার একজন নামজাদা সাহিত্যিক কাজী দীন মোহাম্মদ। তিনি ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ শহরের

www.pathagar.com

সেকালের সীতানাথ একাডেমী থেকে প্রবেশিকা এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইএ ও বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। বিটি পাশের পর তিনি যশোর জেলা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় সরকার ও পূর্ববঙ্গ সরকারের অধীনে চাকরি করেন।

১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন। ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শনে তিনি অসাধারণ। তাঁর *গোপালগঞ্জের আত্মকথা* একখানি উল্লেখযোগ্য বঙ্গশ্রয়ী সাহিত্যকীর্তি। কৌতুক ও পরিহাসের সুরে সামাজিক অনাচার ও দুর্নীতির চিত্রাঙ্কনে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। মননশীল প্রবন্ধ ও শিশুতোষ গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবেও পরিচিত। *কেনাই ডাকু* (১৯৪১) ও *ভিজা বিড়াল* (১৩৬৮) তাঁর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ।

মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন

১২২৬ বঙ্গাব্দে কোটালীপাড়া উপজেলার পশ্চিমপাড় গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যই নয় একজন উচ্চমানের সিদ্ধসাধকরূপে এবং একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হিসেবে তিনি ভারত বিখ্যাত হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, সিদ্ধান্ত পঞ্চাননের উপাধি অনুসারে পশ্চিমপাড় মেলার নাম হয় সিদ্ধান্ত মেলা। এখানে জিভের মধ্যে বান ফোড়া, পিঠে বড়শী ফোড়া ও চড়কে ঘোরানো হতো যা এখনও প্রতি বছর মেলার সময় হয়ে থাকে। উনশিয়া গ্রামে 'দুর্গাধন ন্যায় ভূষণ' মহাশয়ের প্রচেষ্টায় তাঁর বহির্বাটিতে আর্য বিদ্যালয় নামে যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রবীণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন্দ মহাশয়।

ড. শ্রীযুক্ত কালিপদ তর্কাচার্য

ড. কালিপদ তর্কাচার্য ১৮১০ শতাব্দে কোটালীপাড়া উপজেলার উনশিয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় ড. কালিপদ তর্কতীর্থ প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনার জন্য সমাদৃত হয়ে এসেছেন। ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে ঋষিকল্প পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সর্বভৌম তাঁকে 'তর্কাচার্য'কাশীর ভারত মহামণ্ডল বিদ্যানিধি শৃঙ্গারি মঠের শঙ্করাচার্য, তর্কলঙ্কার এবং হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ 'মহাকবি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁকে বলা হতো নব্য বাংলার কালিদাস। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য ভারত সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করে এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আজীবন বার্ষিক ৩ হাজার টাকা সম্মানী ধার্য করা হয়। ১৩৭৮ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁকে সম্মানসূচক ডি-লিট খেতাবে ভূষিত করা হয়। সংস্কৃত কাব্য নাটক ও ন্যায় শাস্ত্র বিষয়ক মোট ১৬ খানি এবং নিজ সম্পাদিত ৭ খানি গ্রন্থ তাঁর শিল্প সাধনার ফল। কোটালীপাড়ার এ কৃতী সন্তান ১৯৭২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সতু সেন

১৯০২ সালের ৪ জুন গোয়ালংক গ্রামে বাংলা নাট্যমঞ্চের জ্যেষ্ঠতম প্রয়োগবিদ সতু সেন জন্মগ্রহণ করেন। কাশি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ২য় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য নিউইয়র্কে যান। নিউইয়র্ক যাত্রার পথে কায়রোতে

www.pathagar.com

যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে মস্কো প্রত্যাগত বাগেশ্বরী অধ্যাপক হাসান শহিদ সুয়ার্দীর সাথে সাক্ষাতের ফলে তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। তিনি সতু সেনের নাটক ও নাট্যমঞ্চের অপরিমিত উৎসাহ দেখে মঞ্চশিপ নিয়ে ফলিত শিক্ষা গ্রহণের অনুরোধ করেন এবং আমেরিকার ল্যাবরেটরি থিয়েটারের বিশ্ববিখ্যাত অধ্যক্ষ রিচার্ড বাশ্লাভস্কির নিকট একটি পত্র লিখে সতু সেনের নিকট দেন। সতু সেন নিউইয়র্ক থেকে পিটার্সবার্গে, ওখান হতে কার্নেগি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে নাটক ও মঞ্চ বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে তিনি নিউইয়র্ক এসে বিনা বেতনে ল্যাবরেটরি থিয়েটারে অধ্যয়নের সুযোগ পান।

তাঁর দক্ষতা বলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই থিয়েটার কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন হন। মাত্র ১ বছর শিক্ষার পর মঞ্চ প্রয়োগবিদ জার্মান বেন সেন্ডেসের অধীনে সহকারী মঞ্চ নির্দেশক নিযুক্ত হন। ১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে ওই থিয়েটারের মঞ্চ ও আলোকসম্পাত বিভাগের প্রধান এবং সহকারী পরিচালক মনোনীত হন। তাঁর নির্দেশনায় শেক্সপিয়ার, মার্লো, মলিয়ের, শেখভ, তলস্তয়, ইয়মেন প্রমুখ রচয়িতার নাটক পরিবেশিত হয়। ১৯২৯ সালে হলিউডে রিচার্ড হলি শ্লায়ভস্কি মিকাডো চলচ্চিত্রটির পরিচালনা করেন। সতু সেন তার সহকারী পরিচালক ছিলেন। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি ১৯৭১ সালের ৭ই আগস্ট পরলোক গমন করেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

উনশিয়া গ্রামে চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীর জন্ম। কোটালীপাড়ার খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কোলকাতা Presidency College-এর অধ্যাপক হিসাবে অবসর নেন। তিনি জীবনে অধ্যাপনার সাথে জড়িত থাকার পরও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির একজন সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষে ও এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন।

রাজেন্দ্র চন্দ্র সেন

১৮৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে গোয়ালংক গ্রামে রাজেন্দ্র চন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা সিটি কলেজ হতে অনার্স নিয়ে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি আইন পাস করে আলিপুর কোর্টে ওকালতি করেন। কয়েক বছর ওকালতির পরে ১৯২০ সালের মে মাসে Bengal Judicial Civil Service- এ মুন্সেফ পদে যোগদান করেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় বরিশালে বালিকা বিদ্যালয়টিকে মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। ১৯৩৫ সালে সিলেটের হবীগঞ্জে থাকাকালে আসাম সরকার তাঁকে Special Officer করে নিয়ে যান। ওই সময়ে আসাম ঈড়ঁহপরষ-এ তিনি সিলেট এ্ববহধহবু ইরষষ এর নিয়ম কানুন তৈরি করার জন্য নিযুক্ত হন। এই আইন প্রণয়নে আসাম সরকার তাকে M.I.C হিসেবে মনোনীত করেন। ১৯৩৬ সালে আসাম সরকার তাঁকে 'রায় সাহেব' খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি একমাত্র মুন্সেফ যিনি এই খেতাব পান। আসাম হতে নারায়ণগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের অনন্য স্বাক্ষর বহন করে। বালিয়াভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন একজন কর্ণধার। ১৯৪৯ সালে ২৮ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

হেমায়েত উদ্দীন

হেমায়েত উদ্দীন

হেমায়েত উদ্দীনের জন্ম ১৯৪৩ সালে কোটালীপাড়া উপজেলার টুকুরিয়া গ্রামে এক কৃষক পরিবারে । ছোটবেলা থেকেই দেশ সেবায় প্রবল ইচ্ছা ছিল বলে ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন এবং প্রথমদিকে সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল সফিউল্লাহর নেতৃত্বে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। হেমায়েত উদ্দীন নিজ নামে কোটালীপাড়ায় এসে গড়ে তোলেন হেমায়েত বাহিনী। শপথ নেন দেশমুক্তির। কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া, কালকিনি, শিবচর, গোসাইরহাট, ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর, নাজিরপুর, মুলাদী, বাবুগঞ্জ, শিকারপুর, মোল্লারহাট, বাগেরহাটের অংশে ছিল হেমায়েত বাহিনীর যুদ্ধ তৎপরতা। ১৪ জুলাই '৭১ হেমায়েত উদ্দীন রামশীলে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে মুখে গুলি লেগে মারাত্মকভাবে আহত হন। ৩ ডিসেম্বর '৭১ কোটালীপাড়া পাক হানাদারমুক্ত হয়। সে কি বিজয় আনন্দ উল্লাস! স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুর সরকার তাঁকে বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত করেন। সে থেকে তিনি সকলের নিকট বীর বিক্রম হেমায়েত উদ্দীন নামে পরিচিত হন। ১৯৭১ সালে ৯ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর জলিল তাঁকে সুবেদার পদে পদোন্নতি দেন।

ধীরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

ধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কলকাতার একজন নামজাদা সাংবাদিক। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ধূমকেতুতে লিখতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া এবং ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়াতে কাজ করেন। ধীরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের বাড়ি কোটালীপাড়ার উনশিয়া গ্রামে। কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে লেখা কমরেড মুজাফফর আহমদের স্মৃতি কথায় উল্লেখিত তথ্যটুকু পাওয়া গেছে।

কেষ্ট ক্ষ্যাপা গণেশ পাগল

বাংলা ১২৫৫ সনের ১১ মাঘ শুক্রবার কোটালীপাড়া উপজেলার পোলশার গ্রামে গণেশ পাগল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শিরমণী বৈরাগী এবং মাতা নারায়ণী দেবী।

www.pathagar.com

গণেশ পাগল একজন সাধক পুরুষ। তিনি কবিগান বড় ভালোবাসতেন। তাঁর আশীর্বাদে অল্প শিক্ষিত চারণ কবি সম্রাট বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী এই উপমহাদেশে বিখ্যাত কবিয়াল হয়ে ওঠেন। দুর্গাপুরের আরেক প্রতিভাধর চারণ কবি মনোহর সরকারের কাছে ভক্তি ডোরে বদ্ধ হয়ে তিনি বাকি জীবন দুর্গাপুরে কাটিয়েছেন। সমগ্র গোপালগঞ্জে যেসব ঐতিহাসিক মেলা আজঅব্দি বয়ে আসছে তারমধ্যে গণেশ পাগলের লীলাভূমি কদম বাড়ির মেলা অন্যতম। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখে এ মেলা বসে। কুম্ভের মেলা নামে এটি খ্যাত। অসংখ্য ভক্ত দেশ-বিদেশ থেকে এসে যোগদান করে এই কুম্ভের মেলায়। গণেশ পাগলের বহু অলৌকিক ঘটনা মানুষের মুখে মুখে আজও বয়ে চলেছে। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে দোল পূর্ণিমা তিথিতে এই দ্রষ্টা পুরুষ নিত্যধামে গমণ করেন।

চন্দ্রনাথ বসু

চন্দ্রনাথ বসু কাশিয়ানী উপজেলায় রামদিয়া গ্রামে ১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জনকল্যাণে বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারে তিনি যে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। ১৯/২০ বছর বয়সে তাঁর মধ্যে বহুমুখী কর্মধারার পরিচয় ফুটে উঠতে থাকে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের চাহিদা মিটাতে অঞ্চলে অঞ্চলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে নিরাপদ পুষ্করিণী ও জলাশয়ের ব্যবস্থা করেন। রামদিয়া-তিলছড়া, শাফলীডাঙ্গা, কুমুরিয়া, নড়াইল, জ্যোৎকুরা, পুইশুর বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ১৫-১৬টি পুকুর খনন করেন। কৃষি কাজের সুবিধার্থে জল নিষ্কাশন করতে যথাযথ স্থানে অনেক খালও খনন করেছেন। এই জনপদটি ছিল শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর। তাই তাঁর সহযোগিতায় বহুস্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ৭টি কলেজ ও প্রায় শতাধিক বিদ্যালয় তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। রামাদিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গের বগুলায় শ্রীকৃষ্ণ কলেজ তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য। রামাদিয়া বাজারেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ফরিদপুরের গান্ধীজী বলে জনগণ তাঁকে জানতেন। সমাজকর্মী এই মনীষী ১৯৭৯ সালের ২রা জুন কলকাতায় দেহ ত্যাগ করেন।

অবিনাশ ব্রহ্মচারী

অবিনাশ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৯৩৪ সালে। তিনি কাশিয়ানী উপজেলার রামদিয়ায় আশ্রম তৈরি করে ধর্ম চর্চা করছেন। সাহিত্যেও তিনি বিশেষ পারদর্শী। প্রভাতী নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। অনুবাদেও তিনি সিদ্ধ হস্ত। তাঁর অনুবাদ ইউরোপে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দক্ষ অভিনেতা ও সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে *রবীন্দ্রনাথ, কাব্য পরিচয়, বাতায়ন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন চরিত* উল্লেখযোগ্য।

লাঠিয়াল অক্ষয় চন্দ্র সেন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে অক্ষয় কুমার সেন কাশিয়ানীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট লাঠিয়াল ও বাঘ শিকারি হিসেবে তিনি পরিচিত। তিনি ছিলেন দুর্বার সাহসী লাঠিয়াল। অনেক কাজিয়ায় চুক্তিভিত্তিক লাঠিয়ালগিরি করেছেন। তিনি দেশীয় অস্ত্র দ্বারা বাঘ শিকার করতেন। মানুষ খেকো বহু বাঘ শিকার করে অক্ষয় সেন বহু নিরীহ মানুষের

www.pathagar.com

জীবন রক্ষা করেছেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহস দেখে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে একটি বন্ধুক উপহার দেন। আজও এলাকায় তিনি অক্ষয় শিকারী বলে খ্যাত।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

প্রখ্যাত বাঙালি ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম ১৮৮৮ সালের ৪ ডিসেম্বর মুকসুদপুর উপজেলার খান্দারপাড়া গ্রামে। ১৯০৯ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে সম্মানসহ স্নাতক এবং ১৯১১ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অধীনে ইতিহাসের ওপর গবেষণা শুরু করেন। ১৯২২ সালে রমেশ চন্দ্র 'অন্ধ্র-কুষাণ কাল' নামে অভিসন্দর্ভের জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তাঁর কর্মজীবনের শুরু ১৯১৩ সালে ঢাকা টিচার ট্রেনিং কলেজে। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত হন। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি ইতিহাস বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় ব্রত হন। ১৯২৪ সালে *Early History of Bengal* নামে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালে প্রকাশ করেন *Ancient India* নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি ফারসি ও ডাচ ভাষা শেখেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করার পর তিনি প্রকাশ করেন ভিয়েত নাম অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ওপর গবেষণামূলক গ্রন্থ *চম্পা*, যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

১৯২৮ সালে তিনি লন্ডনের British Museum, লেইডেনের Kern Institute, প্যারিসের Biblio the que national-এ পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি বেলজিয়াম, ইতালি জার্মানি ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত এলাকা ভ্রমণ করে ৫ খণ্ডে প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে ৩ খণ্ডে প্রাচীন বাংলার প্রায় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করে তিনি বিশ্বখ্যাত হন। ১৯৩৬ সালে ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঢাকা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। ভারতীয় বিদ্যাভবন সিরিজের ১২ খণ্ডে History and Culture of the Indian people রচনায় তিনি বিশেষ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। এই সিরিজের অর্ধেক রচনাই তাঁর লেখা। ১৯৫০ সালে তিনি ইন্ডোলজি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে কর্মরত থাকেন। এরপর তিনি The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857 (১৯৫৭), History of Freedom Movement in India (three vol, 1962-63)-এর মতো গবেষণামূলক গ্রন্থগুলো রচনা করেন। ১৯৫৫ সালে ড. মজুমদার নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডোলজি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯৬৬-৬৮) ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১৯৬৮-৬৯)-এর সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি কিছুদিনের জন্য কলকাতার শেরিফ (sheriff)-এর দায়িত্বও পালন করেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক Endowment lecture প্রদান করেন। এই প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ১৯৮০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ৯২ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন।

নরেন বিশ্বাস

নরের বিশ্বাস ১৯৪৫ সালে মুকসুদপুর উপজেলায় মাঝিগাতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখাপড়া শুরু হয় গ্রাম্য পাঠশালায়, শেষ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভের মাধ্যমে। কর্মজীবন অধ্যাপনার মাধ্যমে শুরু হলেও পরে নাট্যকার ও অভিনেতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তার লেখা নাটকের মধ্যে *মা*, *নিহত কুশীলব*, *রৌদ্রদিন*, *তামসীর ফাঁসি*, *ক্রুশবিদ্ধ যীশু* উল্লেখযোগ্য। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা পেশায় নিযুক্ত হন। বাংলা ভাষার উপর তাঁর বিশেষ অবদান : *বাংলা উচ্চারণ অভিধান*, *প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা*, *কাব্যতত্ত্ব অন্বেষা*, *অলঙ্কার অন্বেষা* এই সুগ্রন্থিত বইগুলো। ম্যাক্সিম গোর্কির মা নাটকের অনুবাদ নরেন বিশ্বাসের অসামান্য অবদান। তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের জন্য দেশবাসী তাকে বাক–শিল্পাচার্য বলে মানতেন। ১৯৯৮ সালে তিনি ঢাকায় পরলোক গমন করেন।

আব্দুস সালাম খান

মুকসুদপুর উপজেলায় বেজড়া গ্রামে ১৯০৬ সালে আব্দুস সালাম খান জন্মগ্রহণ করেন। আইনজীবী, রাজনীতিক, মন্ত্রী ও সাহিত্যিক। ১৯২৯ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ এবং ১৯৩১ সালে আইন পাস করেন। ১৯৪৫ সালে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হয়ে পূর্ব বাংলার আইন সভার সদস্য নির্বাচিত এবং যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী সভায় পূর্ত ও যোগাযোগ মন্ত্রী হন। আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রধান কৌসুলী ছিলেন। ১৯৭২ সালে আব্দুস সালাম খান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

ভবানী শংকর বিশ্বাস

ভবানী শংকর বিশ্বাস ১৯২৬ সালে মুকসুদপুর উপজেলায় মাঝিগাতী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ওড়াকান্দি মিড হাই স্কুল, নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ, চাখার ফজলুল হক কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৫৪ ও ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য (এমএলএ) নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে তিনি মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের সংযুক্ত সদস্য থাকাকালে শ্রম, সমাজকল্যাণ, বুনিয়াদী গণতন্ত্র, স্থানীয় সরকার ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

নির্মল সেন

১৯৩০ সালে নির্মল সেন গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার পিঞ্জুরী ইউনিয়নের দীঘিরপাড় গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। বরিশাল জেলার কলসকাঠি হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়াশোনাকালীন অবস্থায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত ছাড় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং পর পর ১৬ দিন স্কুলে ধর্মঘট করেন। ১৯৪৪ সালে প্রবেশিকা পাস করেন।

১৯৪৬ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে তিনি আইএসসি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। এবং ব্রজমোহন কলেজে কেমিস্ট্রি-তে আনার্স নিয়ে বিএসসি-তে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন বরিশাল শহরে গেলে তার সফরকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হলে মুসলিম লীগের আব্দুল মালেক নিহত হয়। ফলে আবার নির্মল সেনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। দীর্ঘদিন অগোপনের পর যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করার পরে কলেজে ফিরে আসলেও পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ হয়নি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়। হুলিয়া মামলা নিয়ে তাকে পালিয়ে এসে নাম বদল করে এক হোটেলে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। ১৯৫৬ সালে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভা গঠিত হলে মামলা প্রত্যাহর করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হয়, এবং জেলে যাওয়ার আশংকায় ঢাকা সিটিনাইট কলেজে বিএ ক্লাশে ভর্তি হন।

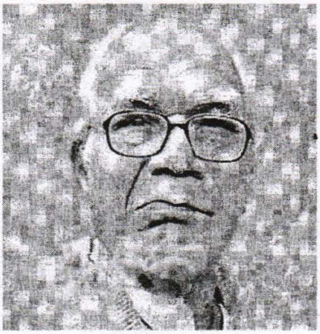

নির্মল সেন

www.pathagar.com

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচন নিয়ে তোলপাড় হয়। ফলে মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটিশে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়। জুলাই মাসে ভাইস চ্যান্সেলরের নির্দেশে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে দেয়া হয় এবং আর্টস বিল্ডিংয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। চ্যান্সেলরের নির্দেশ অমান্য করে ২৫ আক্টোবর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে প্রবেশ করেন। ওই রাতে নিরাপত্তা আইনে আবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। জেল থেকে ১৯৬১ সালে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬২ সালে জেলখানা থেকে এমএ প্রথম পর্ব পরীক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা পরীক্ষা বর্জন করে ফলে জুন মাসে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি করতে অস্বীকার করে। ভাইস চ্যান্সেলর ড. মাহমুদ হোসেনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৬৩ সালে অর্থনীতিতে এমএ পাস করেন।

১৯৭১ সালের পর ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে তিনি কোটালীপাড়া টুঙ্গীপাড়া নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং পরাজিত হন। নির্মল সেন চিরকুমার। তিনি ২০১৩ সালে ৮ই জানুয়ারি পরলোক গমণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সৈনিক শেখ সেকেন্দার আলী

শেখ সেকেন্দার আলী, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী একটি সংগ্রামী নাম। ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও বরিশাল অঞ্চলে নেতাজী' নামে সুপরিচিত। ১৯৩৪ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার উত্তরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার না শেখ মফিজ উদ্দিন।

শেখ সেকেন্দার আলী

নিঃস্বার্থ শেখ সেকেন্দার আলী ছিলেন এসব অঞ্চলের অতি জনপ্রিয় মানুষ এবং কোটালীপাড়া তথা গোপালগঞ্জের কৃতি সন্তান। কৈশোরেই তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সহচার্য লাভ করেন এবং তার আর্দশে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আপনজন। নিজের সন্তানদের মতো বঙ্গবন্ধু তাকে ভালোবাসতেন। ঘর-সংসার, বাবার সম্পত্তির মোহত্যাগ করে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন দুঃখী মানুষের জন্য। '৬৬-এর ৬ দফা '৬৮-এর ১১ দফা এবং

www.pathagar.com

'৬৯-এর গণআন্দোলনে তিনি রাজপথের সৈনিক ছিলেন। '৭০-এর নির্বাচনের সময় দলীয় প্রচারণায় তার ভূমিকা অনন্য। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে তার সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শে গোপালগঞ্জ মাদারীপুর, বাগেরহাট ও বরিশালের উত্তরাঞ্চলে হেমায়েত উদ্দীন বীর বিক্রম হেমায়েত বাহিনী গড়ে তোলেন। পুরো নয়টি মাস তিনি এই বাহিনীর সঙ্গে থেকে মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলে শেখ সেকেন্দার আলী স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ভয় ভীতি উপেক্ষা করে ছুটে যান টুঙ্গীপাড়া। বঙ্গবন্ধুর কবর আগলে ছিলেন প্রায় ২০ বছর। বঙ্গবন্ধুর একখানি ছবি আয়নার বাধিয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ান মাঠ প্রান্তর। সুদীর্ঘ ২৩ বছর তিনি এভাবে কাটিয়েছেন। পরনের কোনো আলাদা কাপড় ছিল না। এক কাপড়ে থাকতেন তিনি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁর সুচিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্তি করা হয়। তিনি কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে আবার কোটালীপাড়া চলে যান। তিনি ২০০১ সালের ৩১শে জানুয়ারি মারা যান।

অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

প্রাচীন ঐতিহ্যের গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাসাধন ন্যায়ভূষণ, পণ্ডিত হরিদাস তর্কতীর্থ, আকাশবাণীর ভাষ্যকার সুধীর সমাজপতি, ডেপুটি জজ উমাচরণ রায় চৌধুরী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ধীরেন সেন, বিচারপতি রাজেন্দ্র সেন, সংগীতজ্ঞ তারাপদ চক্রবর্তী, কবিরাজ মথুরানাথ সেন গুপ্ত, দুর্গ প্রশান্ত কর, সংস্কৃত কবি কৃষ্ণনাথ, ফুটবল খেলোয়াড় বলাই দে, ওস্তাদ সুধীন লাল চক্রবর্তী, ফার্সি ভাষার পণ্ডিত আব্দুর রহমান, ভাষাবিদ পণ্ডিত পঞ্জিকা বিশারদ অনন্ত বিশারদ কলকাতা কটন মিলের প্রতিষ্ঠাতা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য, রায়চরণ চক্রবর্তী, পণ্ডিত লোকনাথ রায় চৌধুরী, খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন চৌধুরী, মাতৃভক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস, নানু মিয়া, দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী, পৃথ্বীশ চন্দ্র রায়, সৈয়দ আহমেদ বেগ, খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, হাজী ছক্কু মিয়া, ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, কাজী বিলায়েত হোসেন, সতীশ চন্দ্র হালদার, কাজী আকরাম উদ্দীন আহমদ, হরিদাস সিদ্ধান বাগীস, গীতিকার কে এম চাঁদ মিয়া, শেখ পরশউল্লাহ, সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ফনিভূষণ মজুমদার, ওয়ালিউর রহমান লেবু, কমলেশ বেদজ্ঞ, ইসমত কাদির গামা, সাবেক গণপরিষদ সদস্য এম এ খায়ের, কাশেম রেজা, অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মো. সাইদুর রহমান (চানমিয়া মোক্তার), লৎফুল হক চৌধুরী , মরহুম বজলুর রহমান তালকুদার, কাজী আবদুর রশিদসহ আরও অনেকে।

তথ্যসহায়ক

১. ড. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস।
২. মাসুদ সিদ্দিকী, টুঙ্গীপাড়ার প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।
৩. মো. লুৎফর রহমান চুন্নু, পিতা : মো. সিরাজ উদ্দিন, গচাপাড়া, গোপালগঞ্জ।
৪. দিলীপ কুমার ঠাকুর, রামধন ঠাকুর, গ্রাম : হরিনাহাটি, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

www.pathagar.com

৫. ইব্রাহীম শিকদার (মসজিদের খাদেম), বহলতলী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
৬. সুজন হালদার, সুকান্ত লাইব্রেরি কাম অডিটোরিয়াম, উনশিয়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
৭. আবুল ফজল খন্দকার, গ্রাম : নারিকেল বাড়ি, কোটালীপাড়া, ও মতিলাল দাস, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, নারকেল বাড়ি হাই স্কুল, কোটালীপাড়া।
৮. মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু, গ্রাম : ভূয়ারপাড়া, কোটালীপাড়া।
৯. আকফাতুর রহমান, চিত্রাপাড়া, কোটালীপাড়া।
১০. স্বপন কুমার কীর্ত্তনীয়া, বয়স : ৫১ বছর, পেশা : গ্রাম্য ডাক্তার, চেম্বার-কাশিয়ানী, থানা ও গ্রাম : কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
১১. কৃষ্ণপদ সরকার, বয়স-৬০, পেশা : (অব.) শিক্ষক, গ্রাম : বিদ্যাধর, উপজেলা : কাশিয়ানী।
১২. ভক্ত প্রবন কৃষ্ণ বিশ্বাস, গ্রাম : নড়াইল, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
১৩. আবদুল সত্তার, বয়স-৭৩, পেশা : (অব.) মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, গ্রাম : জ্যোৎকুরা, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
১৪. মো. ইদ্রিস আলী মিয়া (বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা), গ্রাম : ছোট বাহিরবাক, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
১৫. অজিত কুমার বর, পেশা : চাকরিজীবী, গ্রাম : লক্ষ্মীপুর, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
১৬. মাইনউদ্দিন, প্রাক্তন শিক্ষক, এস এম মডেল হাই স্কুল, গোপালগঞ্জ।
১৭. শ্যামল ভৌমিক, বয়স : ৫১, পেশা : ইউপি সদস্য (বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যান), গ্রাম : রামদিয়া, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
১৮. মো. ইদ্রিস আলী মিয়া, যুদ্ধকালীন মুজিব বাহিনী কমান্ডার, গ্রাম : ছোট বাহিরবাগ, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
১৯. মো. লিয়াকত আলী মোল্লা (মুক্তিযোদ্ধা), গ্রাম : সোনাটিয়া, কোটালীপাড়া।
২০. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, জুন ২০১১
২১. ফরজা কবির সেতু, গোপালগঞ্জ সদর।
২২. মিহিস্কেল বালা, বেদগ্রাম, গোপালগঞ্জ।
২৩. মো. জুলফিকার আলী, টুঙ্গীপাড়া সদর।
২৪. মো. মনির তালুকদার, পিতা : মো. বেলায়েত হোসেন, কোটালীপাড়া।
২৫. গঙ্গাধর প্রসাদ, গ্রাম : বান্ধাবাড়ি, কোটালীপাড়া।
২৬. মনোজিৎকুমার দাস, *ভারত বিচিত্রা*, পৃষ্ঠা-৪৮, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
২৭. মোঃ আবদুর রাজ্জক মোল্লা, সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া।
২৮. ফয়সাল হোসেন তালুকদার, উত্তরপাড়া, কোটালীপাড়া।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/রূপকথা/উপকথা

দুই চতুরের চাতুরি

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় বনগ্রামে গেন্দু ফকির নামে একজন সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন। পদকার হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল অনেক। বিচক্ষণতায় তিনি যে একেবারে পিছিয়ে ছিলেন একথা সত্য নয়। একটি দু'টি নয় এরকম বহু নিদর্শনই রেখে গেছেন তার ক্রিয়া কর্মে। গ্রাম বলি কেন সমগ্র এলাকাবাসী সেই গেন্দু ফকিরকে নিয়ে আজও গল্প করে থাকে। অন্যদিকে নারিকেলবাড়ি গ্রামের আরেকজন অতীব চতুর ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব নাম তার বলাকাওরা। উদ্ভট কর্মে তার তুলনা মেলা ভার। এমন এমন কাণ্ড ঘটায়ে গেছেন যা কিংবদন্তিতে রূপ নিয়েছে। তার উপরে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াবে এমন যোগ্যতা তৎকালে কারও ছিল না। ঐ এলাকার জনগণও বলাকাওরাকে নিয়ে ঢের মাতামাতি করতো।

একদা বৌলতলী হাটে বসে উভয় অঞ্চলবাসীর মধ্যে গেন্দু ফকির ও বলাকাওরাকে নিয়ে চাটাম ছোড়াছড়ি হচ্ছে। বনগ্রামবাসী বলছে, আরে গেন্দু ফকির বাপের বেটা বটে। কোনো যোগ্যতার মাপ কাঠিতে তিনি খাটো নয়। নারিকেলবাড়ি গ্রামবাসী বলছে, ধূ...র বলাকাওরার কাছে গেন্দু ফকির কিছুই না। সারা বিকেলে চলল উভয় পক্ষের মধ্যে বাক্‌মহড়া। এ ঘটনা কান বদলিয়ে পৌঁছে গেলো আসল দু'জনার কাছে। গেন্দু ফকির ভাবল এর একটা বিহিত করতে হয়। এলাকাবাসীর সম্মান রক্ষার্থে বলাকাওরাকে ভালো একটা ঠক দেওয়া দরকার। ওদিকে বলাকাওরারও ঐ একই ভাবনা। বলাকাওরা ভাবছে গেন্দু বেটাকে এমন ঠক দেব যাতে আমার এলাকাবাসীর বড় গলা বজায় থাকে। তিনি ভাবলেন ব্যবসার মাধ্যমে গেন্দু ফকিরকে ঠকায়ে আসব। তাই তিনি বর্ষা মৌসুমে দক্ষিণ দেশ হতে ভালো ভালো পানিকচু কিনে আনলেন। নৌকায় সেগুলো সাজিয়ে যাত্রা করলেন গেন্দু ফকিরের গ্রামের দিকে। ব্যবসায় লাভ লোকসান যা হয় হোক আসল কথা গেন্দু ফকিরকে ঠকাতে হবে। অমন সুন্দর কচু দেখে বাড়ির মহিলারা বেপারীকে ডেকে ডেকে ঘাটে ভিড়াচ্ছে আর কচু কিনছে। বিশেষ করে গ্রাম্য নারীরা সবজির উপর নজর একটু বেশি দেয়। এটি একটি সুস্বাদু তরকারি। আবার কুৎসিৎ গালি হিসেবে কচু শব্দ ঢের প্রচলিত আছে। সব বাড়ির মহিলাদের নিকট কচু বিক্রি করে মনের আনন্দে তাইরে নাইরে গান গাইতে গাইতে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। ইত্যবসরে গেন্দু ফকির নিত্যদিনের মতো কাজকর্ম সেরে নিজগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই বলাকাওরার সাথে দেখা। বললেন, ভাই কোথায় কি জন্য গিয়েছিলেন?

বলাকাওরা বললেন, ভাই গিয়েছিলাম কচুর বাণিজ্য করতে। বিভিন্ন গ্রামে বেশ কিছু কচু বিক্রি করেছি কিন্তু আপনার গ্রামে এমন কোনো মহিলা নেই যাদের কচু

www.pathagar.com

দেইনি। গেন্দু ফকির ক্ষোভে দুঃখে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে লাগলেন। এত বড় সাহস! আমার গ্রামের সব মহিলাদের কচু দিয়ে এসেছে। যাক ভালোই হয়েছে। বিচক্ষণতা দিয়ে আমি এর প্রতিশোধ তুলে আনবই।

পরিকল্পনা করতে লাগলেন কীভাবে এর দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া যায়। পেয়েও গেলেন সুন্দর কৌশল। গেন্দু ফকির বিভিন্ন এলাকা থেকে ভালো ভালো কাঁচা সুপারী সংগ্রহ করলেন। ভাবলেন বলাকাওরা আমার নাম শুনেছ, কাণ্ড দেখনি। এবার দেখতে পাবে গেন্দুর কেমন উল্টো কৌশল। গেন্দু ফকির ঝুড়িতে সুপারী নিয়ে যাত্রা করলেন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হলেন বলাকাওরার গ্রাম নারিকেলবাড়িতে। এ অঞ্চলে ১০টি সুপারীকে ১ ঘা বলা হয়। এত সুন্দর সুপারী দেখে গ্রামের নারীরা গেন্দু ফকিরকে ঘিরে ধরলেন। কেউ বললেন ব্যাপারী ভাই আমাকে এক ঘা দেন। কেউ বললেন আমারে দু'ঘা দেন আবার কেউ বললেন আমারে চার-পাঁচ ঘা দেন। এভাবে গেন্দু ফকির যার যার চাহিদা মতো গুণে গুণে ঘা দিয়ে বাড়ি ফিরছেন। এমন সময় পথে দেখা বলাকাওরার সাথে। কাওরা মশাই বললেন, ফকির ভাই কোথায় গিয়েছিলেন। উত্তরে গেন্দু ফকির বললেন, ভাই গিয়েছিলাম সুপারীর বাণিজ্য করতে। কি আর বলব আপনার গ্রামের এমন কোনো মহিলা নেই যাকে দুই-এক ঘা দিইনি। প্রত্যেকের চাহিদা মতো ঘা দিয়ে বাড়ি ফিরছি। বলাকাওরা বুঝলেন এ যে কচুর প্রতিশোধ। চতুরেরও চতুর থাকে তাই প্রমাণ করে গেলেন গেন্দু ফকির।

চরণ সেবা

বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা জানাতে চরণে প্রণতি করা বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি। এই চরণ সেবাকে কেন্দ্র করে কখনও কখনও সংস্কার ডিঙিয়ে কুসংস্কারেও রূপ নিতে দেখা গেছে। নিম্নের লোক কাহিনিতে তার নিদর্শন ফুটে উঠেছে।

অনেক দিন আগের কথা। পূর্ব কোটালীপাড়ায় এই চরণ সেবা নিয়ে ঘটেছিল একটি মজার ঘটনা। তা আজ কিংবদন্তিতে রূপ নিয়েছে। এক গৃহস্বামী পুত্রধনকে বিবাহ দিয়ে ঘরে তুললেন নব পুত্রবধূ। তাও আবার বাল্য বিবাহ। ছেলের বয়স দশ আর মেয়ের বয়স আট। তখনকার দিনে পাত্রীর বয়স ষোলো বছর অতিক্রম করলে মা-বাপের ঘুম হারাম হয়ে যেত। উনিশ-কুড়ি বছর হলেই মেয়েকে বলা হতো আইবুড়ি। সংগত কারণে সেসময়ে বাল্য বিবাহ বেশি ঘটতো। যেই মেয়েটি ঐ গৃহস্বামীর গৃহে বাল্য বিবাহ বরণ করে প্রবেশ করল তখনই তার শুরু হলো গতর কাঁপা। কখন কি করবে, কাকে কি বলবে এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতায় দেখা দিত এক গাদা ঘাটতি। ভয় ও অল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে দিন কাটিয়ে রাত আর রাত কাটিয়ে দিন অতিবাহিত করতে লাগল। কারণে অকারণে শাশুড়িও খুঁজে বেড়াতো বৌয়ের দোষ। কখনও অল্প সুরে কভুবা বেশি সুরে, আবার কখনও চাপা সুরে ঝাড়ি মারতো পুত্রবধূর উপর। গৃহকর্তা মানে বৌয়ের শ্বশুর শুয়ে আছেন কাছারি ঘরের খাটে। সময়টি সন্ধ্যে। বড় বড় করে চোখ পাকিয়েও ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। শাশুড়ি পুত্রবধূকে বলল, যাও ঐ কাছারি ঘরের চাং থেকে কিছু নালতের (শুকনা পাট শাক) পাতা পেড়ে নিয়ে এসো। শাশুড়ি মাতার কথামতো পুত্রবধূ ছুটল কাছারি ঘরের দিকে। চাং থেকে কোনো কিছু

www.pathagar.com

পাড়তে হলে চেয়ার টেবিল বা অন্য কিছুতে না উঠে আনা সম্ভব না। নেই কোনো কিছুই, কীভাবে স্পর্শ করবে উপরের চাংটি। তাই নববধূ ভাবল শ্বশুরের খাটে উঠে কাজ সমাধা করব। যেই ভাবা সেই কাজ। শ্বশুর খাটে শুয়ে আছে তা জানে বটে কিন্তু কোন দিকে মাথা আর কোন দিকে পা তা সে নির্ণয় করতে পারল না। অতি সাবধানে উঠে নালতের পাতা নিয়ে যখন নামতে শুরু করল তখন অসাবধানতাবশত পা ফসকে শ্বশুরের মাথার উপর গিয়ে পড়ল। শ্বশুর বলল কে...রে কি হয়েছে। পুত্রবধূ দেখল পা শ্বশুরের মাথায় পড়েছে, তাই বধূটি বলল বাপরে বাঁচলাম। ভাগ্যিস আমার পা শ্বশুরের পায়ের উপর পড়েনি। পায়ের উপর পড়লে নিশ্চয়ই মহা পাপের ভাগী হতাম।

কানাঘুল্লি

কানাঘুল্লি হলো পথিককে দিকভ্রষ্ট করার একটি অশরীরীর আক্রমণ (লোককাহিনি মতে)। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় কংশুর ও করপাড়ার মধ্যে যে ফাঁকা বিলটি দেখা যায় তার নাম কামনি ডাঙা। এই কামনি ডাঙার কিনার ঘেঁষে 'কানাঘুল্লি' নামক একটি অশরীরী প্রেতাত্মা বস করতো (এখনও তা আছে বলে অনেকের ধারণা)। যদি কোনো পথিক সন্ধ্যার পর ঐ স্থানটির কিনার ঘেঁষে যাতায়াত করে তার কপালে দুর্গতি নেমে আসত। দুর্গতিটি এমন–যাকে কানাঘুল্লিতে ধরবে সে শুধু হাঁটতে থাকবে। পথিকটি দেখতে পাবে ঐ তো আমার গ্রাম দেখা যাচ্ছে। আলোও মিটমিট করে জ্বলছে। তাই সে ঐ আলোকে লক্ষ্যবস্তু ধরে হাঁটতে থাকে। মজার ব্যাপার হলো ঐ হাঁটা তার রাতের মধ্যে আর ফুরাবে না। এ এক মরুচারীর মরীচিকার মতো মিথ্যে ছলনা। কংশুরের নীলকান্ত নামে এক সংসারী লোক ঐ কামনি ডাঙার কানাঘুল্লি নিয়ে প্রায়ই তামাশা করতো। যদি কেউ সেই কানাঘুল্লির খপ্পরে পড়তো তাকে নিয়ে শুরু করতো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। এতে কানাঘুল্লির খুব রাগ হলো। ভাবল সব শালারে আমি সোজা করি আর তুই আমার সাথে তামাশা শুরু করছিস? দেখাচ্ছি তোর বাঁদরামি। এদিকে নীলকান্ত এক রাতে স্বপ্ন দেখল যে তাকে সত্যি কানাঘুল্লিতে ধরে বসেছে। কি যে কষ্ট তা আর বলবার না। তাই নীলকান্তের মন খানিকটা দুর্বল হলো। না জানি ঐ রিপুর পাল্লায় কবে পড়ে বসি। তবে কোনো দিন একা একা ঐ কামনি ডাঙার কাছে যাব না। সন্ধ্যা থাক দূরের কথা। দিনেও না। এদিকে কানাঘুল্লি তো প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে নীলকান্ত শালাকে ফাঁদে ফেলবই। শালা কানাঘুল্লির নাম শুনেছিস ঘুল্লির পাল্লায় এখনও পড়িসনি। বুদ্ধি জোগাতে লাগল নীলকান্তকে বাগে আনতে। বুদ্ধি পেয়ে গেলো। নীলকান্তের আশৈশব বন্ধু নাম তার গুরুপদ। এমনই তারা জোড়ের–ভাই লক্ষণ গুরুপদের জ্বর হলে নীলকান্তেরও জ্বর হয়। আবার নীলকান্তের কাশি হলে গুরুপদ'রও কাশি হয়। দু'জনের একসাথে ক্ষুধা লাগে আবার দু'জনে একই সময় ঘুমায়, একই সময় গাত্রোত্থান করে। যে দিকে যায় দু'জনে জোড় বেঁধে যায়। কানাঘুল্লি ভাবল আমি গুরুপদের বেশ ধারণ করে ওকে নিয়ে আসব আমার মহল্লায়। তারপর শুরু করব ওকে কলুর বলদের মতো ঘুরান। একদিন বিকাল বেলায় কানাঘুল্লি গুরুপদ'র বেশ ধারণ করে ছুটে এলে নীলকান্তর কাছে। তারপর বলল, চল বন্ধু আমরা একটু বিকেলে ভ্রমণ করে আসি। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা শুরু। সূর্য প্রায় পাটে বসেছে। ভ্রমণ শেষে তারা ছুটল বাড়ির দিকে। সন্ধ্যে হাজির। ঐ কামনি ডাঙা বিলের

www.pathagar.com

কাছে ফুস করে একটা শব্দ হলো। নীলকান্ত পিছন দিকে ফিরে দেখে বন্ধু গুরুপদ নেই। কি হলো বন্ধু গেলো কোথায়? ও গুরুপদ বন্ধু ও গুরুপদ বন্ধু বলে কয়েকবার ডাক পাড়ল। বন্ধুর সাড়া আর মেলল না। বুঝে নিল ও বন্ধু নয়, শালা কানাঘুল্লি। আমাকে পেয়ে বসেছে। তাই ভয়ে ভয়ে নীলকান্ত দৌড়াতে লাগল বাড়ির দিকে। দৌড় আর দৌড়। সারারাত চলল দৌড়ের পালা তবুও বাড়ির নাগাল পেল না বন্ধু নীলকান্ত।

নন্দ কবিরাজ

অত্র এলাকায় যত গল্প বা লোককাহিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারমধ্যে নন্দ কবিরাজ ও ভূতকে নিয়ে গল্প সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমরা ছোটবেলায় সে গল্প শুনেছি আজকের ছোটরাও প্রাণভরে উপভোগ করে থাকে ঐ নন্দ কবিরাজের সেই গল্প। নন্দ কবিরাজ ছিলেন ভূতদের গুরু। চাচর ভট্ট, বাণ ভট্ট ও চিকুর ভট্ট এরা ভূতদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত। সাধারণ ভূত থাক দূরের কথা ঐ সকল সম্ভ্রান্ত ভূতেরাও নন্দ কবিরাজকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে বেড়াত। তার মতো প্রভাবশালী কবিরাজ আজ অব্দি কেউ হয়ে উঠতে পারেনি। হাজারো রকমের ভূতুড়ে মন্ত্র তার মুখস্ত ছিল। কখন কোন মন্ত্র যপ করলে ভূতরা বশে থাকে তা ছিল তার নখদর্পণে। শুধু তাকে ভূতরা বয়ে নিয়েই বেড়াত না ভূতদের দিয়ে অনেক কাজও করাতেন তিনি। পুকুর খনন, জল সেচ, ফসল বহন—এসব কাজ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। লোকমুখে শোনা যায় তিনি ভূতদের বশে আনার পূর্বে মন্ত্র পাঠ করে হাতে মাটি তুলে আঁচাল ভাঙায়ে নিতেন। এর কারণ হলো আঁচাল ভাঙানোর পরে ভূতদের কোনো সাধ্য থাকতো না নন্দ কবিরাজকে কিছু বলার বা করার। যদি কোনো কবিরাজ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আসত তিনি তাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়ে দিতেন। এবং বলতেন যদি তোমরা ভূতদের বিকট কাণ্ড কারখানায় ভয় পাও তবে এই ভূতুড়ে মন্ত্র পরিত্যাগ করে চলবে। তা না হলে সমূহ বিপদ ঘটবে। মন্ত্র-তন্ত্র মন থেকে ইচ্ছে করে দূর করার জিনিস নয় তাই তিনি উপদেশ দিতেন তোমাকে যে মন্ত্র-তন্ত্র শিখালাম তা কালো রঙের গরুর কানে কানে বলে দিবে, তাহলে ঐ মন্ত্রের আর কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। ভূতদের এই মহাগুরু একদিন ভুলক্রমে আঁচাল ভাঙাতে ভুল করলেন। ঐ দিন তিনি চাচর ভট্ট ও চিকুর ভট্ট দুই ভূতের কাঁধে চড়ে বসলেন। হঠাৎ নন্দ কবিরাজের গা ছমছম করতে লাগল। তিনি বললেন তোরা আমাকে একটু মাটিতে নামিয়ে দে। ভূতদ্বয় বলল গুরু আর না। সারাজীবন তোমাকে বহন করে বেড়াচ্ছি। আজ তুমি আঁচাল ভাঙাওনি। আজ তোমার গুরুগীরি দেখাব। এই বলে ভূতদ্বয় নন্দ কবিরাজের দুই ঠ্যাং ধরে চিরে ফেলল।

খ. কিংবদন্তি

ফেলারাম পাগলের দোয়া

সদর উপজেলায় কাটরবাড়ি গ্রামে বহুপূর্বে ফেলারাম পাগল নামে একজন সাধক পুরুষ আস্তানা গড়ে তোলেন। এই পাগলকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তি। তন্মধ্যে গোপালগঞ্জ শহরে থানা সংলগ্ন পূর্ব পার্শ্বে ফেলারাম পাগলের দোয়া নামের কিংবদন্তি সর্বাধিক আলোচিত। এ বিষয়ে যে জনশ্রুতি আছে তা এরকম—ফেলারাম পাগল একদা থানার পূর্ব পার্শ্বে পুকুর পাড়ে বসে ছিলেন। এমন সময় দারোগার স্ত্রী পুকুরে গিয়েছিলেন স্নান করতে। পাগল সহসা খিলখিল করে হেসে পড়লেন। দারোগার

www.pathagar.com

স্ত্রী মনে মনে ভাবলেন আমাকে দেখে ওই পাগলটি হেসেছে। স্ত্রী রাগান্বিত হয়ে দারোগাকে বললেন পুকুর পাড়ের ওই পাগল আমাকে দেখে খিলখিল করে হেসেছে। শয়তানটির উপযুক্ত বিচার না করলে আজ থেকে তোমার সংসার আমি করব না। দারোগা ক্রুদ্ধ হয়ে ছড়ি নিয়ে ছুটে গেলেন পাগলটির কাছে। কোনো কিছু না বলেই বেদমভাবে পাগলকে পিটাতে শুরু করেন। ফেলারাম পাগল বললেন আমাকে তো মারলি না জায়গাটিতে দোয়া ফেললি। দেখতে দেখতে দারোগার ভাগ্যের বিড়ম্বনা দেখা দিল। পুত্র কন্যা আপনজনেরা একে একে মরতে শুরু করল। এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, যে পাগলকে তিনি পুকুর পাড়ে বসে প্রহার করেছিলেন তাঁর ক্ষমার ভিতর এ দুর্দশার মুক্তি আছে। তাই তিনি ওই পাগলকে খুঁজে পেতে পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। বহুদিন পর সত্যিই সেই পাগলের সন্ধান পেলেন। করজোড়ে তিনি পাগলের কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন আপনি কেন হেসেছিলেন তার আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। উত্তরে পাগল বলেছিলেন–আমি পুকুর পাড় থেকে সেদিন দেখতে ছিলাম বৃন্দাবনের রাসলীলা। হঠাৎ রাসের দড়ি ছিড়ে গেলে সখিরা একের পর এক গড়িয়ে পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে আমি আর হাসি সম্বরণ করতে পারিনি। আর তুমি ভেবেছিলে আমি তোমার স্ত্রীকে দেখে হেসেছি। একথা শুনে দারোগা পাগলের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। পাগল বললেন, ক্ষমা ঠিক করলাম তবে ওই জায়গায় আর কোনো দিন ভরাট হবে না। কোনো মতে সেই দোয়াটি আজও ভরাট হয়নি। এটি ফেলারাম পাগলের দোয়া বলে পরিচিত। ওই গোপালগঞ্জ শহরের কোনো মিষ্টিদ্রব্য কাটরবাড়ি ফেলারাম পাগলের আশ্রমে নিয়ে গেলে পাগল তা গ্রহণ করেন না। অনেকে পরীক্ষা স্বরূপ এ কাজটি করতে গিয়ে ভীষণভাবে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। যে কেউ গোপালগঞ্জ শহর থেকে কিছু কিনে আশ্রমের দিকে রওনা হলে এ সত্যের প্রমাণ মিলবে বলে এলাকাবাসী বলে থাকেন।

তালতলা গ্রামে বারের হিজল গাছ

তালতলা নিবাসী নেহাল বিশ্বাসকে প্রায় দুইশ বছর পূর্বে বনবিবি হিন্দুমতে বনদেবী স্বপ্নাদেশ করেন যে, নেহাল আমি বাদা থেকে আসছি। এই হিজল গাছের চারাটি নে, হিজল গাছ আমি বড় ভালোবাসি। আমার এই গাছটি বড় ভালো। তুই তোর যেকোনো একটি জমিতে রোপণ করিস। আমি প্রতি বছর চৈত্র মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার আসব। ঐ দিন গাছটিকে ফুল দিয়ে সাজাবি, আমি আসব। কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ দিন গছের কাছে মানত করলে, তার বিপদ কেটে যাবে। মানতের ফল পাবে। বুড়োর ঘুম ভেঙ্গে যায়, আর ঘুমোতে যেতে পারেনি। সকালবেলা মাঠের দিকে কাজ করতে যাচ্ছে। হঠাৎ পথিমধ্যে দেখতে পায় একটা তরতাজা হিজল গাছের চারা। মনে পড়ে যায় রাতে বুড়োর স্বপ্নাদেশের কথা। ঐ অবস্থায় চারাটি নিয়ে রোপণ করে। আস্তে আস্তে গাছটির লাবণ্যতা আসতে থাকে। গাছটিকে রক্ষার জন্য বেষ্টনীও দিয়ে দেয় নেহাল বিশ্বাস। নেহাল বিশ্বাস বনমাতার কথামতো পরের বছর চৈত্রমাসের তৃতীয় মঙ্গলবারে গাছটিকে নানারকম ফুল দিয়ে সাজায়। সেখানে ধ্যানস্থ্ হতে দেখা যায় নেহাল বিশ্বাসকে। গাছ বেশ বড় হয়ে ওঠে। গ্রামের ২-১ জন করে ভিড় করতে দেখা যায় গাছের কাছে। এভাবে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ভিড় জমাতে থাকে হাজার হাজার লোক। সৃষ্টি হয় মেলার। মানত করতে থাকে গাছের কাছে, ফলও পেতে থাকে তারা। বেড়ে যায়

www.pathagar.com

মেলার পরিধি। আজও বয়ে চলেছে গাছপূজা ও মেলা। গাছটির বিশেষত্ব এখানেই যে, শুকনো মৌসুমে গাছের প্রতিটি শাখা ভূমির সঙ্গে প্রায় মিশে যায়। গাছের তলা বা নীচ দিয়ে মানুষের চলাফেরা দুষ্কর হয়ে ওঠে। কিন্তু যত বড় বর্ষা হোক না কেন গাছের কোনো একটা পাতা বা ডাল জলের মধ্যে ডুবে যায় না। এমনকি ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে যে প্রলয়ংকরী বন্যা হয়েছে তাতে গাছের একটা ডাল বা পাতা জলে ডুবে যায়নি। আশ্চর্যের বিষয়, অনেকে 'মনসা' দেবীর নামে দুধ-কলা দিয়েছে তারা স্বচোখে দেখেছে সাপরূপী মনসা দেবীকে। অত্র এলাকার বাসিন্দারা মেলাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছেন।[১]

উদয়দের দিঘি

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কোটালীপাড়ার এবং গোপালগঞ্জের কিছু অংশ যশোর জেলার অধীন ছিল। তখন কোটালীপাড়ার স্থানীয় জমিদাররা ছাড়া নড়াইলের জমিদার মনীন্দ্রনাথ রায়ের পূর্ব পুরুষেরা কোটালীপাড়ার উত্তর এলাকার স্বত্ব লাভ করেন এবং খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে তারা কোটালীপাড়া উত্তর-পূর্ব অংশের বান্ধাবাড়িতে একটি খাজনা আদায়ী কার্যালয় স্থাপন করেন, যা বর্তমানে বান্ধাবাড়ি কোটালীপাড়ার একটি প্রাচীন মৌজা। এই মৌজা মাদারীপুর মহকুমা সৃষ্টির সময় বরিশাল জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নড়াইলের জমিদারদের জমিদারি আগের মতোই বহাল থাকে। বান্ধাবাড়ির দক্ষিণ সীমান্তে এবং ভূয়ারপাড়া গ্রামের পূর্ব সীমান্তে দুশো বছর পূর্বে খনন করা হয় 'উদয়দের দিঘি' নামের একটি বিরাট জলাশয়। এই জলাশয়ের খননকার্য নিয়েই সেখানে নড়াইলের জমিদার ও কোটালীপাড়ার স্থানীয় জমিদার অর্থাৎ গচাপাড়ার জমিদার বিহারীলাল চৌধুরী, রাইচরণ চৌধুরী ও হরলাল চৌধুরীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ৪ জনের মৃত্যু ঘটে। একজনের নাম কালিপদ। এরা ছিল নড়াইলের জমিদারদের পক্ষের লোক। বরিশাল কোর্টে যথারীতি মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে ২৭ জনের জেল হয়। আন্দামানে নির্বাসিত হন বেশ ক'জন।

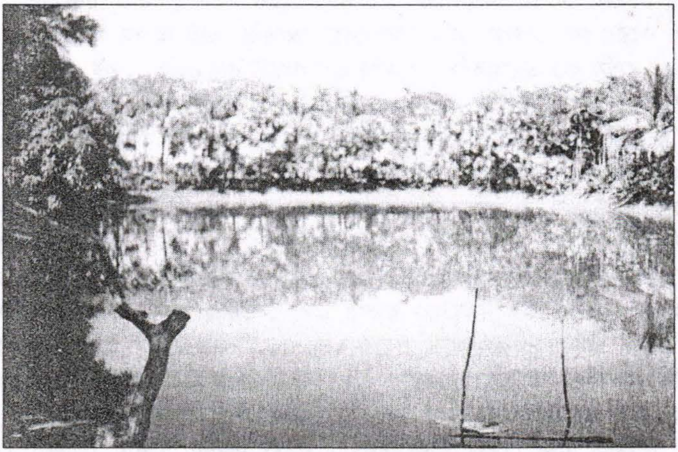

ভুয়ারপাড় ও বান্ধাবাড়ির সীমান্তে উদয়দের দিঘি

www.pathagar.com

বান্ধাবাড়ি মৌজায় জমিদারি ক্রয় করে নড়াইলের জমিদার গচাপাড়া মৌজা ও বান্ধাবাড়ি মৌজার সীমান্তে একটি দিঘি খননের কাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে স্থানীয় জমিদার রাইচরণের বাবা হরলাল চৌধুরী চিত্রাপাড়া, পূর্বপাড়া, গচাপাড়া, উত্তরপাড়া ও সিতাইকুণ্ড নিবাসী হিন্দু-মুসলিম প্রজাদের নিয়ে (লেঠেল বাহিনী) খনন কার্যে বাধা দেন। কিন্তু নড়াইলের জমিদার বাধার প্রতিবাদে খাগবাড়ি, রাজাপুর ও জহরের কান্দির হিন্দুদের নিয়ে লাঠালাঠি শুরু করেন। যাকে আমরা যুদ্ধ বলতে পারি। চারদিন ধরে এই যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে নড়াইলের জমিদার পরাজিত হন। তাঁর পক্ষের ৪ জন লাঠিয়াল মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে দিঘির খনন কার্য প্রায় সমাপ্ত হয়। যুদ্ধের পর নড়াইলের জমিদার বরিশাল জেলা আদালতে মামলা ঠুকে দেন। তখন হরলাল চৌধুরীর ছেলে রাইচরণ পটুয়াখালীতে ওকালতি করতেন। তারাও মামলায় লড়ে যান, কিন্তু সাজা হয় তার দলের ২৭ জনের। আসামীদের বেশ কয়েকজন আন্দামানে (কালাপানি) নির্বাসিত হয়। কারও হয় যাবজ্জীবন জেল। আবার কারও কারও হয় বিভিন্ন মেয়াদী সাজা। জানা যায় এই চাঞ্চল্যকর দিঘি খনন মামলায় সিতাইকুণ্ড গ্রাম থেকে ৪ জন, পূর্বপাড়া গ্রামের (মহারাজ বাগচী ও ডেঙ্গু বাড়ৈ) ২ জন, ভূয়ারপাড়া গ্রামের ১২ জন, উত্তরপাড়া গ্রামের ২ জন এবং চিত্রাপাড়া গ্রামের ৩ জনের (আলীম উদ্দিন, বদু শেখ, পাড়ু উল্লা) বিভিন্ন মেয়াদের সাজা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান লেখক উল্লেখিত আলীমউদ্দীনের ৫ম উত্তরসূরি। জানা গেছে আলীমউদ্দীনসহ অন্যান্যদের বরিশাল জেলে নির্মম নির্যাতন করা হতো। সশ্রম ছিল তাদের দণ্ডভোগ। আলীমউদ্দীনকে তেলের ঘানি টানতে হতো। তার কাঁধে ঘা হয়ে গিয়েছিল। এক সময় জেল কর্তৃপক্ষ তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় মুক্তি দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেন। তিনি বাড়ি এসেই প্রাণ ত্যাগ করেন। মামলা চলাকালে এবং পরে 'উদয়দের দিঘির' ধারে কাছেও কোনো মানুষ ঘেঁষতো না। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের ওই মামলাটির কথা ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশালের মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। এখন দীঘি আছে ঠিকই, কিন্তু দিঘি খননের যুদ্ধের কথা অনেকেই জানে না।[২]

পোনা গ্রামে দেওয়ানের আবির্ভাব

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার অন্তর্গত পোনা গ্রামে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন দেওয়ান নামে এই মহান লোকটি। কোথায় তার জন্ম, কার ছেলে, বাড়ি কোথায় কেউ জানে না। জীবনে কোনোদিন মাথার চুল, দাড়ি, হাতের ও পায়ের নখ পর্যন্ত কাটেনি। হাতের আঙ্গুলের নখ বেড়ে বেড়ে কোড়া হয়ে কব্জি পর্যন্ত মিশে গিয়েছিল। পায়ের অবস্থাও তাই। হঠাৎ এই লোকটি এসে বললেন, আরে ধামা দে ধামা দে নাও ডুবে গেলো। পোনা গ্রাম থেকে একটা ধামা নিয়ে হাঁটু গেড়ে ধামা দিয়ে জল ফেলত থাকেন। কিছু সময় পরে দেওয়ানজী বলে ওঠে, নে নৌকা জাগছে। মাঠের কৃষকরা এই কাণ্ড দেখে ছুটে আসে ঘটনাস্থলে এবং দাঁড়িয়ে দেখে দেওয়ানজীর কাণ্ড। হাঁটু এবং ধামার ঘর্ষণে দুটো গর্ত হয়ে গেছে। ঠিক যেন দুটো কুয়া। আজও তা দৃশ্যমান। আর ঐ কুয়ার পাশেই বসে থাকতেন দেওয়ানজী। পরে গ্রামবাসী মিলিতভাবে ঐ কুয়ার পাশে যে স্থানে দেওয়ানজী বসে থাকতেন সেখানে চালা বেঁধে ঘর করে দেয়। দেওয়ানজী সেখানেই থাকতেন। আশ্চর্যের বিষয় দেওয়ানজীর ডান হাতের মুঠির ভিতর

www.pathagar.com

রাখতেন এক হাত পরিমাণ লম্বা ৪ খানা বাশের কঞ্চির লাঠি। মুঠ পাকিয়ে একখানা কঞ্চি ধরে রাখতেন। মুঠির ভিতরের কঞ্চি থাকতো নীল বর্ণের, কিন্তু মুঠির বাইরের অংশটুকু শুকনো দেখাতো। যতোদিন পর্যন্ত দেওয়ানজী বেঁচে ছিলেন, ততোদিন পর্যন্ত এটা লক্ষ করা গেছে।

দেওয়ান সাহেবকে সেই গর্তের পাশেই কবরস্থ করা হয়। মাজারটি সংরক্ষিত আছে। হাঁটু এবং ধামার ঘর্ষণে যে কুয়া হয়েছিল তাও সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। তাঁর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে এখানে তিনদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলায় আউল, বাউল, দরবেশ ও সাধু সন্ন্যাসী এসে থাকেন। ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চে তিনি নিত্যধামে গমন করেন।[৩]

পাঁচকড়ি দেওয়ানের কেরামতি

কোটালীপাড়া থেকে ৫ কিলোমিটার পূর্বে মধুরনাগর গ্রামে পাঁচকড়ি দেওয়ান নামে একজন ফকিরের সমাধি বিদ্যমান। কথিত আছে, তিনি আজ থেকে দুশো/আড়াইশো বছর আগে এই গ্রামে এক আস্তানা গাড়েন। তার পিতার নাম কালু হাজরা। যৌবনের শুরুতে তিনি গান-বাজনা করতেন। বিশেষ করে গাজীর গীত গেয়ে সুনাম অর্জন করেন। এ কারণেই পিতৃভূমি ত্যাগ করে মধুরনাগরায় চলে আসেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কথিত আছে, তিনি নাকি কামিলিয়াত অর্জন করেন। শোনা যায়, তার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে মানুষ এলে তিনি আল্লাহর দোহাই দিতেন।

পাঁচকড়ি দেওয়ানের মাজারে প্রতি বছর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। এই ওরশে তারই অনুরাগীরা বিভিন্ন মানত নিয়ে অংশগ্রহণ করে। যে গাভী দুধ দেয় না এবং যে গাছে ফল ধরে না, পাঁচকড়ি দেওয়ানের নামে মানত করা হলে সুফল পাওয়া যায়। এরকম অনেক কেরামতি তার নামে চালু রয়েছে। অনেকে বলেন, 'তিনি নাকি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। বর্তমানে দেওয়ানের পঞ্চম উত্তরাধিকারী দেখাশোনা করেন। তিনি ।'[৪]

বিদ্যাধর গ্রামের পৌরাণিক বিরাট পুকুর

প্রায় দুই একর জমির উপর বুকভরা জল নিয়ে আজও টিকে আছে পুকুরটি। কে, কবে, কখন খনন করেছে তার কোনো হদিস নেই। পুকুরটি উত্তর দক্ষিণে দীঘল। ভাবতে অবাক লাগে যে পুকুরটির চারটি কোণে চারটি ঐতিহাসিক স্থাপনা আছে। পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে ১১০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়। উত্তর-পশ্চিম কোণে কালীমন্দির, যার বয়স ১০৫ বছর। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে আছে বটগাছ, যার বয়স ৬০ বছর এবং পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা মসজিদ। যার যার ধর্ম পালনে কোনো বাধা হয় না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বয়ে চলে এই গ্রাম। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে আছে বহু পূর্বের একটি শ্মশান। পুকুরে উত্তর পাড়ে একটি বাঁধানো ঘাট। অবশ্য তা এখন সামান্য মাটির নীচে। ঘাটলাটি বর্তমান ইটের তৈরি নয়। চুন-সুরকি দিয়ে সিঁড়ি করা।

জনশ্রুত যে, এই পুকুরে সোনার নাও পবনের বৈঠা ছিল। গভীর রাতে নাকি গ্রামবাসী ঝুমুর ঝুমুর তালে নৌকা বাইচের শব্দ শুনেছে। এখন আর তা নেই। একটি পাড় ভেঙে নাকি নৌকাটি চলে গেছে।[৫]

www.pathagar.com

গ. লোকপুরাণ

প্রয়োজনেই অবতার পুরুষ আসেন এই ধরাধামে। প্রয়োজনীয় কর্ম শেষ করে আবার তারা চলে যান নিত্যধামে। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই বয়ে চলেছে এ নিয়ম। এসেছেন প্রভু রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, এসেছেন প্রেরিত পুরুষ পয়গম্বর হযরত মুহম্মদ (সাঃ)। শ্রীচৈতন্য দেবের অসমাপ্ত লীলা সমাপ্ত করার জন্য নমশূদ্র কন্যার গর্ভে জন্ম নিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর শাফলীডাঙ্গা গ্রামে। সাদৃশ্য এখানেই যে, ত্রেতাযুগে প্রভু রামচন্দ্র দেবী দুর্গার পূজা করার জন্য দেবীদহ হতে যে নীলোৎপল চয়ন করেছিলেন, মর্তে এসে সে ফুল কস্তুরী ফুল অর্থাৎ কচুরী ফুল নামে পরিচয় লাভ করে।

কালগুণে মহতেরা তাদের তেজ গোপন করে থাকেন। তাই বলে তো মহতের মান কমে যায় না। জহরে জহরি পেলে চিনে নেয়। তাই তো হরিচাঁদ ঠাকুর বাল্যকালে ব্রজ, নাটু, বিশ্বনাথকে নিয়ে রত্নডাঙার বিলে গরু চরাতেন। আর সবাই এই কস্তুরী ফুল দিয়ে ঠাকুরকে সাজাতেন। কোনো কোনো সময়ে ওই কস্তুরী ফুল কর্ণেতে, কখনও কটিদেশে গুজে পায়ের উপর পা রেখে এমন ভঙ্গিমায় দাঁড়াতেন যেন সেই গোকুলের কানাই। দ্বাপরের সেই শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রে প্রমাণ রাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণ দুই দেহ এক হয়ে এলেন গৌরাঙ্গ অবতার হয়ে। যিনি শ্রী চৈতিন্যদেব। শ্রীকৃষ্ণ একবার রাধিকাকে বলেছিলেন, রাধা, তুমি আমার লীলাসঙ্গী হয়ে লীলায় থাকলে, কিন্তু আমি তোমার ঋণ কি দিয়ে শোধ করব? উত্তরে শ্রীরাধিকা বলেছিলেন তুমি আমার ঋণ কোনো দিন শোধ করতে পারবে না। তবে পারবে, যদি তুমি ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাতে পার তাহলে তুমি আমার ঋণ শোধ করতে পারবে। তাইতো শ্রীকৃষ্ণ নদীয়ায় শচীমাতার গর্ভে জন্ম নিলেন। কিন্তু তিনিও পারেননি ঘরে ঘরে নাম বিলাতে। যে জাতি বর্ণ বৈষম্যের স্বীকার, সে জাতি নমশূদ্র জাতি। রাজ রোষাণলে তারা স্কুল কলেজে যেতে পারেনি, তাদেরকে হাটে বাজারে যেতেও নিষেধ থাকতো। পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল এদেরকে। জাতিভেদে নিপীড়িত এই জাতি বনে, জঙ্গলে, বিল অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়। তাদেরকে স্পর্শ পর্যন্ত করতো না তখনকার তথাকথিত উচ্চবর্ণ নামধারী ব্যক্তিবর্গ, রাজন্যবর্গ। সে জাতিকে হরিনাম থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল, তাদেরই ঘরে জন্ম নিলেন শ্রীচৈতন্যদেব হরিচাঁদ ঠাকুর রূপে। বাংলা ১২১৮ সনে শাফলীডাঙা গ্রামে শ্রী যশোমন্ত ঠাকুরের ঘরে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে তিনি আবির্ভূত হন। চৈত্র মাসে অমাবস্যা তিথির আগে যে ত্রয়োদশী তা মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি নামে পরিচিত। আরও আশ্চর্য বিষয় যে, এই অবতার পুরুষটি যে তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই তিথিতেই তিনি নিত্যধামে চলে যান।

প্রথমেই আরম্ভ হয় ধর্ম আন্দোলন। সৃষ্টি হয় মতুয়া সম্প্রদায়। মতুয়া শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হরি নামে যারা মাতোয়ারা। হরিচাঁদ ঠাকুর হলেন এ সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক। ভক্তদের কাছে দিনটি দুটি কারণে প্রসিদ্ধ। এক. হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম তিথি ও মৃত্যু তিথি; দুই. মহাবারুণীর পুণ্য তিথি। হিন্দু পুরাণে বারুণী তিথিতে স্নান করলে পুণ্য সঞ্চিত হয় বলে উল্লেখ আছে। তাই প্রতি বছর এই পুণ্য তিথিতে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, লড়াইল, বাগেরহাট, খুলনা, পিরোজপুর, বরিশাল, সাতক্ষীরা, রামপাল, কয়রা, শ্যামনগর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, যশোর প্রভৃতি জেলা থেকে লক্ষ

www.pathagar.com

লক্ষ মতুয়া ভক্ত আসে পুণ্যভূমি শ্রীধাম ওড়াকান্দি হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলাভূমিতে। এখানে চারটি পুকুর আছে। বিশেষ করে কামনা সাগর ও দুধ সাগরে স্নান করে মতুয়ারা পুণ্য সঞ্চয় করে।

সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা এই তিনটি স্তম্ভের উপর মতুয়াদর্শ প্রতিষ্ঠিত। জাতিভেদ বা সম্প্রদায়ভেদ মতুয়াবাদে স্বীকৃত নয়। হরিচাঁদ ঠাকুর নিম্ন শ্রেণির নিম্নস্তরের লোকদেরই বেশি করে কাছে টেনেছেন। তাদের যথার্থ সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাই দেখা যায় তাঁর শিষ্যদের সিংহভাগই সমাজের নিম্ন শ্রেণির লোক। প্রতিটি মতুয়া দলে একজন দলপতি থাকে। তিনি মতুয়া দলটিকে পরিচালনা করে থাকেন। তাঁর পিছে পিছে ছুটে চলে নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী। মতুয়া ভক্তদের মুখে শুধু হরিবোল। দলপতির হাতে থাকে সোয়া হাত লম্বা একটি দণ্ড। মতুয়াদের হাতে থাকে ত্রিকোণ বিশিষ্ট লাল নিশান, জয়ডঙ্কা, কাশী ও সিঙ্গা। তালে তালে হরিবোল, হরিবোল রব করতে করতে লাল নিশান নিয়ে পায়ে হেঁটে শহর, গ্রাম, মাঠ, ঘাট পেরিয়ে ছুটে চলে সবাই ওড়াকান্দি। এদের সকলের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আর তা হলো শ্রীধাম ওড়াকান্দিতে পুণ্য তিথিতে গঙ্গাস্নানের পুণ্যফল লাভ করা।

প্রথমে তারা হরি মন্দির প্রদক্ষিণ করে। পরে কামনা সাগর ও দুধ সাগরে স্নান করে।

হরিচাঁদ ঠাকুরের যোগ্য ছেলে গুরুচাঁদ ঠাকুর একজন দ্রষ্টা পুরুষ। মুক্তিবারিধি গুরুচাঁদ ঠাকুর নিম্ন বর্ণের যারা অস্পৃশ্য, তাদেরকে উদ্ধারের জন্য তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। আধ্যাত্মিক জগতের এই পরমগুরু ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তাঁরই উদ্যোগে মতুয়াদের সম্মিলিত প্রয়াসে ১৮৮০ সালে সাড়ম্বরে শুরু হয় মহাবারুণী তথা গঙ্গাস্নানের উৎসব।

হরিচাঁদ ঠাকুর সন্ন্যাস জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংসারী এবং সংসার ধর্ম পালন করেই তিনি প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর ধর্ম সাধনের মূল হলো :

গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়
সেই যে পরম সাধু জানিও নিশ্চয়।

তিনি এদেশের অবহেলিত সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।[৬]

ঘ. লোকছড়া

প্রত্যেক বাড়িতে নিত্য দিনের ভোরবেলার সাজ ও কাজ হলো গোবরের ছড়া। বিশেষ করে হিন্দু বাড়িগুলোতে এই আচার আচরিতে দেখা যায়। সেই গোবর ছড়ার ছন্দময় তান না শুনলে এর মাধুর্য ভাষায় বুঝানো দুষ্কর। কোনো কোনো লোকাচার হারিয়ে গেছে, কোনো কোনো লোকাচার হারিয়ে যেতে বসেছে, আবার কোনো কোনো লোকাচার আজও আগের মতো বয়ে চলেছে। যে লোকাচার হারিয়ে যায়নি গোবর ছড়া তার মধ্যে একটি। কুলবধূরা আজও বালতি বা অন্য কোনো পাত্রে গোবর গুলিয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে বাড়ির আঙিনায় ছিটায়ে দেয়। ভোরের পাখির কলরব আর ঐ ছন্দময় গোবর ছড়ার শব্দে এখনও কৃষক পরিবারগুলোর ঘুম ভাঙে। কোনো কর্কশ বা অশুভ শব্দ শুনে ঘুম না ভাঙার জন্য এই সনাতনী পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে বলে প্রাচীনেরা মন্তব্য করে থাকেন। গোবরের আরেকটি বিশেষ গুণ হলো এটি জীবাণু নাশক। গু + বর =

www.pathagar.com

গোবর। গু মানে মল, আর বর মানে শ্রেষ্ঠ। বলা যায় গোবর মানে শ্রেষ্ঠ মল। জীবাণু নাশক এই পরিপ্রেক্ষিতে এটির ব্যবহার ছড়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মঙ্গলজনক কাজেও এর ব্যবহার দেখা যায়। ঘরের দরজায় অর্ধ চন্দ্রাকারের ন্যায় গোবরের প্রলেপ দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ হলো বাইরে চলাফেলার ফলে পায়ে জড়িত রোগ জীবাণু গোবর মাড়িয়ে ঘরে যাওয়ার সময় তা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। তাছাড়া মরদেহ ঘর থেকে শ্মশানে নেওয়ার সময় পিছে পিছে গোবর ছড়া দেওয়া হয় যাতে মরদেহ হতে কোনো জীবাণু সংক্রমিত হতে না পারে। প্রাচীনকালে এন্টিবায়োটিক ছিল না। তাই এইভাবে মানুষ রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করত। গোবর দ্বারা ঘষি ও কুচিয়া বানিয়ে পল্লিবাসীরা জ্বালানির অভাব পূরণ করে। যাইহোক, ওই ছন্দময় গোবর ছড়ার অনুকরণে প্রাচীন পাদকেরা ছন্দময় বাক্যগুলোকে ছড়া নামকরণ করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। যেমন–

নোটন নোটন পায়রাগুলো
ঝোটন বেঁধেছে
ও পারেতে ছেলেমেয়ে
নাইতে নেমেছে।

গোবর ছড়ার তাল আর বর্ণমালার গাঁথুনির ছড়ার তাল শুনতে প্রায় এই রকমের। লোকজসংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সত্যের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও যৌক্তিক ব্যাখ্যায় তা প্রায় কাছাকাছি। একজন কুলবধূ শান্তিদেবী (৫৩), তার কাছে গোরব ছড়া সম্পর্কে এর উপকারিতা ও ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি যা বললেন–'আমি এর ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারব না। তবে বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে মা-চাচিদের ছড়া দিতে দেখেছি। বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়িও বললেন ভোরে ভোরে বাড়ির আঙিনায় গোবর ছড়া দিতে। শুধু ছড়া না, গোবর দ্বারা আমরা উঠানও লেপে থাকি। ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও ব্যবহার করি। হয়তো এর ভালো গুণ আছে। তা না হলে এর এত দাম ক্যান।'

লোকসংস্কৃতিতে লোকছড়ার মর্যাদা অমলিন। বৃষ্টি নামানীর ছড়া এখনও মা-বোন ও ছোটদের মুখে শোনা যায়।

চেগারাণী ভেগারাণী
কচুখোলা হাঁটুপানি
ধান দুব্বা গুয়াপান
আকাশ থেকে বৃষ্টি আন।

গ্রামের মেয়েরা প্রচণ্ড রৌদ্র তাপের দিনে কুলোতে ধান দুব্বা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বৃষ্টি নামানোর জন্য এই ছড়াটি কাটে। শুধু তাই নয় ছড়াকাটার বিনিময়ে গেরস্ত বধূদের প্রদত্ত চাল দিয়ে বনভোজন করে। এ রকম আরেকটি ছড়া–

আউশ ধান পউশ ধান
বউয়ের মুখের দুখের গান
ধান ভেসেছে বিষ্টি জলে
ছাগল ভেড়া গাছের তলে।

www.pathagar.com

ছড়া

(১)

এক-দুই শুই শুই
চুপ কর খোকা তুই।
তিন-চার খাবে মার
দুষ্টুমি নয় আর।
পাঁচ-ছয় আর নয়
শুয়ে পড় রাত হয়।
সাত-আট পেতে খাট
খোকা মোর বড় লাট
নয়-দশ বস বস
নাক ডাকে ভস ভস।

(২)

ছাদি ছাদি ত্যাজপাতা
ছাদির বিয়া কলকাতা।
ছাদি যদি জানতো
পাটি বিছায়ে কানতো।
পাটির তলে রক্ত
ছাদি বড় শক্ত।

(৩)

ও মালী?
কি লো।
কার বিয়া?
রাজকন্যার রাজপুত্তুর সাথে
তোর কি তাতে?
মোরে দিবে মালা গাথে
পূর্ণিমা রাতে।

(৪)

কর্ম দশা কর্ম দশা
বিয়ে করছি শংকর পাশা।
কিনে আনছি রিঠার মুড়ো
খাই বসে ইচার গুড়ো।
ও ভাড়ে নাই ঘি
উপুড় করলে হবে কি।

(৫)

ঝুটকুলুরে ঝুটকুলু
কাপড় ধুয়ে দে
তোর বিয়াতে নাচতে যাব
ঢোলক কিন্যা দে।

www.pathagar.com

ঢোলকের মধ্যে পচা পান
দেখলো কেমন অপমান।

(৬)

পদ্ম ফোটা পুকুরে
দেখে এলাম খুকুরে
খাচ্ছে বসে হাওয়া।
মাছ নেলো ঐ কুকুরে
দেখিস না মুখ মুকুরে
করল তারে ধাওয়া।
ডাকছে বসে খুড়োতে
চুল পাকা এক বুড়োতে
বাড়ি তাহার মাওয়া।

(৭)

মা কাকড়া বলছে ডেকে
বাবা কাকড়ার কাছে
ও মিনসে কি হইছে?
কাঁপছি বসে জ্বরে।
ওষুধ নাই পাতি নাই
বদ্যি ডেকে আন
তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে
শুনবো ট্যাপার গান।

(৮)

আকাশেতে এলোমেলো
আলোগুলো জ্বেলে দিল
নাম নাকি তারা
আমার মাটির ঘরে
মাটির প্রদীপ জ্বলে
হয়ে যায় হারা।

(৯)

শিকল শিকল কদ্দূর?
বহুদ্দূর
কার বিয়া?
হাসির বিয়া
কি বাজায়ে?
ঢুম বাজায়ে
ঢুম ঢুমা-ঢুম ঢুম।

(১০)

ধানের ক্ষেতে পোকানী
সন্ধে হলে ঝিঁঝি

www.pathagar.com

জোনাই মোনাই যত
প্রজাপতি ফড়িংটা
লাফায়ে পড়ে আরেকটা
ফুল পরীদের মতো।
(১১)
কচি কচি চেহারা
কচি যখন পাকবে
রাস্তার মানুষ জাগবে
পুলিশ মামা টা-টা
আন্ডার প্যান্ট ফাটা।
টিঁয়ে খায় দুধ ভাত
দুধ হলো কাঁচা
টিয়ে ধরে নাচা।
(১২)
ব্যাঙের পাছের ঠ্যাং
কুকুরের ঘ্যাং
দেশকে বাঁচায়
নিজে বাঁচে
তাই বলে
কুনো ব্যাঙের না ঠ্যাং।
(১৩)
ঘুম আয় ঘুম আয়
ঘা মাছির পাতা
আহার পিঠে শুয়ে আছে
নলা মাছের মাথা।
কানছি ঘুমে পড়ছে
কালা কুহুর
ঘরের কোঠায় শুয়ে আছে
বলরাম ঠাকুর।
(১৪)
ও বৌ কি পড়?
আমি মোল্যাদের ঝি
আমি কলেমা পড়ি
দেওয়ান সাফ
তোমার তাতে কি?
(১৫)
পাওলে কি?
কাউয়ার ডিম

www.pathagar.com

ভাঙছে কেডা
আন্না দি
কি হইছে
ছল হইছে
ছলের নাম কি?
গোপাল
ওরে আমার কপাল।

(১৬)

আপ্লুত কই গুগ-গু সই
তালফুত গেছে কোহানে
ঘর বানছে বেহানে
ইঙ্কি ধানের বিঙ্কি খৈ
নন্দের মাথায় দৈ।
পথে এট্টা ক্যাওমাও
ধরে রান্দে খাই
তেল নাই নুন নাই
তেলি বাড়ি যাই
তেলি দিল এক ফোঁটা তেল
তা নেলো সদা
সদারে বিয়ে দেলাম
ভট্ট রাজার দেশে
ইষ্টি কুটুম দেখলি তারা
গুদ ফিরইয়া বসে।

(১৭)

বুচি গেছে নাক ফুটতি
কলৈ ডাঙার মাঠে
সেই খবর শুনে এলাম
জামতলীর হাটে
জাম পাকছে থলি থলি
কাউয়ায় খুঁচিয়া খায়
আষাঢ় মাসে খাজনা দিতে
পরান ফাটিয়া যায়।

(১৮)

আইড্ডু মাইড্ডু কালিয়া জিরা
লক্ষণ গেলো ঠ্যাঙা নৈয়া
সেই ঠ্যাঙা খান ভাঙা
চারটি কড়ি রাঙা
বৌ-গাতোলো ঝি-গাতোলা
কুলু কুলু কুলু কুলু।[৭]

www.pathagar.com

ঙ. গৎ

প্রবাদ-প্রবচনে বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয় ঘটে থাকে। কিন্তু গৎ-এ বহুধার তেমন ছড়াছড়ি নেই। আবার ছড়ার মতোও রূপ লাভ করেনি। চমৎকার এর গঠন প্রণালী। ছন্দ মেখে এটি আত্মপ্রকাশ করে। গ্রাম্য কিশোর কিশোরীরা এগুলো আবিষ্কার করে থাকে। এককভাবে কিংবা সমস্বরে খেলার মাধ্যমে তারা এগুলো আবৃত্তি করে যায়। যেমন–

১। ইচিং বিচিং চিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যায়।
২। তাল পাতায় কালি
তুই আমার শালি।
৩। খয়রা মাছ আর তুত্তুরি
দাঁতে নাগে ফুরফুরি।
৪। উস্তো কাটি চাক চাক
জামাই আসে ঝাঁক ঝাঁক।
৫। আয় বিষ্টি ঝেপে, ধান দেবো মেপে
যা বিষ্টি ঝরে যা কচুর পাতায় কর্মচা।
৬। ছিঃ ছিঃ ছিঃ মচ্ছির বীচি
তোর কপালে আগুন দিছি।
৭। কলা গাছে বৈঁচি
বৌ নিতে আইছি।
৮। কলার পাতায় দই
তুই আমার সই।
৯। হাড়ির ভিতর চুচড়া
তুই আমার পুতরা।
১০। ছিঃ ছিঃ ছিঃ বোয়েম ভরা ঘি
আসমারে বিয়া দেবো দোতলা বাড়ি।
১১। শরৎ কালের দিন নাইরে নাথু
খাবলে খাবলে খাবা ছাতু।
১২। হনু গেছে বরই গাছে
হনুরে ধর মাঝে।
১৩। রানি গেছে পানি খাঁতি
বগায় দেছে ঠোক
রানি আমার কি দোষ।
১৪। ময়নার কাল বিয়া
জয়নার চাল দিয়া
আনাজ নাই পাতি নাই
কিসের এ্যাট্টা বিয়া।

www.pathagar.com

১৫। তা তা তা মোয়া কিনে খা
মোয়া নেলো শিয়ালে
কি খাবানে বিয়ালে।
১৬। ঐ ঐ ঐ কাঁচি পাতা দই
কি দই দিয়া খাব দাদা
মট্টাস কলই।
১৭। এক দেশে এক রাজা
রাজার নাই ঠ্যাং
কুরুৎ ঢ্যাং ঢ্যাঙা ঢ্যাং ঢ্যাং।
১৮। ও বৌ মা ওঠো
কৈ মাছ কোটো।
১৯। ফটিক ফটিক দয়াকলা
ফটিক নাচে বেহান বেলা
ফটিকের বউ গিন্নি
ফ়টিক বিলয় শিন্নি।
২০।ফটিক ফটিক দয়াকলা
ফটিক নাচে বেহান বেলা
ওলো ফটিক ভাই
তোর কপালে বিয়া নাই।[৮]

তথ্যনির্দেশ

১ বিভূতিভূষণ বিশ্বাস অব. মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, বয়স-৭৫, গ্রাম : তালতলা, উপজেলা : কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
২. আলহাজ্ব মো. জয়েনউদ্দীন, আলীমউদ্দীনের প্রপৌত্র, গ্রাম : চিত্রাপাড়া, কোটালীপাড়া।
৩. স্বপন কুমার বিশ্বাস, বয়স ৫২।
৪. জালাল মোল্লা, প্রভাষক : পূর্ব-উত্তর কোটালীপাড়া, ফাজিল মাদ্রাসা, গ্রাম : মধুর নাগরা, কোটালীপাড়া।
৫. নির্মলেন্দু সরকার, বয়স ৫৯, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : ঘৃতকান্দী, কাশিয়ানী।
৬. বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস, বয়স-৬৩, অব. প্রধান শিক্ষক, নড়াইল, কাশিয়ানী।
৭. প্রমথ রঞ্জন সরকার, মাখনলাল, নিরাপদ বিশ্বাস, সুধাংশু ভৌমিক, গ্রাম : বিদ্যাধর, উপজেলা : কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
৮. গৌরাঙ্গ দাস (৬০), গ্রাম : কংশুর, গোপালগঞ্জ।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি
লোকশিল্প

১. পৌষ সংক্রান্তির আলপনা

মেয়েলি এই চিত্রকলাটি দেখলে নয়ন জুড়ায়। পৌষ সংক্রান্তির দিনে তাদের সেই আলপনা দেখলে বোঝা যায় চিত্রাঙ্কনে তারা কতো পারদর্শী। বিভিন্ন রঙের মাটি গুলে ঘরের ডোহা, ঘরের দরজা ও উঠানে দক্ষ হাতে তারা ফুটিয়ে তোলে রকমারি বৈচিত্র্যময় চিত্র। ফুল, ফল, মাছ, নদী, পশু-পাখি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য যে যার মতো করে ফুটিয়ে তুলতে প্রতিযোগিতায় নামে। এতে দরকার হয় না কোনো তুলির। যা দ্বারা নারীরা ঘর লেপে তাকে পোচ বলে। সেই পোচ হাতে নিয়ে প্রদর্শন করে তাদের কর্মক্ষমতা। পৌষ সংক্রান্তির এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রীহীন বাড়িগুলোকেও শ্রীধর করে তোলে। বাড়ির দৈন্য দশা একেবারে হারিয়ে যায়। এ রকম করার কারণ ও তাৎপর্য জানতে চাইলে তেমন একজন নারী রেণুকা বিশ্বাস যা বললেন-'পৌষ সারান মানে বাস্তু পূজা। বাড়িঘরে আমরা থায়ি। ঝড় বিষ্টির দিনে ঘর আমাদের রক্ষা করে। তাকে কি পূজা না কল্লে হয়। তাই বসত ভিটাকে ভালোবাসতি আমরা এত কিছু করি। এ কল্লে বাড়ি আনন্দ পায়।' আগের থেকে এটি তুলনামূলকভাবে কমে গেলেও কোনো কোনো অঞ্চলে বরং আগের থেকে যেন ভালোই হচ্ছে। যেমন : হাটবাড়িয়া, কৃষ্ণপুর, করপাড়া, আড়ুয়াকংশুর, পদ্মবিলা তারমধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে।

২. লক্ষ্মীপূজার আলপনা

লক্ষ্মীপূজার আলপনা আরও যে কতো মনোমুগ্ধকর তা কেবল একপলক দেখার মাধ্যমে বুঝতে পারা যায়। তবে একটু দেখলে চোখের তৃষ্ণা মিটবে না। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে। এই আলপনায় নারীরা মাটি ব্যবহার করে না। এমনকি ঘর লেপা পোচও না।। যেহেতু আলপনাটি লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে সেহেতু চালের গুড়া গুলে দুই হাত মুষ্টি করে ওই গুড়া লাগিয়ে একবার ডান মুষ্টির ছাপ, আরেকবার বাম মুষ্টির ছাপ–এভাবে ডোহার উপর দিয়ে আলপনাটি নিয়ে যায় লক্ষ্মীপূজার আসন পর্যন্ত। উঠান থেকেও এই আলপনা শুরু হতে দেখা যায়। গুড়াযুক্ত মুষ্টির সামনে ৫টি ফোটা দেওয়া হয়। দেখলে অবিকল মনে হবে একটি শিশু গুটি পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘরে ঢুকছে। অলোকা বিশ্বাস (৩৮), গোপালগঞ্জ, লক্ষ্মীপূজারিণী এই নারীকে এ বিষয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করলে তিনি যা বলেন– 'আমরা কৃষিকর্ম করি, গলা ভরে ধান থুই। সারা বছর চলি ফসলের উপর ভর করে। ফসলই আমাদের মুখে হাসি ফোটায়। মা লক্ষ্মীর কৃপায় আমরা ছেলেপিলে নিয়ে বেঁচে থাকে। তাই আমরা মা লক্ষ্মীকে এভাবে বরণ করে তাকে খুশি করি।' এই লক্ষ্মীপূজায় তারা গানও গেয়ে থাকে। যেমন–

www.pathagar.com

এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে
আমার এ ঘরে থাকো আলো করে।
শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি
সুগন্ধে ধূপ জ্বেলে আসন পেতেছি
প্রদীপ জ্বেলে নিলাম তোমায় বরণ করে।
আলপনা এঁকে তোমার সাজিয়ে দিলাম ঘর
আমের পল্লব দিলাম জল ভরা ঘট
পান সুপারী দিলাম দু'হাত ভরে
জনম জনম থাকো আমার এ ঘরে
এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে
আমার এ ঘরে থাকো আলো করে।

তাই দেখা যায় হিন্দু বাড়িগুলোতে লক্ষ্মীপূজার দিনে চারদিকে আনন্দের ধুম পড়ে যায়।

৩. সাজের হাড়ি

সাজের হাড়ির আলপনা কেবল বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য। কনেকে যখন সাজিয়ে স্বামীর হাত ধরিয়ে স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তখন ঐ বহরে একটি চোখ ধাঁধানো হাড়িও জায়গা করে নেয়। হাড়িটিকে আগে খড়ি মাটির লেপ দিয়ে সাদা করে নিতে হয়। তারপর চিত্র শিল্পীরা বিভিন্ন রং দিয়ে এমন সুন্দর আলপনা করে যে হাড়ি আর হাড়ি থাকে না। ওই বহরে বর-কনের পরই এর গুরুত্ব থাকে। একে বলে সাজের হাড়ি। হাড়িটির গায়ে বিভিন্ন ধরনের ছন্দও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন-

দাদাবাবু কমলা লেবু
একা খাইও না
আমার দিদি ছোট্ট মানুষ
কিচ্ছু বোঝে না।

হাড়িতে থাকে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি দ্রব্য যেমন লাড়ু, চিড়া, মুড়ি, সাজ, বাতাসা ইত্যাদি। সাধারণত দেখা যায় ঐ বহরের দুষ্ট লোকেরা হাড়িটি বহন করার জন্য টানা হেচড়া শুরু করে দেয়। কারণ কাগজে মোড়া ঢাকনা ছিড়ে তারা চুপি চুপি খায় আর হাঁটে। এমনও দেখা গেছে গন্তব্যে পৌছানোর আগেই হাড়ির পেট খালি।

৪. নকশিকাঁথা

কাঁথা শিল্পে এখানকার কুলবধূরা অনেক দূর এগিয়ে আছে। আজও কৃষক পরিবারগুলোতে প্রসাধনী দ্রব্যের খুব কদর। যদিও বাবুয়ানির ফাঁক-ফোকড় দিয়ে কিছু আধুনিকতা ঢুকে পড়েছে। গোপালগঞ্জের কাঁথার বিশেষত্ব হলো ঘন ও চিকন ফোঁড়ের গাঁথুনী। রঙিন সুতা দিয়ে যে দক্ষতা তারা ফুটিয়ে তোলে তা আসাধারণই বলতে হবে। এই দক্ষ বুননকে আঞ্চলিক ভাষায় চেলা বলে। দুই ধরনের কাঁথা এরা তৈরি করে থাকে। একটি আট পৌরে কাঁথা যা সবসময় তারা ব্যবহার করে। অন্যপ্রকার হলো নকশিকাঁথা।

www.pathagar.com

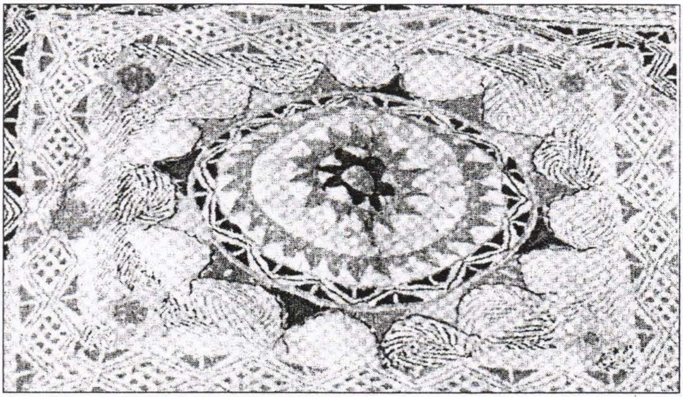

নকশিকাঁথা

নকশিকাঁথা সেলাই

এগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা হয়। নিজেরা এগুলো ব্যবহার করে না। কোনো অনুষ্ঠানে কিংবা মেহমানদারিতে এগুলো বিছায়ে দিয়ে নারীরা সীমাহীন আনন্দ পায়। নিজেদের গুণ গৌরব ও দক্ষতা এই কাঁথার মাধ্যমেই তারা বেশি প্রকাশ করতে আগ্রহী। তারা ছোট ছোট একধরনের কাঁথা সেলাই করে যা বালশির কাথা বলে চিহ্নিত। দেব দেবীর আসনও তারা সেলাই করে। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার আড়কংশুর গ্রামের দুলুরাণী পাণ্ডে (৪৫) নকশিকাঁথা শিল্পে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। বাণিজ্যিকভাবেও তিনি এই শিল্পকর্মটি করে যাচ্ছেন। তাছাড়া একই উপজেলার সাতপাড় নিবাসী ঝর্ণা কীর্ত্তনীয় (৪২) বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন নকশিকাঁথা সেলাইয়ে।

www.pathagar.com

৫. শিকা

কুটির শিল্পে শিকার তুলনা হয় না। গ্রাম্য পরিবারগুলোতে এককালে শিকার খুব কদর ছিল। মিটসেফ, শোকেচ এসে সেই কৃষ্টিকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। সবধরনের তৈজসপত্র শিকায় শোভা করে না। ম াটির হাড়ি সবচেয়ে বেশি শোভনীয়। তাও আবার খালি হাড়ি নয়। থাকা চাই চিড়া, খই, লাড়ু এধরনের ঐতিহ্য নন্দিত খাবার। আধুনিক মেয়েরা অনেকে শিকা বানানোর কৌশল জানে না। বেশ কিছু ঘরে পুরাতন শিকা দেখা গেছে।

৬. রুমাল

নকশি করা রুমাল আজও আগের মতো বুনন হয়। বাঁশের ফ্রেমে রুমাল গেঁথে মেয়েরা নানা ধরনের চিত্র ফুটিয়ে তোলে। গাছের পাতা, ফুল, টিয়া পাখি তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য। যে সুতা দিয়ে এই শিল্পকর্মটি করে তাকে বলা হয় ড্যাঙ্গের সুতা। অনেকে প্রিয়জনকে এই রুমাল উপহার দিয়ে থাকেন।

৭. মৃৎ শিল্প

ধাতব শিল্প ও প্লাস্টিক শিল্প মৃৎ শিল্পকে কোণঠাসা করে রাখলেও একেবারে বিসর্জন দিতে পারেনি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য তৈজস পাত্রের মধ্যে মৃৎ পাত্র যতটা চোখে পড়ে তা মোটামুটি মন্দ না। যেমন, কোলা, তাগারি, ছাবনা, বালিয়ান, জ্বালা, খোরা, হাড়ি, কুনো ও ঘট। বিভিন্ন পার্বণের আড়ংয়ে কুমরেরা যা কিছু উপস্থাপন করে তাও নেহাৎ কম না। যেমন–গরু, ঘোড়া, হাতি, মাছ, ব্যাংক, আম, কাঁঠাল, তরমুজ, বাঙ্গি এসকল মৃৎ নির্মিত দ্রব্যসামগ্রীতে বাজার এখনও সরগরম থাকে। কোটালীপাড়া উপজেলার হিরন, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বাজুনিয়া ও খেলনা গ্রামগুলো মৃৎ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। তারপর পূজা অর্চনায় সে সকল দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করা হয় তা মৃৎ শিল্পের ভীতকে শক্তিশালী করেছে বলে মনে করা যেতে পারে। সদর উপজেলার বড় ডোমরাশুরের শিল্পীরা মাটির মূর্তি নির্মাণে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। দূর-দূরান্ত থেকে দর্শকরা ছুটে আসে এদের শিল্পকর্ম উপভোগ করতে। মৃৎ শিল্পে গোপালগঞ্জ জেলার সুনাম কোথাও কমতি নেই।

৮. দারুশিল্প

সম্প্রতি দারুশিল্পে দারুশিল্পীরা যেভাবে সূক্ষ্ম কারুকার্য ফুটিয়ে তুলছেন সেটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোটালীপাড়ার কালিকাবাড়ি গ্রামের বাদল পাণ্ডের (২২) শিল্পকর্ম অতি চমৎকার। বৃক্ষের কাণ্ডে তিনি সিদ্ধহস্তে খোদাই করে যেকোনো প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তুলতে বলতে গেলে তুলনাহীন। সদর উপজেলার ডেমাকইড় নিবাসী গয়ালী বিশ্বাস (৭০), গান্ধিয়াশুর নিবাসী অনিল ভাস্কর (৬৮) ও রাউৎপাড়ার মন্টু মন্ডল (৪৩) শিবাসন বা পাটবান নির্মাণে অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছেন। এলাকাবাসী তাদের এই শিল্প কর্মের জন্য গর্ববোধ করে।

www.pathagar.com

তারপর বাঁশ ও বেতস শিল্পে বৌলতলীর নিখিল বিশ্বাস ও কংশুরের শংকর বিশ্বাস খুব সুনাম কুড়িয়েছেন। ধামা, পৈয়া, সের-পাল্লা, কুলা, ডোল, চালন, খালুই, ডালা তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের লোক কমবেশি বসবাস করে।

৯. ধাতব শিল্প

মুকসুদপুর উপজেলার জালিরপাড় বাজারটি ইমিটেশন শিল্পের জন্য বিখ্যাত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাইকারি ইমিটেশন ব্যবসায়ীরা এখান থেকে মালামাল আমদানি করে থাকে। এখানে আংটি, রিং, বয়লা, বেইজ, তাবিজ, চেইন এসব অলংকার তৈরি করতে দেখা যায়, তবে আগের থেকে বর্তমানে ব্যবসা কম। বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের কসমেটিক্স আমদানি হওয়ার দরুন ব্যবসায় অনেকটা ভাটা পড়েছে।

সব মিলিয়ে বলা যায় এই এলাকাটি চিত্রকলায় যথেষ্ট অগ্রসর। কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে জেলার পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও অনেক পরিবার আছে যারা এই চিত্রকলাকে বাঁচা-বাড়ার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে।

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

ধুতি, পাজামা, পাঞ্জাবি, শাড়ি, লুঙ্গি, শায়া, ব্লাউজ, সালোয়ার, কামিজ ও প্যান্ট, শার্ট দেশবাসীর সাধারণ পোশাক। এসবের মাঝেও অঞ্চল ভেদে কিংবা পেশাদারিত্ব ও জীবনাদর্শের ভিত্তিতে কিছু ব্যতিক্রমী পোশাক দেখতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলটিও এর ব্যতিক্রম নয়। তার কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হলো।

১. ধর্মীয় জীবনাদর্শে আলেম-ওলামাদের পোশাক পাজামা, আলখেল্লা ও টুপি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের এই পোশাক সাদা রঙের হয়ে থাকে। হাতে তজবি ও কাঁধে একটি রুমাল দেখতে পাওয়া যয়। কিন্তু মারফতপন্থিদের পোশাক ভিন্নতর। মাথায় বাবরী চুল, অনেকে দাড়ি গোঁফ রেখে থাকেন। পাজামার পরিবর্তে অনেক মারফতপন্থি লুঙ্গি ব্যবহার করেন। গামছা তাদের নিত্যসঙ্গী। সাধু সন্ন্যাসীরা আদল গায়ে থাকতে পছন্দ করেন। চুল, দাড়ি ও গোঁফ রেখে থাকেন। গলায় ঝুলানো থাকে রুদ্রাক্ষ, তুলসী ও আচিয়ার মালা। কারও কারও বাহুতে রুদ্রাক্ষের বেড়ি দেখতে পাওয়া যায়। গলে গামছা ঝুলতেও দেখা যায়। কোনো কোনো সাধুর মাথায় দেখা যায় লম্বা ও ঝাটালো জট। পদভূষণ তাদের খড়ম। অবশ্য খড়মের ব্যবহার আগের থেকে কম। অনেক সাধু মাছ, মাংস পরিত্যাগ করেছেন। কেউবা শুধু বুধবারে নিরামিশ খান। আবার কেউ খাবার সময় কথা বলেন না। ভক্তরা সাধু বৈষ্ণবদের জন্য সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করে থাকেন। ওড়াকান্দি হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের মতুয়া বলা হয়। তাদের পোশাক প্রায় একই রকম। তবে এই মতাবলম্বী দলনেতাদের হাতে সোয়া হাত পরিমাপের একটি লাঠি দেখতে পাওয়া যায়। একে ছোটা বলা হয়। তাদের মধ্যে অনেকে হাতে ধাতব নির্মিত বয়লা ধারণ করে থাকেন। আবার অনেক সন্ন্যাসী আছেন যারা শুধু ল্যাংটি ব্যবহার করেন। কেউবা একেবারে দিগম্বর। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কিছু সাধু ফকিরদের দেখতে পাওয়া যায় গায়ে শিকল পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অনেক সাধুর কাঁধে ঝোলা স্থান পেয়েছে। শৈব্য ভক্তদের বেশভূষা ভিন্ন। তারা প্রায়ই লাল বা গৈরিক পোশাক ব্যবহার করেন। এবং হাতে থাকে ত্রিশূল। বৈষ্ণব ভক্তরা বেশ স্বতন্ত্র। তারা মাথায় চৈতন্য বা শিখি বা টিক্কি ধারণ করেন। গায়ে জড়িয়ে রাখেন নামাবলি।

২. কৃষকরা কৃষি কাজের জন্য ঢিলেঢালা অতি সাধারণ পোশাক ব্যবহার করে। গামছা তাদের প্রিয় পোশাক। হাল চালাতে গামছা, ধান কাটতে গামছা, বোঝা বইতে গামছা, স্নান করতে গামছা, খাবার শেষে হাত মুছতে গামছা, দৈ পাতাতে গামছা, গরমে বাতাস করতে গামছা। গামছা কৃষক পরিবারে নিত্য দিনে হরেক কাজের একটি প্রয়োজনীয় পোশাক। পুরুষের শরীর ডিঙায়েও নারীর কোমল অঙ্গ গামছা স্থান করে নিয়েছে। তারা ভিজা চুলের জল নিষ্কাশনে গামছা মুড়িয়ে রাখে। যুবতীদের বক্ষপরেও ওড়না হিসেবে গামছাকে ঠাঁই পেতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

৩. এখানে আছে বিভিন্ন ধরনের গানের দল। যেমন–রামায়ণ, পদাবলি কীর্তন, নামযজ্ঞ, রামযাত্রা, হরিযাত্রা, গুরুযাত্রা ও সাগরভাসা যাত্রার দল। প্রত্যেক দলে এক এক ধরনের পোশাক দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত লাল, হলুদ ও গৈরিক রঙের পোশাক তারা ব্যবহার করে থাকেন। এটা নির্ভর করে দলনেতার পছন্দ-অপছন্দের উপর।

হিন্দু ধর্মে পিতা-মাতা কিংবা তৎসমতুল্য কেউ পরলোক গমন করলে তার পুত্র সন্তানেরা পরলোকগত ব্যক্তির মঙ্গল কামনার্থে একটি ব্রত পালন করে। নাম গুরুদশা। এই গুরুদশা পালন করতে তারা এক ধরনের পোশাক ব্যবহার করে। বিশেষ করে দশদিন তাদেরকে সাদা থান কাপড় বা ধুতি পরিধান করতে হয়। স্নান করার সময়ও সে পোশাক বদলানো যাবে না। সিক্ত বসন গায়ের তাপে শুকিয়ে নিতে হয়। গলায় ঝুলানো থাকে ঐ পরিধেয় বস্ত্রের কাপড়ের পাড় দ্বারা তৈরি দড়ির মতো বস্তু। এটির নাম ধড়া। তাতে ঝুলানো থাকবে তাবিজ বা লোহা নির্মিত কোনো বস্তু। কেশ বিন্যাস করা যাবে না। মাছ-মাংস পরিহার করতে হবে। স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। অন্ন গ্রহণ না করে ফলমুল খেয়ে ওই দশদিন অতিবাহিত করার পৌরাণিক প্রথা এখনও বয়ে চলেছে।

ছোট শিশুদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় হরকাঠি। আঞ্চলিক ভাষায় একে হক্কার কাঠি বলে। তারপর শিশুদের কপালে বড় একটি কালির ফোটা মায়েরা দিয়ে থাকে। এতে কারুর কোপদৃষ্টি লাগবে না বলে বুড়া বুড়িরা বলে গেছেন।

দেখা যায় অভিজাত পরিবারের সন্তানেরা হাতে একটি ছড়ি ব্যবহার করে। এটি তারা আভিজাত্যের নমুনা বলে জানে। কবিরাজদের পোশাকেও অনেকটা ভিন্নতা আছে। কাঁধে ঝোলা, হাতে ধাতব বয়লা, মাথায় চুল, গলায় মালা। ঝোলায় থাকে হরেক রকমের গাছ-গাছড়া, জীব জন্তুর কঙ্কাল বা অস্থি। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার নারিকেল বাড়ি গ্রামে ধীরেন কবিরাজ ছিলেন খুবই বিখ্যাত। বার্ধক্য শরীরেও গাছ-গাছড়ার বড় এক বোঝা সবসময় কাঁধে ঝুলিয়ে কবিরাজি ব্যবসা করতেন।

ফেরিওয়ালাদের পোশাক চমকপ্রদ। রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়ে বানিয়ে নেয় পোশাক। পুরাদস্তুর জোকার সেজে নেমে পড়ে বাণিজ্যে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এটি ফেরিয়ালাদের সহজাত প্রবৃত্তি। ভিক্ষুকদের পোশাক সবচেয়ে জীর্ণ শীর্ণ। মলিন দেহে ওই শীর্ণ পোশাক তাদেরকে একেবারে দৈন্য বানিয়ে দেয়। অনেক ভিক্ষুক ইচ্ছে করে কাঙাল বেশ ধারণ করে থাকে।

শবযাত্রীদের বিশেষ করে হিন্দু শবযাত্রীদের পোশাক ভিন্ন। প্রত্যেকে গামছা পরা। একেবারে সাধারণ পোশাক বা আগলা গা। মাথায় থাকে গামছা বাধা। হরি হরি বল, হরি বল–এই ধ্বনি উচ্চারণ করে তারা চিতায় শব অবস্থান করায়। তারপর দাউদাউ আগুনে শবদাহ করে আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গান গায়। যেমন :

(১)

আমার বিয়ার যাত্রী যারা
তারা সবে গামছা পরা

www.pathagar.com

(২)
নৌকা ডুবল বালু চরে রে
ওরে আমার সাধের নৌকা রে

৪. মেয়েলি পোশাকের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায় বোরখা ব্যবহার করে থাকে। তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব আবৃত করে রাখার এটি একটি ধর্মীয় রীতি। বর্তমান থেকে অতীতে এটির ব্যবহার ছিল বহুল প্রচলিত। 'গোপালগঞ্জ শহরের ইতিকথা' গ্রন্থে আবুল হোসেন ভূঁইয়া সেকালের গোপালগঞ্জের মুসলমান জীবনের একটি পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে উল্লেখ করেন–'সে যুগে সকল মুসলিম মহিলা বোরখা পরিহিত অবস্থায় রাস্তাঘাট বা অন্যত্র চলাফেরা করতেন। বর্তমান প্রজন্মের কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হলেও সেকালে বিত্তহীন পরিবারের ধর্মভীরু মহিলারা পর্দা প্রথাকে বজায় রাখার জন্য লুঙ্গির একপ্রান্তে গিট দিয়ে ওটা বোরখা হিসেবে ব্যবহার করতো। এতে তাদের কোনো লজ্জাবোধ বা লেশমাত্র বিড়ম্বনা ছিল না, বরং ধর্মীয় বিধান মানাটাই ছিল তাদের কাছে মুখ্য।'

নারীরা সাধারণত সৌন্দর্য বিলাসী। অঙ্গাভারণে বাহারী বেশ ভূষায় সর্বযুগে তা ফুটে উঠেছে। চুলে চুলকাঁটা, কপালে টিপ, কানে দুল, নাকে নাকচাপা, গলায় হার, বুকে ওড়না, হাতে চুড়ি, আঙ্গুলে অঙ্গরী, কোমরে কোমর বন্ধ, পায়ে আলতা, নখে কুমকুম ইত্যাদি। কান, নাক এসব অঙ্গ ছেদন করে বিলাসী হওয়ার পিছনে তাৎপর্য আছে। নিজেদেরকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে পুরুষদের মনাকর্ষণ নারীদের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। এটা মোটেই দোষাকর নয়। প্রকৃতির সৃষ্টিকে বিকাশশীল রাখতে নারীর অন্তরে কামনারূপে বিকশিত হয়।

বিধবা মহিলাদের পোশাক-আশাক ভিন্ন। বিশেষ করে হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রে। তারা শাখা সিঁদুর ব্যবহার করতে পারে না। সিঁদুর সীসার একটি উপধাতু। যা নারীদেরকে কামকেলীতে উৎসাহিত করে। শঙ্খ হতে শাখা তৈরি হয়। শিব কামের দেবতা। এজন্য শিব শঙ্খ প্রিয়। শিবের আশিস লাভ করতে হিন্দু নারীরা শাখা ব্যবহার করে থাকেন। বিধবা অবস্থায় কামনা নিবৃত্তি করার সামাজিক স্বীকৃতি নেই। তাই বিধবাদের ওই দুটি কামোত্তেজক পদার্থ ব্যবহারে বৈধ্যতা নেই। স্বামী গ্রহণ করার পর আবার তারা ওইগুলো ব্যবহার করতে পারবে। শাখা সিঁদুরের গুণাগুণ সম্পর্কে প্রাচীনেরা এই আয়ুর্বেদিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। বস্ত্র ব্যবহারেও বিধবারা পৌরাণিক সংযমী নীতি অনুসরণ করে থাকে। নকশি করা কাপড় তারা ব্যবহার করে না। লাল পাড়ের কাপড়ও না। এক রঙের কাপড় তাদেরকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। সাধারণত সাদা ধুসর গৈরিক এই ধরনের শাড়ি ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

কুঁড়েঘর

এ কথা সত্য যে, লোকপ্রযুক্তির উপর ভর করেই সভ্যতার হাতে খড়ি। প্রস্তর যুগ, অগ্নি যুগ মোট কথা বিজ্ঞান প্রযুক্তির আগে সব যুগই ছিল লোকপ্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। এই জনপদের বাসস্থান, কৃষি উৎপাদন আজও তার নিদর্শন বহন করে চলেছে। বাসস্থানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই এসে যায় বাংলার ঐতিহ্য কুঁড়ে ঘরের কথা। এই কুঁড়ে ঘরের অবকাঠামোগত যে বৈশিষ্ট্য, তা চিন্তা করলে লোকপ্রযুক্তির দক্ষতাকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখার অবকাশ থাকে না। বাঁশ দিয়ে তারা বানিয়ে নেয় দু'টি চাল। এই চালে স্থান পেয়েছে নানা ধরনের কলাকৌশল। তার মধ্যে 'আটন', 'রুয়া', 'পিটকাবারি, ছাটনির চটা, পুস্যিয়া উল্লেখ করা যেতে পারে। নীচে থাকে আটন, তার উপর রুয়া, এবং রুয়ার উপর পিটকাবারি সাজায়ে কাতা দিতে ভালো করে বেঁধে নেওয়া হয় চাল। এই চাল সাধারণ ছন দিয়ে ছাওয়া হয়। চালের নীচের ধার থেকে ছন দ্বারা ছেয়ে নেওয়াকে রাজার বলে। এই রকম আট-দশটি রাজারের সমন্বয়ে গঠিত হয় বাসযোগ্য চাল। তারপর মাটিতে খুঁটি পুঁতে ও পাড় সংযুক্ত করে তার উপরে চাল দু'টিকে পরস্পর হেলান দিয়ে সুকৌশলে তারা তৈরি করে নেয় কুড়ে ঘর। কুড়ে ঘরে বাস করতে খুবই আরামদায়ক। শীতের দিনে গরম আর গরমের দিনে শীতল। এটি ছোনা ঘরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কুঁড়েঘর

www.pathagar.com

লোকসংগীত

১. মুর্শিদিগান

গুরুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে রচিত সুরসাহিত্যই মুর্শিদি নামে পরিচিত। ভক্তিবাদই এই গানের মূল বিষয়বস্তু। মুর্শিদভক্তরা মনে করে গুরুর কৃপায় অজানাকে জানা যায় এবং তিনি আধ্যাত্মিক জগতের পথ প্রদর্শক। তারা গুরুর চরণে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য সবকিছু সপে দেন। গুরুস্তুতি গান মুর্শিদভক্তরা আসর সাজিয়ে গেয়ে থাকেন। প্রেমজুড়ি, করতাল, ঢোল, সারিন্দা, একতারা এসব বাদ্যযন্ত্র এই মুর্শিদগানে ব্যবহার হতে দেখা যায়। একজন মুর্শিদভক্ত জেন্নাত বাউল (৫৪) এই গানের তাৎপর্য এভাবে তুলে ধরলেন—'এই মুর্শিদ গানের মাধ্যমে হৃদয়ে ভক্তি আসে, শ্রদ্ধা আসে। মা-বাবা ও গুরুজনদের নির্দেশিত পথ এ পোড়া মন মেনে নেওয়ার শিক্ষা পায়। আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য, এই আসরে আমরা হিন্দু-মুসলমান সবাই যোগদান করি। জাতি ভেদাভেদ এখানে থাকে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এটি একটি সুন্দর নিদর্শন।' মুর্শিদগানের আয়োজনে ব্যয়বহুল কিছুই নেই। যে যার সাধ্যমতো এই গানের আয়োজন করতে পারেন।

সংগৃহীত মুর্শিদিগান

১.

ব্রহ্ম আদি জ্ঞান না হলে
কি হবে তোর মালা নিয়ে
গুরু ভজন হবে না
তোর স্বভাব না গেলে।
গুরুকে ভজিবি যদি
জপ ওই নাম নিরবধি, দুইজনে মিলে
তোর দুই দেহ এক না হলে
কি লাভ হবে মালা নিলে।
গুরু ভজন কি মুখের কথা
যার অন্তরে আছে গাঁথা
সে জানতে পারে
তোর ব্রহ্ম আদি জ্ঞান হলে
পাবি দেখা মনে হলে।[১]

২.

আহা রে কাঙালের গুরু
কোথায় গিয়া লুকালি
লুকালি, লুকালি রে তুই

www.pathagar.com

দেহ ছাড়িয়া কই লুকালি
আর কোনো দুঃখ থাকে যদি
তাই আমারে দিতে বলি।
নবরঙ্গ ভাব সাগরে
আমায় ক্যান ভাসালি
দেশ ছাড়া বেশ পরাইয়া
জগতের লোক হাসালি।[২]

৩.

দিনে দিনে দিন ফুরাল
সেই দিনের খবর কর না
থাকতে দিন ও ভাই মোমিন
গুরুর চরণ ধর না।
গুরুর বাক্য বীজ রোপণে
ধ্যান করগ্যা রূপের ধ্যানে
দেখতে পাবি বর্তমানে
রূপের ঘরে কি কারখানা।
খুঁটি কর গুরুর চরণ-
মন রশি দিয়া কর বন্ধন
জ্বরা মৃত্যু হবে দমন
কাল শমনের ভয় রবে না।
দেহে আছে ছ'টি পাগল
দিবা নিশি বাধাইছে গোল
ফকির হাজার বলে
আমিনের মন ঠিক হলো না।[৩]

৪.

আমার ভবের খাটনি শেষ হলো না
ধান থুইয়ে তুষ ভারা-ভানা
উপায় কি বল না
গুরু উপায় কি বল না।
অকাঠা মান্দারের তরী
জলের বাড়ি সয় না
আবার কাঁটা খালে খেয়া দিলে
তিন খেয়ার বেশি টেকে না
সাধ ছিল মোর মালামতের
টাকায় তো কুলায় না
আমি ধার করিয়া আনতে পারি
দিতে মনে লয় না।[৪]

www.pathagar.com

৫.

মন তোর ভাবনা কিসে
গুরুর রূপ-ধ্যানে থাক না বসে
খোল তবল বেহালা জুড়ি
বাদ্য কর কি কারণে
দেহের তার সারিন্দা করে
বাজাও বসে রাত্র দিনে।
খাসি বকরি দুম্বকাদি
জবাই কর কি কারণে
দেহের ছয় ষোলো নিয়া
বলি দাও গুরুর শ্রীচরণে।
টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া
মক্কা যাও কি কারণে
পাইতে পার মক্কার ছোয়াব
পড় গুরুর শ্রীচরণে।[৫]

৬.

আমি সদা ডাকি গুরু বলে
কি দুষি হইলাম চরণে
গুরু ডানে তুমি বামে গো তুমি
হৃদয় মাঝে আছ তুমি
তবু মোরে বল দুষি
এ দোষ আমায় গেলো না রে।
মনে বড় সাধো রে ছিল
ওই চরণে হব দাসী
আমি হব দাসি যাব কাশী
এই বাসনা আমার মনে।[৬]

৭.

দয়াল কি দিয়া ভজিব তোমারে
হারে বান্ধব কি দিয়া ভজিব তোমারে।
আমায় দিয়া ভিক্ষার ঝুলি
সকল ধন কাড়িয়া নিলি
আর কোনো ধন নাই রে আমার ভাণ্ডারে
ছিল হরিশ্চন্দ্র রায়
স্ত্রী পুত্র বিক্রি করে গুরুর দক্ষিণায়-
ছিল দাতাকর্ণ সে যে দানেতে ধন্য

www.pathagar.com

পুত্র কেটে মাংস নিয়ে দেয় তারে।
ছিল প্রহ্লাদ ভক্ত
দেহ পরাণ সপে দিল জনমের মতো
নিশি মনের দুঃখে কয়
এ দেহ বাঁচলে কি লাভ হয়
দেহ প্রাণ বিসর্জন করে দেয় তারে।
হাজার তুমি চক্রধারী
কি চক্র শিখাইয়া মোরে করলি দেশান্তরি
আমার দিক বিদিক আর নাই
কোনো শান্তি নাইরে আমার অন্তরে।[৭]

৮.

কি দিয়া ভজিব রে মুর্শিদ তোমারে
দীনহীন কাঙাল আমি এ দাসীরে রেখ মনে।
আমার বাড়ির সবরি কলা পাকতে বসেছে
বনের পাখি মুখ না দিয়া রয়েছে বসে
ও গো আমার ফল যেন বিফল হয় না
মুর্শিদ এ মিনতি চরণে।
বনফুলের গাঁথা মালা হতেছে বাসি
নয়ন জলে তাজা রাখি দয়াল সে ফুল রাশি
পূর্বের ভাণু বসেছে পাটে
হায় রে পলক নাই রে আমার নয়নে।
আঁধার রাতে হৃদ আকাশে মুর্শিদের শশি
একা একা দেখব রে আমি নির্জনে বসি
থাক যদি বদন ঘুরে আমি মুছব আঁখি বসনে।[৮]

৯.

যে যা বলে বলুক রে মন
তাতে কিছু আসে যায় না
মুর্শিদ যেমন যার মন যেমন
জ্ঞান বিহনে মাপা যায় না।
পানি যদি রাখে কেহ রঙিন পাত্রের পরে
পাত্রের রঙের রঙটি তখন ওই পানিতে ধরে-
তেমনি মুর্শিদ ভক্তের ঘরে
সাধক বিনে জানতে পায় না।
দুষি খোঁজে অপরের দোষ জ্ঞানী খোঁজে গুণ
নিজের দোষে নিজেই দুষি শেষে লাগায় আগুন
সে আগুনে পুড়ে মরে

www.pathagar.com

মালিক তখন ফিরে চায় না।
জাহেরী এলেমে হয় না, বাতেনে বিচার
সিনায় এলেম সিনায় সিনায় প্রকাশ পায় যাহার
দুধে ধুইলে পোড়া আঙার
জিন্নাত কয় তার রূপ ভোলে না।[৯]

২. ধুয়াগান

গানের যে অংশটুকুতে দোহাররা পুনঃপুন সুর তোলে, তাকে ধুয়া বলে। গুরুগম্ভীরতা এই গানে প্রায় অনুপস্থিত। বিশেষ একটি চরিত্র অবলম্বন করে এই গান রচিত হয়ে থাকে। সমাজজীবনে ঘটে যাওয়া যেকোনো চরিত্রকে অবলম্বন করে পদকারেরা তা রচনা করে থাকেন। এই গান পরিবেশনে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। হতে পারে তা অনুষ্ঠানগত, আবার কৃষি ক্ষেতে কাজ করার মধ্য দিয়ে; এককভাবে কিংবা দলগতভাবেও। এর চরণে চরণে ঘটনা বর্ণনার কৌশলগত দিকটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে দেখা যায়। এই অঞ্চলটি ধুয়াগানের দিক থেকেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ধুয়াগান রচনায় কংশুরের বিষয়ী মোল্লা, বনগ্রামের গেন্দুফকির, আড়ুয়াকান্দির কালীচরণ মজুমদার সুপরিচিত। এছাড়া আরও অনেক ধুয়াগান আছে যেগুলোর রচয়িতার পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি। জানা অজানা ধুয়াকারদের কিছু ধুয়া এখানে উল্লেখ করা হলো।

নিম্ন বর্ণিত ধুয়া গানটিতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন একজন ধুয়াকার। ১৯৪৫ (১৩৫২ বঙ্গাব্দ) সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ বাংলায় বিমান বিধস্ত হওয়ার ঘটনা নিয়ে রচিত হয় ধুয়াটি। এটি রচনা করেছেন ধুয়াকার ও শ্লোক রচয়িতা কালীচরণ মজুমদার। বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল টেকেরহাটে।

১৩৫২ সালে আষাঢ় মাসে বর্ষাকালে
যে ঘটনা সভাতে জানাই
রাজার দোষে প্রজা নষ্ট
বলতে গেলে হয় অন্যায়
বাঙালিদের কপালের দোষ
অন্যের দোষ দেওয়ার সাধ্য নাই।
ইংরেজরা বুদ্ধির জোরে
শূন্যভরে চলতে পারে
তুচ্ছ করে বাঙালি সমাজ
তারা তুচ্ছ করে চড়ে উচ্চে
চালায় উড়োজাহাজ
বাঙালিদের দেখায়ে যাব
নীচ দিয়ে ছুঁইয়ে যাব গাছ।
সাক্ষী আছে টেকেরহাটে
বলতে গেলে দুঃখ ওঠে
কত লোকে হাট করিতে যায়

www.pathagar.com

ওসে বুধবার দিন রথযাত্রা
যে ঘটনা সেই জায়গায়
কেহ পুত্র লয়ে গেছে হাটে
পাছের দিকে চেয়ে আছে মায়।
পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখি
ফতেপুরের উপর দিয়ে
উড়োজাহাজ পূর্ব দিকে ধায়
দেখতে দেখতে নীচু হয়ে
বাঁধিল তারের গুণায়
হাটখোলার লোক দৌড়াদৌড়ি
পালাইতে জায়গা নাহি পায়।
সে কথা যায় না বলা
জাহাজ পড়ল হাটখোলা
হাটে ভয়ানক হইল ব্যাপার
ওরে হাটখোলাতে ডলন দিয়ে
পড়ে গিয়া নৌকার পর
কত লোক গিয়েছে মারা
বলতে শক্তি নাই আমার।
কেহ চাউল কিনতে গেছে হাটে
ছেলে মেয়ে খায় নাই মোটে
ক্ষুধার জ্বালায় পথের দিকে চায়
সেই ক্ষুধা করিতে বারণ
খবর গেলো অসময়
তোমার পিতা গেছে মারা
বিদেশি জাহাজের ডলায়।
কেহ কাঁঠাল কিনতে গেছে হাটে
পাঁচ বছরের ছেলে সাথে
বাড়ি ওঠে কান্দনের রোল
তারা পিতা পুত্র গেছে মারা
শূন্য করে মায়ের কোল
কানতে কানতে পড়ল ধরায়
মুখে না সরে অন্ন বোল।
ছিল তিল, বোঝাই পাট ভরা
বড় নৌকা হলো গুড়া
মহাজনের ছেলে ছিল নায়
শুনে বাড়ির ঘরের নারী
পিড়ার বাড়ি লয় মাথায়

www.pathagar.com

হায়রে আল্লাহ খোদা তাল্লাহ
এ জ্বালায় যাব রে কোথায়।
কুল কামিনী পতির শোকে
কে কাহারে ধরে রাখে
আন্ধার রাতে হাট খোলার দিকে যায়
যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে
গান্ধারী যায় সেই জায়গায়
মরাপুত্র কোলে লয়ে
অজ্ঞানে পড়িল ধরায়।
হস্ত ছেড়া মাথা ভাঙা
ঠিক পায় না পূর্বের চেহারা
কারোর পুত্রের অর্ধঅঙ্গ নাই
ওসে অঙ্গ কোলে লয়ে বলে
আয়রে বাবা প্রাণ জুড়াই
রব না ইংরেজদের দেশে
চল আমরা অন্য দেশে যাই
কেহ ঝাপ দিতে চায় জলে
প্রাণপতি কোথায় গেলে
কেহ ফ্যালে অঙ্গের আভরণ
ওসে বাড়ি রইল হাঁড়ির অন্ন
কথা কয় না কি কারণ
কি ক্ষণেতে এলো হাটে
এ জ্বালায় ছাড়িব জীবন।
আছে মাত্র নিরূপণ
সাহেব মরে বারো জন
বাঙালিদের কে করে গণন
ওসে চরাগাঙ্গে মরা ভাসে
মরায় মরায় বান পড়ে
মরার উপর মরা দেখে
জেতা মানুষ যেতে চায় মরে।
চারিদিকে পড়ল সাড়া
গভর্মেন্টের লোক যারা
মরা মানুষ কান্ধে করে নেয়
ওসে এক কুপেতে সাত-আটজন
রাস্তার পাশে গেড়ে দেয়
শকুন কুকুর নৃত্য করে
এসেছি মরারই মেলায়।

www.pathagar.com

চারিদিকে পুরুষ নারী
দেখতে এলো সারি সারি
তারা তিলেক না দাঁড়াইতে পারে
নাকে আসে মরার ঘ্রাণ
কালী চরণ কেন্দে বলে
এই ছিল বিধাতার বিধান।[১০]

আমাদের দেশে পাট একটি অর্থকরী ফসল। এক সময় এই পাট বিদেশে রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হতো। এজন্য এর নাম হয়েছে সোনালী আঁশ। এই পাটকে নিয়েও গ্রাম বাংলায় রচিত হয়েছে অনেক লোকগাঁথা। অজ্ঞাত এক পদকারের পাটকে নিয়ে রচিত একটি ধুয়ার কিয়দংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে :

ও পাট একদিন কাটি তিন দিন বৈ
তাতে শরীর ব্যাথা মাজা কটকট করে
আবার জিলিক দেয় মাজায়।
ধরলো দিদি ধর
আমার কোলের ছেলে ধর
এবার কোস্টায় হবে বিষম দর
পতি মোরে দিবে অলঙ্কার
দিবে মাজার গোট গলার হার
বেড়াব পাড়ার উপর দিয়া[১১]

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বনগ্রামে অনেক আগের একটি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল জনপ্রিয় একটি ধুয়া গান। হাটে মাঠে বাটে সবার মুখে শোনা যেত সেই ধুয়াটি। গেন্দু ফকির নামে এক বিজ্ঞ বয়াতি ধুয়াটি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত অনেক ধুয়াগান সংরক্ষণে নেই। কদাচিৎ প্রাচীন দু'একজন লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায় তার দু'একটি ধুয়াগান। তাঁর জনপ্রিয় ধুয়াটি এরকম—

ঘোর কলিকাল এলো চলে ১৩৩৭ সন
কলির কথা করে যাই বয়ান
বঙ্গদেশে আছেন যত হিন্দু আরও মুসলমান
ঘোর কলির কীর্তি দেখে
জ্ঞান থাকতে হলাম অজ্ঞান।
এই হলো ভাই শেষ কলি
আমি তাই সভায় যাই বলি
কলিতে দয়া ধর্ম নাই
এবার বনগ্রামের বছিরউদ্দিন
ছদন শেখের ছোট ভাই
মাঘ মাসের পাঁচ তারিখে
কাল হলো তার চাচাতো ভাই

www.pathagar.com

ও তার চাচাতো ভাই না'র মাঝি
সে বেটা আসল পাজি
জন দশ বারো জন ষন্ডা জুটে লয়
তিন খান নৌকার চালান ঘরে
ষন্ডাকে বুঝায়ে কয়
কোনো ফিকিরে যাবে মারা
সে কথা বলে দাও আমায়।
সোমবার দিন দুপুর বেলা
বৌলতলীর হাটখোলা
হাট করিতে বছিরউদ্দিন যায়
ওরে হাট বেসাতি কৈরা মিঞা
বাড়ি এলেন ঘোর সন্ধ্যায়
না'র ভাগি খাওয়াবার ইচ্ছা
ধান ভানতে পাকের ঘরে যায়,
মুলিয়া বলে মেঝে ভাই
তাকি তোমার মনে নাই
কাল সকালে খুলতে হবে নাও
ওরে হোসেন মিঞার দলিল হবে
জলদি করে হাটিয়া দাও।
পোড়ুয়া টাকার দলিল হবে
না গেলে টাকা দেবে ক্যান
বছির উদ্দিন মহাজন
জ্ঞান বুদ্ধি ছিল কম
সাদা মনে মুলিয়ার সাথে যায়
ও তার ঘরের স্ত্রীর বুদ্ধি ভারি
বাতি একটা নিতে কয়
মুলিয়া বলে আমি থাকতে
বাতি লাগবে কোন জায়গায়।
মিঞা হেঁটে দিল মুলিয়ার সাথে
পথ থুইয়া নেয় কুপথে
কুপথে নৈয়া চলে যায়
বাড়ির উত্তর দিক দিয়া নামে মিঞা
পশ্চিম দিক দিয়া হেঁটে যায়
অজেদ মোল্লার ভূঁইতে যাইয়া

www.pathagar.com

মুলিয়া তার হাতের লাঠি নেয়।
কেন্দে কয় বছিরউদ্দিন
ভাড়ি কে দিল এই কুবুদ্ধি
তুইরি ছিলি আমার জোড়ের ভাই
আমারে মারিসনে ভাই
দুনিয়াতে আর কেহ নাই
তিন খান নৌকার চালান ঘরে
চল বাড়ি তোরে দিয়া যাই।
অ্যাহেতো পুতের জ্বালা
আরও ধল্লি চাইপা গলা
তোগে আর দয়া মায়া নাই।
আমার হাতেমেরে শিশু ছেলে
দুনিয়ার পরে আর কেহ নাই
আহারে সুরতে নাম তাহার
এ দেহের আফসোস রল ভাই।
যেমন সীমার বসে বুকের পরে
বছিরউদ্দিন ওই প্রকারে
খরদরজাল হইলেন উদয়
মিঞার দম বাহির হইয়া গেলো।
জন চারিকে ঘাড়ে লয়
জুটে ফন্দি পশ্চিম কাঁন্দি
মরা লাশ খাল কূলে ফেলায়
মুলিয়া মাজা থেকে চাবি খুল্যা নেয়
ওরে মাঝিয়া ভাই আসবে না বাড়ি
ভাবিসাবকে ডেকে কয়।
তিন খান নৌকার চালান ঘরে
এদেশে চোর ডাকাতের ভয়
আমারে দেছে কইয়্যা
সিন্দুকের পর থাকগ্যা শুইয়া
ওরা যেন অন্য ঘরে রয়
ওরে শুনে কথা মর্মের ব্যথা
বিটির মনে সন্দো হয়
ঘর থুইয়্যা থাকবো ক্যানরে
বিশ্বাসঘাতক মাগিয়া বুঝ বুঝয়।

www.pathagar.com

আমরা থাকবো খাটালে
বাতিটা রাখব জ্বেলে
আমাগে রাত্রে করে ভয়
রাগ হইয়া কয় মুলিয়া
তুমি বড় অজ্ঞান
শলোক ঘরে ঘুম আসে না
রাগ হইয়া বাতি নিভাইয়া দেয়।
ঘর হলো অন্ধকার
মুলিয়া ছিল সিন্দুক পর
চাবি দিয়া সিন্দুক খুল্যা নেয়
ঝনর ঝনর শব্দ হলো
কালার মা তাই শুনতে পেল
কিসের শব্দ শোনা গেলো
মুলিয়া কয় বিলৈ ফাল দিয়া যায়।
টাকার তোড়া গেলো নৈয়া
নোটা নৈয়া আস্তে আস্তে যায়
কালার মা'র ওই কাঁন্দন দেখে
উঠানে দাঁড়ায়ে রয়।
যোগে যাগে করব সারা
তারা সব ঘরে চলে যায়
এদিক রহিম মোল্লা যায় মাঠে
বছিরউদ্দিন খাল ঘাটে
উবুৎ হয়ে মরা পড়ে রয়
পিচসিটিং মেহের মোল্লা
তানার উপর সখা আল্লাহ
এছাক মোল্লা জজের জুড়ি
ও বেটার মর্গে যাবে লাশ
ওসে খবর পেয়ে লাশ দেখিতে যায়
লাশ হলো পশ্চিম পাড়া
তিনি বড় বাড়ি যান
টাকার ছালা জলদি ফ্যাল
সব টাকা গুণে জমা নেয়।
এক বাড়িতে নয় গোষ্ঠী
কের সাথে নাই কের ইষ্টি
সাপে ব্যাঙে বসত করা দায়
ওরে ঘর্জে জামাই জোর জেহাদা
আসল মানুষ সে বাড়িতে নাই

www.pathagar.com

গেন্দুর ছিল এই বিবরণ
বছিরউদ্দিনের চাপছে গলা
বুকের পর তার চাচতো ভাই।[১২]

পূর্বে পাড়া মহল্লায় কিংবা এলাকায় এলাকায় স্বার্থ ভাগাভাগি নিয়ে প্রায়ই কাজিয়া হতো। বিভিন্ন জায়গায় লাঠিয়াল বাহিনীও ছিল। কাজিয়ার খোলায় যেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হয় তারমধ্যে সড়কি, তীর, ধনুক, কাতরা, ভ্যালা, পাকা বাঁশের সুচালো কুড়া, ও ঢাল উল্লেখযোগ্য। প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে কাশিয়ানী উপজেলায় দেওগাঁ পদ্মবিলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী কাজিয়া সংগঠিত হয়েছিল। সেই কাজিয়ার বিবরণ অত্র এলাকার রজনীকান্ত নামে একজন পদকার যেভাবে তুলে ধরেছিলেন :

সন ১৩৩০ সালে শুন এক নিদান
শনি রাজা কুজ মন্ত্রী দেশের হলো অকল্যাণ
খামাখা এক ঘোর বিবাদে কেউ করে
কের অপমান, কারোর বধিল পরান
উক্ত যুদ্ধ পদ্ম বিলার দক্ষিণে
জুটে সব হিন্দু-মুসলমান।
মাছ ধরা হাঁটুরে গোলমাল বিপদের অঙ্কুর
পশ্চিমেতে বাটইদোয়া পুব সীমানা শ্রীপুর
হবে দুই মাইল কি আড়াই মাইল
কাজিয়ার খোলা এতদূর।
হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধ
দেবতা হলো অসুর, তার ক্ষমতা প্রচুর
উক্ত যুদ্ধ সমরে মহাকাল সাজিল কুকুর।
রাগ ধরে মুসলমান এল হাজার আস্টেক নয়
ওরে দায় ঠেকে সব হিন্দুর ছেলে
আত্মরক্ষা করতে যায়
কাঁন্দে ধর্ম চিন্তায় কুললক্ষ্মী
গোলক নড়ে সেই কান্নায়
আমি শুনেছি সব সাধুর মুখে
যথা ধর্ম তথা জয় এই রণের পরিচয়।
ওড়াকান্দি কত্তার কথা শুন ওরে ভাই
যখনেতে কাজিয়ার বার্তা
পড়ল গিয়া কত্তার ঠাঁই।
কত্তা জোর করে কয়
ধর্ম থাকতে হিন্দুকুলের চিন্তা নাই
লয়ে গোলক তারক মহানন্দ
এই তো আমি রণে যাই

www.pathagar.com

দিয়া শ্রী হরির দোহাই।
আমার রথের সারথী হবেন হরিচাঁদ
আর সেই পাণ্ডবের কানাই।
দেখ এক দেশের এক ছেলেমেয়ে
যেমন তাদের সম্প্রীতি
তোমরা আত্মদ্বন্দ্বে পণ্ড হয়ে
ঘটালে এক বিপরীত
এদিন রজনী কয় শান্তি দিতে
একমাত্র জননীর উচিত।[১৩]

একজন স্ত্রী তার বণিক স্বামীর প্রতি বাণিজ্য পথের সম্ভাব্য বিপদ থেকে সতর্ক থাকতে যে পরামর্শ দিচ্ছেন তা নিয়ে রচিত হয়েছে নিম্নের ধুয়াটি। পল্লিবাসীর দাম্পত্য জীবন দৃঢ় গাঁথুনির উপর প্রতিষ্ঠিত তা পদকার এই রচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ সমাজে নারীদের স্বামীই একমাত্র গতি ও ভবিষ্যৎ। স্বামীর অবর্তমানে নারীদের কি দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হয় সম্ভবত এই কল্পনায় তারা স্বামী পরায়ণা বেশি হয়। বিভিন্ন লোকাচার ও লোকগাথায় দেখা যায় স্বামী ভক্তির কথা ফুটে উঠেছে। অজ্ঞাত এক পদকারের তেমন একটি ধুয়া এখানে উল্লেখ করা হলো–

বারে বারে করি মানা
মাধব না লইও বাণিজ্যের বায়না
লইয়া বায়না না যাইও বাণিজ্যে
ও প্রাণ মাধব রে।
কোদালে কাটিয়া মাটি
কলা রুইলাম সারি সারি
রুইয়া কলা না কাটিলাম পাত।
নায়ে যাবা দাঁড়ি হবা
মাঝির সাথে ভাইল রাখবা
বেভাইল হলে বধিবে পরানে
ও প্রাণ মাধব রে।
পুবেরও বাণিজ্যে যাবা
হীরামন মাণিক্য পাবা
সে-না দেশে দারুণ বাঘের ভয়
ও প্রাণ মাধব রে।
যে কালে করিলে বিয়া
হস্তের পরে হস্ত থুইয়া
আর রাঙা সুতায় করিয়া বন্ধন
ও প্রাণ মাধব রে।
শিশুকালে শিশুমতি

www.pathagar.com

বয়সের কালে মইল্ল পতি
হলো বিয়া না হলো মিলন।[১৪]

শাস্ত্রীয় বিধানে এ যুগকে কলিকাল বলা হয়েছে। অন্যায় অবিচার অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখলে জনগণ তাকে কলির ব্যবহার বলে উল্লেখ করে থাকে। এই কলিকালকে নিয়ে আছে অনেক লোকগাঁথা। বিভিন্ন পরিবারে দেখা যায় শ্বশুর শাশুড়ি পুত্রবধূর কাছ থেকে যথাযোগ্য ব্যবহার পায় না। তারই কিছু নিদর্শন একজন পদকার এভাবে বয়ান করেছেন–

শোনো রে ভাই সকল কলির ব্যবহার
কলির কীর্তি চমৎকার
বৌতে করে মাতব্বরী শাশুড়ির উপর।
কলির বউ সব কল্লাভারি
শাশুড়ির পর করে মাতব্বরী
করে চাতুরী পেলে দোকানদার।
ওসে চন্দ্র সূর্য দেখতে না পারে
সে বো'র হাত ধরে দোকানদার
শাশুড়িতে বউকে যদি
কাজের কথা কয়
ও বৌ মুখ ফুলৈয়া রয়
বলে বুড়ি নাইয়্যাশ্‌শুগি
কি বলবি আমায়।
ও কথা কয় বৌ ঠ্যারে ঠোরে
স্বামী দেখলে ঘোমটা মারে
দেখি একি অবিচার।
আসুক গোলাম ভাড়ুয়া বাড়ি
ভাঙবে নে তোর ঘিটির তেড়ি
তোর কথায় আমার বা পা জ্বলে যায়
আমি থাকি বিলের মাঠে
পরের মাইয়া ঘরের খাঁটে
তাও তুই দেখলি না একবার
ফের যদি আবার বলিস মন্দরে
নাগুল পাবা না আমায়।[১৫]

বর্ণ বৈষম্য ও কুলীন নীচুর প্রভেদ সমাজ থেকে এখনও দূর হয়নি। প্রভাবশালীরা নিরীহদের উপর কারণে-অকারণে বিভিন্ন অজুহাতে খড়গ ধারণ করে। কোটালীপাড়ায়

www.pathagar.com

বলিগা গ্রামে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা তারই এক অনুসর্গ। ঘটনার বর্ণনা এরকম—

১৩৩৭ সালে এ ঘোর কলিকালে
এই নিবেদন সভাতে জানাই
বাওয়ালীদের সদ্য ইষ্টি
যদু-মধু শুনতে পাই
বিধির হাতে কলম ঘোরে
এ দুঃখ কার কাছে জানাই।
বলিগা গ্রাম ধাম সুধন্য বাওয়ালী নাম
ধনে জনে অতি ভাগ্যবান
মধু বদ্যির ছেলের সাথে
ভাই ঝি তাহার করলেন দান
প্রজার হাতে কন্যা দিয়ে
বাওয়ালীর হলো অপমান।
বাওয়ালীদের এই বাসনা
ও ভিটার প্রজা রাখব না
খাজনার কড়ি বকেয়া পড়ে রয়
বৈশাখ মাসের ১৬ তারিখ
আমরা যাব সেই জায়গায়
জোর করে নামায়ে দেবো
দেখি সে কেমন করে রয়।
আর এই ভাবনা ভেবে মনে
টাকা দিয়া সরদার আনে
নিজেরা তার সাথে সাথে যায়
অতি গুপ্তভাবে হেঁটে যায়
অন্য কেহ টের না পায়
নিশি যোগে উদয় হলো
গিয়ে সেই হরিনগর গায়।
রাত্রি যখন প্রভাত হলো
বাড়ি তখন ঘের দিলো
যদু মধু কেঁদে কেঁদে কয়
আজকের দিনটা ক্ষমা কর
শুনহে বাওয়ালী ভাই
প্রাণে নাহি বধ করিও
দোহাই তোমাদের ধর্মের দোহাই।
যেমন অভিমন্যু বধের কালে

www.pathagar.com

সপ্তরথী এক দলে
সবে একজনাকে করিল নিধন
সেই ঘটনা এই সভাতে
আজি করি নিবেদন।
সব বাওয়ালী একত্রে
দুজনাকে ধরিল তখন
টাকার আশে রিপুর বশে
রত্না গুণ্ডার ছেলে এসে
কোঁপ দিল সেই মধু বদ্যির গায়।
কোঁপ দিল নাভিমূলে
জল পিপাসায় প্রাণ যায়
মধু তখন কেঁন্দে বলে
মা আমার রহিলে কোথায়
শ্বশুরের দুর্গতি দেখে
পুত্রবধূ কাঁদে শোকে
জল নিয়ে তার নিকটে যায়
বাওয়ালীরা জোর করে তার
হস্তের জল ঢেলে ফেলায়।
মধু তখন কেঁন্দে বলে
মা আমার নাই কোনো উপায়
মধু তখন বলে মা
আমার জন্য কেঁন্দো না
তোমার স্বামীর জন্য কেঁন্দো মা তুমি
তোমার স্বামীর প্রতি রেখ মতি
অন্তে পাবা জগৎপতি
তোমার গর্ভে জন্ম লয়ে
মা বলে ডাকিব তোমায়।
ভাইজি তখন কেঁন্দে কয়
শুনো জেঠা মহাশয়
আজ আমায় করলে অপমান
চন্দ্র সূর্য সাক্ষী রেখে
জানাই সবার বিদ্যমান
আমার শাপে তোমার বংশের
সকলের হারাবে পরাণ।
এ দীন কালীচরণ কেঁন্দে বলে
জন্মিয়া এই কলিকালে

www.pathagar.com

কোনো শান্তি হলো নারে ভাই
এই ভবনদী দিতে পাড়ি
যেন চরণ তরী পাই
এই বাসনা আমার মনে
আমার আর অন্য আশা নাই।[১৬]

৩. ভাটিয়ালি

ভৌগোলিক তাৎপর্যে ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ বলে সমধিক পরিচিত। বিভিন্ন নদ-নদী এদেশের বক্ষ বিদীর্ণ করে জালিকার মতো ছড়িয়ে আছে। নদীকে নিয়ে রচিত হয়েছে কত গান উপকথা কিংবদন্তি, তার শেষ নেই। ভাটিয়ালি গান মূলত নদীভিত্তিক। ভাটির টানে মাঝি-মাল্লারা মনের মাধুরী মিশায়ে যেসব আবেগঘন গান গেয়ে থাকে তা ভাটিয়ালি নামে পরিচিত। সেরকম কিছু গান উল্লেখ করা হলো–

১.

নদী রে বুক ভরা তোর পানি
কি বুঝবি তুই শূন্য বুকে কি বেদনা নিয়ে কাঁন্দি হায়
দিলাম তোর পানিতে চোখের পানি রে।
নিয়ে ঢেলে দিস মোর বন্ধুর পায়
এ ঘাট হতে প্রথম যেদিন তরী দিলাম খুলে
সেই অবধি কাঁন্দি আমি তোর ওই ভাঙন কূলে
আমি ভুলতে গিয়ে পড়ি ভুলে রে
বসে তোর ওই কিনারায়।
ওপারেতে বাঁশের মাথে চাঁদ ডুবে উঠল ওই
আমার যে চাঁদ ডুবে গেলো সে আর উঠল কই
আমার মনের কথা কার কাছে কই রে
বসে রজনী পোহাই।
আনমনা সে চলবে যেদিন তোর কূলে পা ফেলে
তুফান হয়ে চোখের পানি দিস তার পায়ে ঢেলে
আমার মনের কথা বলিস তারে রে
আমি আজও আছি তার আশায়।
অনাদী কয় নদী মরলে রেখে যায় তার নালা
প্রিয়জন ছাড়িয়া গেলে দিয়ে যায় তার জ্বালা
চলছে বিশ্বভরে এমনি খেলা রে
কোন খেলোয়াড় খেলে যায়।[১৭]

২.

ওরে আমার জীবন নদীর নাইয়া রে
কবে আমার তীরে ভিড়াবে নাও ধীরে ধীরে বাইয়া রে
বের হয়েছি সেই না ভোরে ধরণীর ধূলে
খেলা পেয়ে বেলা গেছে রে দয়াল তোমাকে ভুলে

www.pathagar.com

এখন সন্ধ্যাবেলায় পারঘাটাতে কাঁন্দিগো দাঁড়াইয়া রে।
ষোলো আনা তবিল পায়ে করেছি কারবার
জমা শূন্য খরচ বেশি বান্ধব হতেছে বার বার
আমার হিসাবের কিছু নাইরে সারবার
আমি দিয়াছি বিলাইয়া রে।
সাথী যারা গেছে তারা আমায় ফেলিয়া
একা শুধু বসে আছি বান্ধব তোমার ভুলিয়া
পাগল বিজয় বলে কাঙাল বলে
আমায় দিও না ফিরাইয়া রে।[১৮]

৩.

আমার দিন গেলো গেলো রে বেলা,
কাল গেলো গেলো রে খেলা
আমি কার নৌকায় উঠিব রে ভাবি তাই
একা একা বসে কাঁন্দি রে সাথের সাথী কেহ নাই।
পিতা মরল মা হারালাম পথে
ভাই বন্ধু কেহ নাই মোর সাথে
একা একা বসে কাঁন্দিরে অজানা গাঙ পাড়ে
আমি কেমনে যাব ওপারে রে
আমার নাবিক বন্ধুর দেখা নাই।
কোথা হতে এসেছি আমি
কোথা যাব ভাবি দিবাযামী
অজানা অচেনা পথে রে হারিয়ে গেছি আমি
আমার চলার পথ গিয়াছে থামি রে
আমি পিছন ফিরতে নাহি পাই।
সাত সমুদ্র আরও তের নদী
আমার দিতে হবে নাকি পাড়ি
তার ওপারে আছে নাকি রে আমার দেশ ঘরবাড়ি
ওরে আমি দিন ভিখারি নাইকো কড়ি রে
আমি কেমনে ভাব পারে যাই।
অনাদী কয় শুন সাধু মহাজন
আমি সর্বহারা দেউলিয়া
ভিক্ষা ছাড়া নাই মোর গতি রে কাঁন্দি ঝুলি নিয়া
আমায় ভিক্ষা দিয়া দাও পাঠাইয়া রে
আমি দেশের মানুষ দেশে যাই।[১৯]

www.pathagar.com

৪.

নবী নামের নৌকা কর আল্লাহ'র নামে পাল খাটাও
বিস্‌মিল্লাহ বলে মোমিন কুলের তরী খুলে দাও।
যার কৃপাতে মাটির মানুষ মাটির ধরাতে
সুখ সম্পদ সম্ভোগ করল সবেবরাতে
এখন মরা এক নদীর চরাতে বাঁধিয়া রেখো না নাও।
কোথা ছিলে কোথা হতে এই দেশে এলে
এই দেশে সেই দেশের কথা সব ভুলে গেলে
এমন দুর্লভ মানব জনম পেয়ে তারে ছেড়ে কারে চাও।
ইমানসহ যেজন করে আল্লাহর ইবাদত
পরান দিয়ে যেজন করে বান্দারই খেদমত
তারে রহমান কররে রহমত লাগাবে বেহেশ্‌তের বাও।
পাগল বিজয় বলে দ্বীনের নবী দ্বীনের মোনাজাত
পাঠাইও যেখানে মোর পরোয়ার পাকজাত
যেন সহজে পার হই ফুলসিরাত চলিতে টলে না পাও।[২০]

৫.

ওরে আমার সোনার ময়না পাখি রে
ও তুই কোন ফাঁকে পালায়ে গেলি
আমায় দিয়ে ফাঁকি রে।
বনের পাখি পুষেছিলাম মনেরই আশায়
শুনিতাম তার সুখ দুঃখের গান সুমধুর ভাষায়।
তোরে সোহাগে সোনালি খাঁচায় দিয়েছিনু রাখি রে।
বাটি ভরে খাবার দিতাম শোভন পিঞ্জরে
এখন তোর বিরহে আঁখির জল মোর রাত্র দিন ঝরে
আমি তোমায় ছেড়ে কেমন করে এমন একা থাকি রে।
সজল চোখে যখন শূন্য খাঁচার পানে চাই
আমার স্মৃতির তমাল শাখায় তোরে আজও দেখতে পাই।
তোর মুখ দেখে সব ভুলে যাই পরান খুলে ডাকি রে।
নদীর বুক শুকায়ে গেলে ভাটির টান লেগে
দুকূল ভরে ওঠে আবার জোয়ারের বেগে
ও তুই তেমনি আমার মনের বাগে ফিরে আসবি নাকি রে।
না পাওয়ার বেদনা আছে হৃদয় মোর ছেয়ে
তব আশায় বুক বেঁধেছে যাতনা পেয়ে
পাগল বিজয় আছে পথ চেয়ে জল ভরা দুই আঁখি রে।[২১]

www.pathagar.com

৬.

দু'দিনের দুনিয়া রে মোসাফির ফিরে চল ঘরে
দেখি সংসার মাঝে সকাল সাজে গো
কত সাজে, সাজে নারী নরে।
কেহ পিতা মাতার ভূমিকায়
ভগ্নি ভ্রাতা কন্যা কি তনয়
পরিজনের কতই পরিচয়
.এ যে ছায়াছবির মায়াভিনয় গো
সংসার জীবন নাট্যমঞ্চের পরে।
ঘুচিলে এই মায়ার পরিবেশ
তখন হয় পরিচয়ের শেষ
থাকে না কোনো সম্পর্কের লেশ
মানুষ শেষ নিশ্বাস করিলে নিঃশ্বেষ গো
যাবে কোনো অজানা লোকান্তরে।
অর্থ সম্পদ যা কিছু সম্বল
এ জীবনের সংগ্রহ সকল
সবই পড়ে রবে মহীতল
শুধু পথের সম্বল স্বকর্মের ফল গো
যেও না সে ফল বিফল করে।
পড়ে প্রবল পিপাসায়
বারি ভ্রমে ভ্রম সাহারায়
হরিণী মরে মরীচিকায়
পাগল বিজয় আছে পারের আশায় গো
পড়ে কোন অজানা বালুচরে।[২২]

৭.

ও নদী রে চলছি তোর মতো কলকলিয়ে
অজানা পথে ওগো দরদি
ওরে ও পরান বন্ধু জীবন নদী রে
আমার এ নদীতে ভাটি আছে জোয়ারের নাই লেশ
তোর ভাটির টানে শুকায় নদী
জোয়ারে পায় আগের পরিবেশ
আমি ফিরব কি আর তেমনি মতো
বহে না দুকূলে জোয়ারের স্রোত
জীবনের সব ফেলে আসা হলো নিরুদ্দেশ...
(এই গানটির বাকি অংশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি)[২৩]

www.pathagar.com

৮.

কি ভাবলাম কি হলো ও মন ভোলা রে
দুনিয়া দিন কয়েকের খেলা
এত বেচা কেনা লেনা দেনা গো
দেখতে দেখতে ভাঙল চাঁদের মেলা।
শৈশব হতে ভাবলাম এতদিন
জীবন আমার বাড়তেছে দিন দিন
দিন গেলে মোর কমে যায় একদিন
ক্রমে ফুরাইল গণা দিন গো
ভাঙল আমার কাল স্বপনের মেলা।
চেয়ে দেখি নাহিকো একজন
যারা আমার প্রাণের প্রিয়জন
হারালেম সেই আত্মীয় স্বজন
আমার ভেঙে গেলো সুখের স্বপন গো
দেখতে দেখতে অস্তাচলে বেলা।
দৃষ্টি হারা সাগরের তীরে
সন্ধ্যার আঁধার আসিল ঘিরে
হারানো পথ পাব কি ফিরে
আমার সাথের সাথি কেহ নাহি গো
কাঁদি দাঁড়ায়ে একেলা।
পাগল বিজয়ের এই শেষের নিবেদন
জীবনে মোর নাই কোনো সাধন
রইল শুধু মরমে বেদন
এখন সাধু গুরুর অভয় চরণ গো
পরিণামে পরপারের ভেলা।[২৪]

৯.

ননদি ও ননদি গো যা ফিরে যা ঘরে
ভেসে চলেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ প্রেম সাগরে।
ঘুচল তোদের সকল জ্বালা মুছল কুলের কালি
কলঙ্কিনী রাই বলে আর তোদের কেউ দিবে না গালি
ব্রজে আর হবে না কৃষ্ণকেলী আমার গোপন সায়রে।
ঝুলনা দোলা নৌকা বিলাস আমার সবই হলো শেষ
প্রবাসে চলেছি আমি যেথায় বন্ধুর দেশ
দয়া করে শ্যাম ঋষিকেশ এই আশিস দেও মোরে।
চললো আজ-ই ননদি গো তোদের কুলের বউ
শ্যাম বিহনে জীবন জ্বলে বোঝে না রে কেউ
যার লেগেছে অকূলের ঢেউ তার কূলে কি আর করে।
বিদায় বেলায় ননদি গো এই মিনতি নিও
আমার হয়ে শ্যামের কুঞ্জে সাঁঝের প্রদীপ দিও
রসিক বলে আমায় রেখ কৃষ্ণ প্রেম সেবার তরে।[২৫]

www.pathagar.com

১০.

চিঠি লিখি তোমার কাছে ব্যথার কাজলে
আশা করি পরান বন্ধু আছ কুশলে
চিঠির প্রথম নিও ভালোবাসা তুমি বুঝিও মোর মনের আশা
আমার গোপন আশা ভিজিয়ে দিলাম দুই নয়নের জলে।
যে বকুলের তলায় বসে বাজিয়ে ছিলে বাঁশি
সেই বকুলের মুকুলে আজ গন্ধে অলি হাসি
দিয়ে গেছে গাঁথা মালা বুকে জাগে দারুণ জ্বালা
আমি একা কাঁন্দি কুলবালা বসে নিরালে।
যে বাসরে আমার সাথে মিলাইছিলে হাত
ফুটল কত মনের বনে প্রেমের পারিজাত
সেই বাসরে শূন্য হিয়া আমি থাকি শুধু পথ চাহিয়া
কাঁন্দে মন পাপিয়া গুঞ্জরীয়া বুকেরই তলে।
ভুলে যাওয়া পথটি ধরে ভুল করিয়া এসে
পার যদি দেখা দিও দিবসের শেষে
আমি কেমন আছি পরের ঘরে তুমি দেখতে পাবে নয়ন ভরে
আছে বন বিহঙ্গী কেমন করে বাঁধা শিকলে।
কি যে লিখি কি যে বাকি পাই না খুঁজিয়া
অবলার না বলা ব্যথা নিও বুঝিয়া
চিঠি এখন করি ইতি জানিও মোর প্রেম পীরিতি
অধম রসিক বলে শেষ মিনতি চরণ কমলে।[২৬]

১১.

বিমনা বনের পাখি রে
কেন তুই কাঁদিস অমন করে ও বৌ সর্ষে কোট
ও তুই কি হারিয়ে কেঁদে ফিরিস সারা জনম ভরে।
গ্রীষ্মকালে সর্ষে ভিজায়ে কোন সে কুলের বৌ
কালের টানে চলে গেলো ঠেকাতে নারে কেউ
ভিজানো সরিষা রয়েছে ভিজানো আর সেই ঢেঁকি নোট
তাই বুঝি পাখি কেঁদে ফিরে ও বৌ সর্ষে কোট
ও তার করুণ চোখে বেদনার ফোট আঁখির পাতায় ঝরে।
অতীত দিনের বিগত কাহিনি চলে গেছে বহুদূর
স্মৃতির বেদনার গীতিকা ছন্দে পাখির কণ্ঠসুর
সারাবিশ্বে সাড়া দিয়ে যায় বিরহ করুণ তানে
হারান দিনের পুরোনো ব্যথা জাগায় তোর প্রাণে
ও তাই কি যেন আছে পথ পানে পরান বিদরে।
বিরহ মিলনে গড়ে বিধাতা এই বিশ্ব চরাচর

www.pathagar.com

তারই মাঝে বাঁধা মানুষের হাসি কান্নার ঘর
কেউবা ভাসে অকূলেতে কেউবা পেল কূল
কেউবা পেল কাঁটার জ্বালা কেউবা পেল ফুল
কারো ঝরে গেছে বৃক্ষের শাখা কাল বৈশাখি ঝড়ে।
কত বিরহের মরমের বাণী ভাসে আকাশে
কত বিরহীর দীর্ঘ নিশ্বাস মিলে আছে বাতাসে
কত করুণ আঁখির বারি ভেসে বেড়ায় জনস্রোতে
পাগল বিজয়ের মনের পরতে দুঃখের হাওয়া ঘোরে।[২৭]

১২.

আমার ব্যথা ভরা প্রাণের কথা কেউ না শোনে যদি
দিনের শেষে শোন মোর গান হে পরম দরদি।
আমি সেই আশাতে কথার মালা গাঁথি নিরবধি॥

১.

যদি অনাদরে জনম ভরে ঝরে চোখের জল
না-ই পাই স্নেহ অবহেলাই হয় আমার সম্বল
শুধু তোমার প্রেমে হব শীতল রে
আছি তাই বুক বাঁধি॥

২.

যদি শূন্য বুকে কভু কাঁন্দি মরুময় জীবনে
তুমি আছ কাছে হে দরদি কইও কানে কানে
আমায় সিক্ত কর পরশ দানে রে॥

৩.

যেদিন জীবন সন্ধ্যা আসবে নামি নিভে যাবে বাতি
হারাইবে পথের দিশা ঘনায়ে কালো রাতি
তুমি আমায় খুঁজে নিও সখি রে
যদি পথ হারাইয়া কাঁন্দি॥

৪.

নিশি বলে ধরা তলে সুখ আমি না চাই
শত দুঃখের মাঝেও যেন তোমার দেখা পাই
তোমার নাম নিয়ে এই জীবন কাটাই রে
হৃদয় বীনা সাধি॥[২৮]

১৩.

১.

আরে ও প্রাণের বন্ধুরে
তোমার ওপারে কি আমার হবে ঠাঁই।

www.pathagar.com

আমি এপার কূলে বসে কান্দিরে
আমার বান্ধব কেহ নাই॥

২.
তোমার বনে ফুলের সুবাস ভাসে বাতাসে
আমার বনে শুকায় কলি শুধু হা-হুতাশে
বন্ধু তোমায় সবাই ভালোবাসে রে
আমার দুঃখের সীমা নাই॥

৩.
তোমার দেশে নিত্য বহে আনন্দের জোয়ার
আমার দেশে ব্যথার কলি দুঃখের হাহাকার
ঝরে তোমার পাশে আলোর ফোয়ার রে
আমি পুড়ে হলাম ছাই॥

৪.
তোমার পাশে খুশির ঝর্ণা হাসির বাসরে
আমার দেশে না পাওয়ার ব্যথায় আঁখি ঝুরে
বাজে তোমার বাঁশি মিলন সুরে রে
আমি দুঃখে ছাড়ি হাই॥

৫.
তোমার দেশে পাখির কুজন সবুজ বনের ছায়
নিত্য রঙিন আলোর মেলা আকাশ আঙিনায়
আমার আকাশ ছাওয়া গভীর ব্যথায় রে
সেই আঁধারের শেষ নাই॥

৬.
নিশি বলে হৃদয়ে মোর তোমার পরশ মাগে
ভাঙা বুকের পরে আবার সুখের রেখা জাগে
যেন তোমারই প্রেম অনুরাগে রে
বন্ধু চরণে লুটাই।[২৯]

১৪.

আমার গানের মাঝে তোমায় খুঁজে যত কাছে পাই
আমার গান ফুরালে আঁখি মেলে চেয়ে দেখি তুমি নাই॥
১. আমার গানের কলি যেন তোমার চরণ ছুঁইয়ে যায়
সুরেরই আলপায় তোমার পরশ মাখা রয়
আমার প্রাণে তোমার সৌরভ ছড়ায়
আমার আমি ভুলে যাই॥

www.pathagar.com

২. ভাবে ডুবে দেখি যবে হৃদয় গভীরে
মূর্ত হয়ে ওঠে তথা সুরের ছবিরে
তখন দেখি সেই আসল কবিরে
প্রেমালোকে ভেসে যাই॥

৩. তোমার নামে দু'নয়নে যখন ঝরে জল
নিজেকে দেখি তখন ঠিক তোমার চরণ তল
আমি তোমার প্রেমে হই সুশীতল
সকল ব্যথা ভুলে যাই॥

৪. নিশি বলে পূর্ণ হয়ে তোমারই দানে
তোমার পূজার অর্ঘ সাজাই আমার এ গানে
তুমি থেকো মোর প্রাণের মাঝখানে
কভু না তোমায় হারাই॥[৩০]

১৫.

তুমি প্রেমেরও ঠাকুর তোমায় প্রণতি, প্রণতি হে প্রেমময়,
যেন প্রেমে অবগাহি তব প্রেম যমুনায়॥

১. বংশীওয়ালা তুমি কিশোর শ্যামল
গলমালা গলে দোলে ওহে নীলদল
তোমার বাঁশিতে ভুলাও সকল সুর মূর্ছনায়॥

২. রাখাল সনে কর খেলা যমুনার কূলে
ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াও কদম্ব মূলে
আমার হৃদয় যমুনার কূলে এসো শ্যামরায়॥

৩. রাধারও বধূয়া তুমি সুন্দর শ্যাম
যুগল কিশোর ওহে নয়নাভিরাম
আমার এ দেহ কর ব্রজ ধাম প্রেম মহিমায়॥
৪. নিশি বলে এসো তুমি মদন মোহন
সাজিয়ে রেখেছি মম মন বৃন্দাবন
আমি যতনে পূজিব চরণ হৃদি আঙিনায়॥[৩১]

১৬.

১. আগুনেরই খেলায় খেলে মলয় পবনে
চতুর্দিক হইতে আমার বেড়ল আগুনে
কোকিল ডাকে বকুল শাকে আগুন ধরায় পোড়া বুকে
আমি জ্বলে মরি ধুকে ধুকে পরান যে গেলো॥
২. ফুলের বনে গুনগুনিয়ে গাহে অলিকুল

www.pathagar.com

আগুনে পুড়ে ছাই হলো প্রেমেরই মুকুল
সরোবরে সরোজিনী করে ভ্রমর সনে কানাকানি
ছিলাম শ্যাম সোহাগে সোহাগিনী
আ-মরি সবই ফুরালো॥

৩. ফাল্গুনী পূর্ণিমার চাঁদ সুধা নাহি তায়
ঢালিয়া গরল রাশি দোহিছে আমায়
সব যেন আগুনের খনি কেমনে কাটাই রজনী
যেন মণিহীন ক্রুদ্ধা ফণিনী আমায় বিষে ভরালো॥

৪. বনের আগুন নিভে সখি শীতল জল ঢালিলে
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে নিভে না তা জ্বলে
যে আগুন জ্বলে নিরবধি বিহনে শ্যামল জলধি
নিশি কয় সে কৃপানিধি বুঝি বিধি বাম হলো॥[৩২]

১৭.

মধুরাতে বধূর আসে বাসরও সাজাইয়া
আমার কুলের কুল মজাইয়া, ওলো প্রাণ সজনী
তবু তার দেখা পেলাম না।
আমার কাঁদতে কাঁদতে রাত পোহালো বন্ধু এলো না॥

১. সারা নিশি পথ চেয়ে প্রহরগুনি তার বিরহে
হৃদয়ে মোর ব্যথার জাল বুনি
কত সাধে গেঁথেছিলাম সোহাগের মালা।
সকলই মোর বিফল হলো এলো না কালা
ও সে মালায় হলো দ্বিগুণ জ্বালা প্রাণে সহে না॥

২. না জানি কোন অপরাধে বিধি হলো বাম
চোখের জলে পেলাম না সই ভালোবাসার দাম
এত ব্যথা কেমন করে পরানে সহি
এত কান্দি তবুলো তার প্রতীক্ষায় রহি
আমার এ ব্যথা যার কাছে কহি সেতো বোঝে না॥

৩. কত দিনে শেষ হবে মোর বিরহের পালা
সব গিয়াছে গেলো না সই বুকের এ জ্বালা
চোখের জলে বহে নদী মানে না বারণ
ভালোবেসে হলো সখি অকালে মরণ
তবু বুঝ মানে না এ অবুঝ মন তারে ছাড়ে না॥

৪. নিশি বলে কি দিয়া আর বাঁধিব জীবন
এত করেও এ জীবনে পেলাম না তার মন
তবু যেন জনম ভরে তারেই ভালোবাসি

www.pathagar.com

মরেও কভু ভুলে না যাই আবার যদি আসি
দেখে শেষ দিনে তার অরূপ রাশি ঘুচাই বেদনা॥[৩৩]

১৮.

আমার প্রথম দেখা সেই বটগাছটি
আজও আছে পথের ধারে
কেবল নাই আমার সেই সবুজ প্রীতি রে
কোথা হারিয়ে গেছে অনেক দূরে॥

১. সেদিনের সেই খেলার সাথী ছিল যতজন
চারিধারে আমায় ঘিরে করিত গুঞ্জন।
সেই ছেলেবেলার বন্ধু সুজন রে
ও সে হয়তো ভুলে গেছে মোরে॥

২. গাঁয়ের ছোট্ট যে মেয়েটি সবার আড়াল থেকে
কচি হাতের ইশারাতে বলত আমায় ডেকে
ও তার ছোট্ট শাড়ির আঁচল ঢেকে রে
কত খাবার আনতো গোপন করে॥

৩. খেলার ছলে গাছের তলে সাজিয়ে বাসর
ঘোমটা দিয়ে বলত আমায় তুমি আমার বর
বলতো কানে কানে মনের খবর রে
ও সে আধো লাজে সোহাগ ভরে॥

৪. হারিয়ে গেছে সেসব আজি সাথি নাই মোর কেউ
শুধু মাঝে মাঝে সকাল সাঁঝে ওঠে স্মৃতির ঢেউ।
ও তাই নিশি বলে তার মধ্যে কেউ রে
যদি আমায় কভু মনে করে॥[৩৪]

১৯.

আমার শুক পাখিটি উড়ে গেছে জীবন প্রভাতে
সারা জীবন কেঁদে যাব তার আশার আশে।
ব্যর্থ আশা ফিরে পাওয়া সার হলো মোর পথ চাওয়া
জল ভরা ব্যথার গান গাওয়া অচীন প্রবাসে॥

১. কল্পলোকে রঙিন স্বপন দেখিয়া ভোরে
পুষে দিলাম শুক পাখিটি হৃদি পিঞ্জরে।
কত আশায় বেঁধেছি বুক
পেয়েছে শুধু ব্যথাটুক
আসবে কি মোর হারানো সুখ হৃদয় আবাসে॥

www.pathagar.com

২. বল না বিধি মোর জীবনে কেন পরাজয়
দু'হাত পেতে যেদিকে চাই ফিরি নিরাশায়
কারে দেখাই এ বুক চিরে
ব্যথার প্লাবন জীবন তীরে
হতাশ প্রাণে মনের বনে হারালাম দিসে॥

৩. ভেঙে গেলো এ জীবনের আশার প্রাসাদ
ঘিরে আছে নিরাশ মেঘে বহুদিনের সাধ
বন্ধুরে কি আর সুখের বাঁশি
কাঁদবে কবে অমানিশি
সেই সুদিনের অভিলাষি রব মনের হরষে॥

৪. সুখী হতে চায় সকলে কেউবা সুখী হয়
শুক পাখিটি ধরতে চাহে দুঃখের দরিয়ায়
সুখে দুঃখে বিশ্ব গড়া
দুঃখ বিনে সুখ যায় কি ধরা
শুধু স্বপনের মন পাগল পারা বিষয় বিষে॥[৩৫]

২০.

শাপলা ফোটা ঝিলের পাড়ে
তাল পাতার ওই ভাঙা কুঁড়ে,
বল না কে গো বাজায় বাঁশরী।
তার কি মনের মানুষ হারিয়েছে,
ঝরে সুরের ব্যথার লহরী॥

১. আনমনা মন পিয়ালো বনে
কী যেন কী খুঁজে বেড়ায় সুরের আহ্বানে
তার তন্দ্রা লাগা সুর বর্ষণে,
নাচে বিরহী মন ময়ূরী॥

২. বিরাম হারা সুর মূর্ছনায়
নিজে কাঁদে কাঁদুক কেন আমারে কাঁদায়
সে কি সুখ পায় কাঁদায়ে আমায়
আমি পরের ঘর করি॥

৩. তার গানের মাঝে বেদনার উচ্ছ্বাস
হারানো ধন বুকে পেতে যেন অভিলাষ
আমি হতাম যদি চরণের দাস
মুছাতাম নয়ন বারি॥

www.pathagar.com

৪. কার লাগিয়া ভাবনা মোর শুধু
আমি দিঘির ফোটা কুমুদিনী সে গগণের বিধু
এ দীন স্বপন কয় মোর পরান বধূ
আসবে কি ওই কূল ছাড়ি॥[৩৬]

২১.

সইরে এ জ্বালা আমার প্রাণে চায় না।
আমার মন যারে চায় কথা না কয়
ফিরেও তাকায় না॥

১. ভালোবেসে হৃদাবাসে যারে দিলাম ঠাঁই
আমার কথা ভাবতেও তার একটু সময় নাই
কার মনের বনে নিয়েছে ঠাঁই
তার কথা বৈ কয় না॥

২. যদি ভালোবেসে নাই বা হবে, কেন দিলে দেখা
আমায় করে পাগলিনী দূরে রয় একা
যার মন বাঁকা তার নয়ন বাঁকা
শিক্‌লি কাটা ময়না॥

৩. স্বপন বলে যে যায় চলে ফিরে না তো আর
পাওয়ার মাঝে সার হয় শুধু ব্যথার অলংকার
ভবে প্রেম পীরিতির এই ব্যবহার
তার বেশি পায় না।[৩৭]

২২

সখি ভাবি নাই মনে
হবে ভালোবাসা সর্বনাশা মোর জীবনে
শুধু ব্যথার প্রদীপ নিয়ে আমি ঘুরি বিজনে॥

১. প্রেম সোহাগে অনুরাগী নিঠুরিয়া মোর
বাহুলতায় বেঁধে কত নিশি করত ভোর।
আমি ছিন্ন করে মিলনের ডোর রহি কেমনে
অভাগিনীর কথা কি তার জাগে না মনে
আমার মন পাপিয়া বেড়ায় ভ্রমে আশার কাননে॥

২. সরোজিনীর ব্যর্থ আশা ভানু অ-প্রকাশ
চন্দ্র বিনা চকোরিনী ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
সখি শ্যাম সুধাকর উঠবে কি মোর হৃদয় আকাশে
মন চকোরা নিশি জাগে তার আশার আশে
পেলে রাখতাম তারে হৃদাবাসে অতি গোপনে॥

www.pathagar.com

৩. এ জীবনে হলো না সই তাহারে পাওয়া
আঁখি দু'টি রইল শুধু আশা পথ চাওয়া
কবে লাগবে তাহার চরণ ছোঁয়া শেষের লগনে
স্বপনের মন আছে মগণ ও রূপের ধ্যানে
সখি কালো রূপ জীবন মরণে ভুলি কেমনে।[৩৮]

২৩.

ওপার হতে যারা, সাথে এসেছিল তারা
চলে গেলো যে যার আপন দেশে,
আমি একা বসে আছি ঘাটে।
হুতাশে কাঁদিছে প্রাণ বসে একাকী
দিবাকর বসিল ওই পাটে।

১. অচেনা পথিক পথ পাই না খুঁজে
কোথা হতে এসেছি পাই না বুঝে
ক্লান্ত রবির ছায়ায়, ধরণী ধুলির মায়ায়
ব্যাকুল প্রহর মোর কাটে।

২. আশার দোলনায় কত দোল খেয়েছি
হাসির মঞ্চে কত গান গেয়েছি
যাদের নিয়ে সদা খেলেছি খেলা
মিলাইয়াছি কত সে সুখেরও মেলা
কি হতে যে কি হলো, কে কোথায় চলে গেলো
সাড়া নাহি পাই মাথা খুটে।

৩. যাদের স্মরণে মন একদিন হইত আকুল
কোথায় সে কবিগুরু রাজেন্দ্র নকুল,
কালের খেয়ায় কোথায় চলে গেলো হায়,
কোথায় সে প্রাণের কবি নিশি আর বিজয়
ছাড়িয়া কবির খেলা, অকালে ভাসায়ে ভেলা
রসিক চলিয়া গেলো বটে।

৪. জীবন খাতার পাতায়, কি যে লিখি ছাই
কিছু তার মুছে গেছে, কিছু মনে নাই।
উল্টাইয়া দেখি পাতা সবই যে ভুল
আমি যেন কার হাতের খেলার পুতুল
বেদনার ঝুলি কাঁধে দীন অনাদী বসে কাঁদে
তরী বুঝি আসিল ওই ছুটে।[৩৯]

www.pathagar.com

২৪.

নকশি কাঁথার মাঠে রে সাজুর ব্যথায়
আজও বাজে রূপাই মিয়ার বাঁশের বাঁশি।
তাদের ভেঙে গেছে আশার বাসর রে
তবু যায় নাই ভালোবাসা-বাসি।

১. কত আশা বুকে নিয়া বেঁধেছিলাম ঘর
কত সুখে মিলে ছিল মিলন মঞ্চের পর
হঠাৎ আসিয়া এক কালবৈশাখী ঝড়ে রে
সেসব নিয়ে গেলো ভাসি।

২. সাজুর কবরের এক পাশে নকশি কাঁথা গায়
রূপাই মিয়া শুয়ে আছে মরণের সজ্জায়
তারা শুয়ে আছে চির নিরবতায় রে
যেন দুইটি হিয়া পাশাপাশি।

৩. পল্লি কবি, জসীম উদদ্দীন বেদনার ছায়ায়
নকশি কাঁথা লিখেছিল মনেরই ভাষায়
তাই ভাবুকগণ আনে কল্পনায় রে
যেন সত্য লোকের তত্ত্ব বাশি।

৪. নকশি কাঁথার মাঠের লোকে আজও শুনতে পায়
নিঝুম রাতে রূপাই মিয়া বাশরী বাজায়
পাগল বিজয়ের মন চায় রে-
বাঁশি একবার গিয়ে শুনে আসি॥[৪০]

২৫.

কে বুঝিতে পারে আমার পাগলের কারবার
আমার কেষ্টক্ষ্যাপা গণেশ বাবা কঠিন কারিগর
ঢাকার শহর মিলইছে কলকাতার বাজার (২)

১. পাগলের লীলা বোঝা ভার
নিজের ইঞ্জিন নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভার (২)
সে যে আকার সাকার হয় নিরাকার ভোলা মন
তাঁর কাছে গাড়ির পাওয়ার।

২. ঢাকা শহর থাকে ঢাকা গাড়ি হয় তৈয়ার
ড্রাইভার মিস্ত্রি গাড়ির আছে যে হেলপার
দশ মাসে সেই দামের গাড়ি দেখছে চমৎকার
আমার পাগলা বাবার পাগলা গাড়ি নিজে পাগল ড্রাইভার।

www.pathagar.com

৩.পাগলের হাতে আছে ইঞ্জিনের পাওয়ার
তেল ছাড়া বেতালের গাড়ি চালায় বার বার
আঠার সিটের গাড়ি ষোল জন তার প্যাসেঞ্জার।

৪.বাবুল বলে যখন গাড়ির ফুরাইয়া যাবে তেল
অজ্ঞান হইয়া গাড়ি করবে অ্যাক্সিডেন্ট
ছিড়ে যাবে তারের জয়েন্ট
পড়ে থাকবে রোডের পর।[৪১]

২৬.

মানবকুলে জনম নিয়া রে
বাস করলি ক্যান বাগেরহাট
ও তোর দেহের মাঝে নাগের বাজার
ছাড়বি যেদিন শেষ নিশ্বাস।

১. ঢাকা থেকে কোচে উঠে
দশটার সময় খুলনা নেমে
সাড়ে দশটায় ফেরিপার হয়ে
নেমে পড়লি রূপসার ঘাট।

২. রূপসার হাটে ঘুরে বাল্যকাল
তোর দিন যায় ফুরায়ে
এবার যৌবনের তাড়নায় পড়ে
লালবগি করলি তালাস।

৩. লাল বগিতে উঠে পড়ে
ভুল করলি তুই টিকিট না কেটে
এবার মাঝখানে গাড়ি থামায়ে
নামিয়ে দেবে ফকির হাট।

৪. অনাদী কয় পাসপোর্ট আছে
ভিসা নাই গুরু আমার কাছে
এবার তুমি বিনে শেষের দিনে
আসবে যেদিন পারের ডাক।[৪২]

২৭.

এ দুনিয়া রঙের খেলা, খেলিতেছে কত খেলা
ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।
আজ আমি বসে আছি পারঘাটায়।

১. যাদের কল্যাণে আমি আসিয়া এই ভুবনে
কোথায়বা গেলো তারা, ভাবি মনে মনে।
আদরের পিতা-মাতা, বিদায় নিয়ে গেলো তারা
নিয়তির খেলা বোঝা দায়।

www.pathagar.com

২. পিছনে তাকিয়ে দেখি, ঘোর অন্ধকার
আয়ুবেলা অস্ত যায় গো আমার,
ছিল কালের ঘণ্টা, কেঁদে উঠিল মনটা
নিতে হবে শেষ বিদায়॥

৩. সঙ্গের সাথী ছিল যারা, তারা চলে যায়
নাবিক ঘাটে নাও ভিড়ায়ে ডেকেছে আমায়
নারায়ণ কয় যেতে হবে, থাকা কভু নাহি হবে,
প্রভু তুমি থাকিও সহায়॥[৪৩]

৪. বৈঠকি গীত

বৈঠক বা আসরে উপগত হয়ে যে গীত পরিবেশন করা হয় তাকে বৈঠকি গীত বলে। এখানে বৈঠক গীতির আসরে একাধিক দলকেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। একদল গান গাওয়ার পর অন্যদল এসে দাঁড়ায় বা পরিবেশিত গানের সাথে সংগতি রেখে গান পরিবেশন করে থাকেন। বিভিন্ন পার্বণে, স্মরণসভায়, মহোৎসবে পীর দরবেশদের মাজারে ধর্মীয় ভক্তিমূলক গানই বৈঠক গীতির তাৎপর্য। এই গানে সামাজিক চিত্র তেমন ফুটে ওঠে না। বৈঠকি গানের মধ্যে চারণ কবি সম্রাট বিজয়কৃষ্ণ অধিকারীর গান, কবি রসরাজ শ্রীমৎ তারক চন্দ্র সরকারের মহাসংকীর্তন, অশ্বিনী গোঁসাই'র গান, ফটিক গোসাই'র গান, অনাদী সরকারের গান, হাজার চাঁদ ফকিরের গান, রসিক সরকারের গান খুবই জনপ্রিয়। আরও আছে নাম না জানা অনেক পদকারের অসংখ্য বৈঠকি গীত। মুসলমানদের মধ্যে মারফত ও ফকির পন্থিরাও এই বৈঠক গানের আয়োজন করে থাকেন। নবীতত্ত্ব, মেরাজতত্ত্ব ও পীরের গান তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এই গানে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই বললে চলে। বিভিন্ন ধরনের গানের মধ্যে মনসা পূজার গান, ত্রিনাথ ঠাকুরের গান, জন্মাষ্টমীর গান, নীলপূজার গান, গোষ্ঠ গান ও রাধা বিচ্ছেদ তারমধ্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। নিম্নে কিছু বৈঠকি গীত উল্লেখ করা হলো–

১.

আমার মন নিল যে জন হরে
দেহ প্রাণ নিল যে জন হরে
আমি পাই কোথা তারে
আমি তারই দাসী দিবা নিশি (সইরে)
আমার তার জন্য নয়ন ঝরে।
অরুণ নয়ন যার ভুরু বাঁকা
হাতে পায়ে উর্ধ্ব রেখা
যেন চাঁদ হিঙ্গুল মাখা
হলো কি ক্ষণে তার সঙ্গে দেখা (সইরে)
নিল সেই হতে পাগল করে।
আমি গৃহী কি বনচারী
সন্ন্যাসী কি ফকিরি

www.pathagar.com

কিছু বুঝতে না পারি
আমি কি করিতে কি না করি (সইরে)
আমি চিনতে নারি আমারে।
যত ধর্ম কর্ম জগতে
সাধন ভজন সাধুতে
করে বহু বেদমতে
আমার মন মজে না তার কিছুতে (সইরে)
কেবল চায় সে প্রাণ নাথেরে।
আমায় গৃহে যেতে বলিস সই
কি ধন লয়ে গৃহে রই
আমার সাধনার ধন কই
বুকে ধানটা দিলে হয় পোড়া খই (সইরে)
তোরা দেখনা আমার বুক ধরে।
মহানন্দ কয় মানুষ রতন
পেল গোলক হীরামন
তারা কুড়ালো জীবন
তারক নাই তোর সাধন কর গে রোদন (সইরে)
গুরু চাঁদের শ্রী চরণ ধরে।[৪৪]

২.

মন না জেনে দিস না নয়ন করি হে মানা
নয়ন দিলে যাবি জন্মের মতো
ফিরাইতে আর পারবি না।
সে যে বড় নিষ্ঠুর কালা জন্মাবধি দিচ্ছে জ্বালা
ওসে এমনি মনোচোরা
তারে দেখতে কালো কথায় ভালো
স্বভাব কিন্তু ভালো না।
নেবার বেলায় করে সন্ধি
নিয়ে করে কপাটবন্দি দেবার জানে না
তার মতো ভুলানো সন্ধি জগতে আর মেলে না।[৪৫]

৩.

ও তিন পয়সাতে হয় যার মেলা
হয় কলিতে ত্রিনাথের মেলা
ওই দ্যাখ ত্রিনাথ ঠাকুর উদয় হলো
ন'দে পুরের গাছ তলা।
এক পয়সার তেল কিনে তিন বাতি সাজায়ে
বসে আছে তার ছায়ায়
বাতি জ্বলছে ধীরে নিভে নারে

www.pathagar.com

প্রভুর কি অপার লীলা।
এক পয়সার পান কিনে তিন খিলি সাজায়ে
বসে আছে তা ছায়ায়
খেয়ে পানের খিলি সাধুগুলি
বসে বাজায় এক তারা।
এক পয়সার গাঁজা কিনে তিন কল্কি সাজায়ে
বসে আছে তার ছায়ায়
দিয়ে গাঁজায় দোম বলে ভোম
বোবায় বলে ভোম ভোলা।[৪৬]

৪.

প্রাণ কৃষ্ণ বলিয়া ত্যাজিব পরান যমুনারই তীরে
কালা কাল বলিয়া গেছে চলে সেই কালের শেষ নাই রে-
মনের বনে ঘরের কোণে জ্বলে আগুন
মন গগনে জ্বালায় দ্বিগুণ তার বিরাম আর নাই রে।
বাদল ঝরা পাগল আঁখি রে মানে না মানা
দিগাঞ্চলে মুছে যায় সেই দৃষ্টি সীমানা
করি কার লাগি-এ আনাগোনা সে এলো ফিরে।
শেষের দাবি রইল সই রে ভুলিস না পাছে
শ্যাম বিরহে শ্যাম দুলালী প্রাণ ত্যাজিয়াছে
তোরা এই খবর দিবি বন্ধুর কাছে মাথার কিরারে।
কোন বিধাতা গড়েছে সই এই ভালোবাসা
পাগল বিজয় বলে এ যে শুধু আগুনের বাসা।
ভবে যার ঘটে নাই এই দুর্দশা সে জানবে তার কিরে।[৪৭]

৫.

আমি যার সাথি তার সঙ্গে যাব
গৃহে আমার আছে বা কি
আমি ঘরে রব না প্রাণ সজনী।
গৌর গৌর বলিস তোরা
হই না যেন গৌর ছাড়া ও প্রাণ সজনী
গৌর বুক ফাটা ধন কাঁচা সোনা
হেরবো দিবা রজনী।
গৌর মালা গলে নিব ও প্রাণ সজনী।
তার নামের হলুদ গায়ে মাখিয়া
হবো গৌর সন্ন্যাসী।[৪৮]

৬.

তুমি ব্রহ্মাণ্ডের ভার সইতে পার
তার মধ্যে কি আমি কি না

www.pathagar.com

দীন বন্ধু কি না
ওরে দয়াল আমা হতে যাবে জানা
তুমি দীন বন্ধু কি না।
শুনে এলাম ত্রেতা যুগে
মিথীলারও পার ঘাটাতে
মাধবের কাষ্ঠের তরী সোনা হলো
আমার দয়াল চাঁদের নামের নিশনে
এই তরীতে খাটবে কি না।
এই যে আমার জীর্ণ তরী
পাপে তরী বোঝাই ভারী
এই তরীতে ঢেউ মানে না।
আমার দেহ তরী অচল হলে
চরণ তরী দেবা কি না।[৪৯]

৭.

এই পৃথিবী যেমন আছে ঠিক তেমনি পড়ে রবে
সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে
যখন নগদ তলব তাগিদ পত্র নেমে আসবে যবে।
মোহ ঘুমে যেদিন আমার মুদিবে দুই চোখ
পাড়াপড়শি প্রতিবেশি পাবে কিছু শোক
তখন আমি যে এই পৃথিবীর লোক ভুলে যাবে সবে।
যত বড় হওনা কেন রাজা-জমিদার
পাকা বাড়ি জুড়ি গাড়ি ঘড়ি ট্রানজিস্টার
তখন থাকবে না কোনো অধিকার বিষয় বৈভবে।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা আকাশ বাতাস জল
যেমন আছে তেমনি পড়ে রবে অবিকল
মাত্র আমি আর থাকব না কেবল জনপূর্ণ ভবে।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বন্ধ হলে যেন
এই পৃথিবীর অস্তিত্ববোধ থাকবে না আর হেন
পাগল বিজয় বলে সেইদিন যেন এসে পড়ে কবে।[৫০]

৮.

যার যার জ্বালা সেই সেই জানে
অপরে কি জানে জ্বালা আমার অন্তর্যামী বিনে
ঘরে জ্বালা বাইরে জ্বালা জ্বালা সংসারময়
অনন্ত অনল জ্বালা কতই প্রাণে সয়
দয়াল তোমার কাঙাল জ্বলে মরল রে
তোমার পীরিতির অনলে ওরে কত জ্বালা যে আগুনে।
নিদারুণ এক হেন অনল কে দিল জ্বেলে
অনল জ্বলে মনের কোণে না চাইল ফিরে

www.pathagar.com

হায় রে ভালোবাসার ওরে জ্বালা .
সদায় জ্বলে মনে ওরে কত জ্বালা যে আগুনে।[৫১]

৯.

ও ভাই নিতাইরে আমায় নিয়ে ব্রজে চল .
আমার ব্রজের কথা মনে পড়লে হৃদয় হয় চঞ্চল
সাথের সাথি সকল গেলো
আমার ব্রজে যাওয়া কইবা হলো।
আমার আশায় আশায় দিন ফুরাল
ওরে ব্রজে চল চল রে
ব্রজের পথে যাত্রা করি
আমার আশায় আশায় দিন গেলো।
আমি একান্তে প্রাণেতে মরি
আমার মুখে দিয়ে গঙ্গা বারি
দ্বীজ কৃষ্ণ বলে এই করিও
এ ছার জীবনে কি কাজ বলো।
ব্রজের গুল্মলতা হতে
হেঁটে যেতে গোপীর চরণ পেতে
রেখ অন্তিম কালে তুলসী তলে।
কর্ণে জয় জয় রাধার নাম বলো।[৫২]

১০.

আ

আল্লাহ রাসুল মোমিন আল্লাহ রাসুল বল
এবার ফেলে দিয়ে মায়ার বোঝা সোজা পথে চল।
ফোরকানে ফরমান করেছে পরোয়ার পাকজাত
ঠিক রাখিয়া রোজা নামাজ হজ্ব আর যাকাত
দিবে ফরজ সুন্নত উন্নত পদ জান্নাতে দখল।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আলামীন
মুশকিলে আসান দিবে সেই রোজ হাসরের দিন
দয়াল রাসুল তার রয়েছে জামিন উম্মতের সম্বল।
লা–শরিক ওয়ালা মাবুদ পাক নিরঞ্জন
একমেব্‌ম অদ্বিতীয়ম ব্রহ্ম সনাতন
যেজন বিধি পালন করে জনম তার সফল।
পাগল বিজয় বলে বেদ পুরাণ আর বাইবেল বেদান্ত
ভর দুনিয়া আশ্বাস যোগায় আসমানি গ্রন্থ
যেজন সত্য প্রেমে চিরশান্ত চিত্ত তার নির্মল।[৫৩]

www.pathagar.com

১১.

ওরে জীবন কানাই একবার দেখাদে রে ভাই
সেজে আয় ভাই গোচারণে
ওরে আমরা মিষ্ট ফল যতন করে দিব কার বদনে।
দেখ রে গগনে উদয় ভানু সেজে আয় ভাই নন্দের কানু
আয় সকলে যাই রে
রাখালে দাঁড়ায়ে দ্বারে ডাকে তোমায় উচ্চস্বরে
বলে কানাই আয় রে
আয় সকলে আমরা গোষ্ঠে যাই
গোষ্ঠে যাবি না ভাই ওরে জীবন কানাই
গাভীগণ চলে, চলে না ভাই তোমা বিনে।
একদিন কালীন্দির জল বিষ পান
মরেছিল সব রাখালে বাঁচালে তখন তুই রে
আমার জীবন ধন রে
যাবি না ভাই গোচারণে এই যদি তোর ছিল মনে
কালীন্দির জল বিষপানে ক্যান বাঁচালে ও ভাই কৃষ্ণধন।
বলাই উচ্চস্বরে ডাকে কানাই আয় রে
এখন প্রাণ ত্যাজিব তোমা বিনে।
তোমায় স্কন্ধে করে লয়ে যাব রাখাল রাজা সাজাইব চরণে রবো
আমরা ব্রজের খেলা খেলিব রে
তোমায় করে রাখাল রাজা আমরা প্রজা হয়ে দাস হবো
তোমার অদর্শনে আমার প্রাণ যায় রে
এখন প্রাণ ত্যাজিব ও ভাই তোমা বিনে।

১২.

লহরী

তোমায় স্কন্ধে করে লয়ে যাব
ও কানাই ভাই চল গোষ্ঠে যাই
ও তোর ভাই বলে কি দয়া নাই রে
আমরা ভাই ভাই বলে কেঁন্দে ফিরি
ওরে গুণের ভাই।[৫৪]

১৩.

আমার বাঁচিবার আর আশা রে নাই
আমার জীবনের ভরসা নাই
তোরা জন্মের মতো আমায় বিদায় দে
রাখবি আর কতকাল সখি তোরা আমার মায়ার ডুরি কেটেদে।
এতকাল সখি কত ভাবে ছিলাম তোদের সনে
কত ব্যথা দিয়াছি সই তোদের সবার মনে

www.pathagar.com

এবার আমি মলে সখি তোরা মরিস না মনের খেদে।
তোরা আমায় ঘিরে দাঁড়া মিলে সব দেখি
আমার বন্ধু এলে সখি তোরা রাখিস তারে আনন্দে।
পোড়া দেহের দ্বারা বুঝি হলো না তার সেবা
আমার মতো অভাগিনী এ জগতে কেবা
আমার মায়া জনম গেলো সখি ওরে তার লাগি কেঁন্দে।
যত কাঁন্দা কাঁদি সখি ভাবি কান্নার দেশে
মরে যেন জনম লই সখি প্রাণ বন্ধুর ওই দেশে
এ দীন অনাদীর এই বাসনা স্থান পাই যেন কৃষ্ণ পদে।[৫৫]

১৪.

মধুমাখা ওই গুরুর নাম ওরে নিতাই
কোথা হতে যেন এনেছে রে
শুনে নামের ধ্বনি হৃদয় হতে
আপনি বেজে উঠেছে রে,
আমি নিতার সঙ্গ নেব
এসব কুলের গৌরব না করিব
সকল ছেড়ে পেড়ে দিয়ে গুরু গুরু বলিয়া
নাচতে বাসনা হইয়াছে রে।
যে কথা বলে ছিল মোর কানে কানে
ভব পারের বন্ধু এলো এতো দিনি
একখান ফুলের সাজি মাথায় লয়ে
নবীন যোগী সেজেছে রে।
গুরু হলো পরশমণি
তাই তো দয়াল প্রেমের খনি
এবার কলির জীবো উদ্ধারিতে
প্রেমের মানুষ এসেছে রে।[৫৬]

১৫.

বৃন্দেরে তুই করগে মানা
শ্যাম যেন কুঞ্জে আসে না
শ্যামের জন্য বানাই বিছানা
সেও বিছানা বাসি হলো
আমার শ্যাম তো এলো না
আমি সারা নিশি ভোর করিলাম
কাঁন্দায়ে ভিজাই বিছানা।
শ্যামের জন্য রইলাম ইহকাল ও পরকাল
আমার হারালাম সম্বল
ও অসময় আসিলে পরে

www.pathagar.com

আমি মান করে কথা বলব না।
শ্যামের জন্য গেঁথেছি মালা
সেও মালা বাসি হলো
আমার শ্যাম তো এলো না
আমি সারা নিশি ভোর করিলাম
এখন কার গলে ঝুলাব মালা।[৫৭]

১৬.
সংসার সাগর রূপো ভাই মানব মীন সেজেছে
কাল রূপ এক ধীবর এসে জঞ্জাল জাল পেতে রয়েছে
জঞ্জাল জালে হয়ে বন্দি আমি এড়াতে না পাই সন্দি
বসে সদায় কাঁন্দি
কাল হলো তোর দারুণ বিধি জালের ফাঁস এঁটে দিতেছে।
সাধু মহোন্ত মকর যারা জালের ফাঁস কেটে যেতেছে তারা
হৃদে শক্তি পোরা
অনুরাগে তনু ভরা শিরে ভক্তি করাত আছে।
সাধু মকরের সঙ্গ নিলে ওসে বন্দি রয় না জঞ্জাল জালে
সাথে যায় গো চলে
মুখে হরি হরি বলে প্রেমানন্দে সুখে আছে।
এমন ভক্তি কবে হবে আমার মন মীন সাধুর সঙ্গ লবে
ভবের জঞ্জাল যাবে
গুরু চাঁদের দয়া হবে কর্ম বন্ধন যাবে ঘুচে।
গোলকচন্দ্র মকর হয়ে যাচ্ছে প্রেম সাগরে জোয়ার দিয়ে
মত্ত মাতাল হয়ে
অশ্বিনী তুই আকুল হয়ে এবার ঝাপ দে গোঁসা'র পাছে।[৫৮]

১৭.
এসো মা লক্ষ্মী বস ঘরে
আমার এ ঘরে থাকো আলো করে।
শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি
সুগন্ধে ধূপ জ্বেলে আসন পেতেছি
প্রদীপ জ্বেলে নিলাম তোমায় বরণ করে।
আলপনা এঁকে তোমায় সাজিয়ে দিলাম ঘর
আমের পল্লব দিলাম জল ভরা ঘট
পান সুপারি দিলাম দু'হাত ভরে
জনম জনম থাকো আমার এ ঘরে
এসো মা লক্ষ্মী বস ঘরে
আমার এ ঘরে থেকো আলো করে।[৫৯]

www.pathagar.com

১৮.

ছিঃ রাধিকার দাসী আমি ছিঃ রাধিকার দাসী
ভালোবাসা দিয়ে মোরে ক্যান থাক আজ দূরে বসি।
বৃন্দাবন্দের গোপ-গোপীগণ সবাই উপবাসী
তোমায় ছাড়া খায় না কেহ নিত্য পালে উপবাসী।
তুমি হও দশ ধারার আসামী আমি হই চাপরাশি
তোমায় আমি বান্দি নেব এই দেখ মোর হাতে রশি।

মুকসুদপুরের বানিয়াচরে এবং কোটালীপাড়ার নারিকেলবাড়িতে খ্রিস্টানদের বিখ্যাত দুটি চার্চ আছে। প্রতিষ্ঠান দুটি অনেক আগে থেকে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরাও প্রভু যীশুর নামে যথারীতি গুণকীর্তন করে যাচ্ছেন। গানগুলো এরকম :

তুমি নিশি ভোরে এসো প্রভু মোর প্রাণে
এসো মোর প্রাণে, নিশি অবসানে।
১. সুখ-শয্যায় তব চরণে,
ছিলাম ঘুমে অচেতনে
তুমি হয়ে প্রহরী সারানিশি ভরি
প্রভু রক্ষা করেছ এই দীনহীনে।
২. প্রতি ভোরে তোমার করুণা
নিত্য নূতন তার নাই তুলনা
পেয়ে তোমার দয়া, আমার চিত্ত কায়া
উঠুক আনন্দে মাতিয়া গুণগানে।[৬০]

•

আমি যিশু যিশু বলে যবে ডাকি তোমায়
তুমি সাড়া দিও প্রাণে ওহে দয়াময়।
১. দিও তোমার পদপাদ্য হে মম পরামারাধ্য
শুদ্ধ হয়ে যেন চিত্ত পদ ধূলায়।
২. তোমার শ্রী-মুখোজ্যোতি দেখিতে দিও শক্তি
সন্দেহ ভীতি যেন দূরে পালায়।
৩. বায়ু বিকম্পিত নল সম এ চিত্ত চঞ্চল
দিও প্রাণে বল তোমার সেবায়।[৬১]

•

উড়াও বিজয় পতাকা জয় যীশু বলে
(আজি) মহোল্লাসে, হেসে হেসে সকলে মিলে।
১. বৈৎলেহমের আকাশে, ধর্ম-সূর্য উঠেছে
(তাঁর) জ্যোতির প্রভায়, জাগ্রত হয় জ্যোতিষী দলে।
২. পরম পিতা প্রেমময়, পাঠালেন প্রিয় তনয়

www.pathagar.com

(হবে) মহাশক্তি প্রেমপ্রীতি জগতী তলে।
৩. স্বর্গ দূতে মিলে গায়, ধন্য ধন্য দয়াময়
(এসো) দূতের সাথে প্রেমে মেতে গাহি সকলে।
৪. যিশু প্রেম অবতার, যিশু প্রেমের পারাবার
(এসো) দলাদলি সকল ভুলি, শ্রী যিশু বলে।
৫. ধন্য ঈশ-নন্দন পাপ-তাপ, হরণ
(বল) ধন্য যিশু ধন্য যিশু দুই বাহু তুলে।[৬২]

●

প্রীতি কুসুমে, ভক্তি চন্দনে, চল পুজি নব রাজারে
তৃণ শয়নে বৈৎলেহমে পাইতে সে নব ত্রাতারে।
১. দূত সবে মিলে, আকাশের কোলে দেবভাষে করে বন্দনা
শান্তি এ ভবে, প্রীতি মানবে ঊর্দ্ধলোকে ঈশ মহিমা।
২. প্রাচ্য গগণে তারা দরশনে, জ্ঞানজন তার উদ্দেশ্যে ধায়
হেম গন্ধরস, কুনদুরু সুবাস রাখিল তার দু'টি রাঙা পায়।
৩. ভাবিস কি পাপী, হয়ে অনুতাপী রাখ হৃদে উম্মানুয়েলে
অন্য কার কাছে প্রাণ নাহি আছে, জানিও নিশ্চিত ভবনে।[৬৩]

৫. মেয়েলি গীত (সাধ ভক্ষণ)

হয়ে জনম বৃথা গেলো গো বিধি আমার,
ও বিধি গো–
ঢাক ডুংখর চেগা বগা তারাই সবে সুকন সারা
কুচি বগা প্রাণে খেতে চায় রে
হয়ে, জনম জনম বৃথা গেলো গো বিধি, আমার॥
ও বিধি গো,
নাতাড়ি পাতাড়ি সাগে তিতপল্ল বেতের আগে,
সখি আমার প্রাণে খেতে চায় রে,
হয়ে জনম বৃথা গেলো গো বিধি আমার॥
ও বিধি গো,
ইলিসিয়া মাছের ডিম তাতে লাগে কাঁচা সিম
সখী আমার প্রাণে খেতে চায় রে॥
হয়ে জনম বৃথা গেলো গো বিধি আমার॥
ও বিধি গো,
ইলিসিয়া মাছের মুড়া তাতে লাগে চালির গুড়া
সখী আমার প্রাণে খেতে চায় রে॥[৬৪]

www.pathagar.com

বর বা কনের স্নান করার জল আনার গান

কালো বরণ দুটি সখি
তারা জল আনিতে
যায় গো।
এক সখি হেলে পড়ে
আরাক সখির গায় গো।

তাহা দেখে মহাদেবের মস্তক
টলে পড়ে গো,
কালো বরণ দুটি সখি তারা
জল আনিতে যায় গো॥[৬৫]

❖

যে দোকানে যায় ওলো বেহুলা
হারে সুতা খরিদ করে,
চাঁন্দের বেটা দুল পরে লখাই
আলোক ছাতি ধরে।

আর ছুঁইওনা না ছুঁইওনা লখাই
আমি ডোমের মেয়ে,
আমারে ছুঁইলে তোমার
জাত কুল মান যাবে॥

জাত মজালি কুল মজালি
মন ভুলানো মেয়ে,
ঝোলার ভিতর ভরে তোরে
লয়ে যাব দেশে॥

কিনা ছুরাত দেখছো রে লখাই
কাকের বরণ গায়,
ইহার চাইতে আলোক রে সুন্দর
কাঞ্চন নগর গায়॥
কাঞ্চন নগরে আছে,
সাহা বেনে নাম।
তাহার ঘরে আছে,
কন্যা বেহুলা সুন্দার নাম॥[৬৬]

❖

আমার বাড়ি যাবিলো বেহুলা,
আহারে শুইতে বড় সুখ
শুয়ে পড়ে দেখবি চন্দ্র সূর্যের মুখ।

www.pathagar.com

আমার বাড়ি যাবিলো বেহুলা
আহারে খাইতে বড় সুখ
মাচার তলে পোতা আচে চৌদ্দ পালিয়া দুধ॥

মনে মনে ভাবছে বেহুলা,
গোদার নাই কো ধন
মাচার তলে পোতা আছে কড়ি চৌদ্দ পোন॥[৬৭]

❖

এক গুরলে মারে রে লখাই
ডানি আর বায়ে
আরাক গুরল মারে রে লখাই
হংস পাখির গায়॥

এক গুরলে খাইয়া রে হংস,
তাক ধরিয়া রয়
আরাক গুরল খাইয়া রে হংস,
গড়াগড়ি যায়॥[৬৮]

❖

ধুলায় খেলা করো গো তুমি,
ধুলায় তোমার ঘর।
কি নাম তোমার বাপ ভাইয়ের
কি নাম তোমার॥

ধুলায় খেলা করি গো আমি,
ধুলায় আমার ঘর।
সাহা বেনের কন্যাগো আমি
বেহুলা সুন্দর॥

রাম বইছে চতুর দোলনায় রাম রে
ওই যে বেহুলা বইছে বামে
কি রাম রাজা হে।

বেহুলারও না চোখের জলে না রাম রে
ও রামে ভিজলে ছিলকাই ধুতি,
কি রাম রাজা হে॥

তুমি এত কাঁন্দন আর কাঁদ না
তুমি এত বেদন কর না
দেশে যাইয়া তোমায় দিব পঞ্চ দাসি রাম রে॥

www.pathagar.com

এতদিনে ছিল রে সিন্দুর
বেনেরও দোকানে
আজ কেন আইছো গো সিন্দুর
রাম সীতার মিলনে রাম রে।

এতদিনে ছিলেরে শাঁখা
শাঁখারুর দোকানে
আজ কেন আইছো গো শাঁখা
আলানে পালানে মিলনে রাম রে।
এত দিনে ছিলেরে দূর্বা
রাম সীতার
আজ কেন আইছো গো দূর্বা
রাম সীতার মিলনে রাম রে।[৬৯]

❖

কান্দেলো সোনা বলি সানে আছাড় খাইয়া রাম রে।
তুমি এত কাঁন্দন আর কাঁন্দ না
তুমি এত রোদন আর কর না
দেশে যাইয়া দিব পঞ্চ দাসি রাম রে।
নৌকার ঠুগুর ঠুগুর শুনি রে
বৈঠা ঝিকির মিকির দেখি রে
কাঁন্দেলো সোনা বলি সানে আছাড় খাইয়া রাম রে।[৭০]

❖

বর বরণী বর ও তুই ভালো কইরা বর
ননদ জামাই গড়ে দিবে পায়ে পাতা মল
বরণী ভালো কইরা বর।

বর বরণী বর ভালো কইর বর
ও তোর ননদ জামাই গড়ে দিবে
নাকে সোনার নথ
বরণী ভালো কইরে বর॥

বর বরণী বর ও তুই ভালো কইরে বর
ও তোর ননদ জামাই কিনে দিবে
গলায় সোনার হার
বরণী ভালো কইরে বর॥[৭১]

www.pathagar.com

৬. দেহতত্ত্ব ও মারফতি

দেহতত্ত্ব গানে দেহের রহস্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জটিল দিকগুলো প্রকাশ পেয়ে থাকে। বাহ্যদৃষ্টি দিয়ে অঙ্গ সংস্থানের ভেদ ভাঙানো একটি দুরূহ কাজ। দেহতত্ত্ব গানে এমন কিছু দিক তুলে ধরা হয়, যা সাধারণের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়। যুগে যুগে মানুষ ব্যাপক অনুসন্ধান করেও এর শেষ সিদ্ধান্ত দিতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়েও ভাববার যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গেছে। সাধকজনেরা সাধন প্রণালীতে যতটুকু অবগত হতে পেরেছেন তা সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করে ভক্ত হৃদয়ে নাড়া দেওয়া হলো দেহতত্ত্ব গানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

মারফতি গানে গূঢ়তত্ত্বের তাৎপর্য নিহিত থাকে। সাধারণ ব্যাখ্যায় এর তল স্পর্শ করা যায় না। ব্যাখ্যার অন্তরালে আরও একটি ব্যাখ্যা লুকানো থাকে তাই মারফতি। দেহতত্ত্ব ও মারফতি গানে এই অঞ্চলটি বেশ অগ্রসর। কেবল ভাবুক ও তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তরা এইসব গানের রসাস্বাদন করে থাকেন। সারিন্দা, বেহালা, দোতারা এইসব যন্ত্র মারফতি ও দেহতত্ত্ব গানকে সজীব করে তোলে। সে রকম কিছু গান উল্লেখ করা হলো–

১.

নবীর কালেমা পড় মনে মনে
ফকির হও জেনে শুনে
ফকির হওয়া বড় কষ্ট
জীবে কি তাই সকল জানে।
চার মঞ্জিলের খবর জানলে
তাইরে লোকে ফকির বলে
আলির ঘরে নয় লক্ষ ফকির
ইল্লাহ বলে জিকির ছাড়ে
ছিল সখা দিল দেখা
মা বরকত তাই সকল জানে।[৭২]

২.

যদি ধরতে চাও মাবুদ মওলা
যদি চিনতে চাও মাবুদ মওলা
খাও যাইয়া সেই এসকের পেয়ালা।
আয়নাচের দেল করি আয়না
কর যাইয়া পীরের সাধনা
আয়নাচের খেদমতে ছিল
মরনের ঔষধ রে দিল
ও ঔষধ খাইলরে মনসুর হেল্লা
ঔষধ খাওয়াইল যখন
খুলে যায় দিব্য নয়ন।[৭৩]

www.pathagar.com

৩.

যদি মন উল্টো ভাঙা যাবি
দেহ রতন করগে যতন
সে যতনে রতন পাবি।
আছে হৃদভাণ্ডারে সপ্ততালা
খুঁজে নে তার চাবি
তালা খুলে যাবি চলে
মনের মানুষ দেখতে পাবি।
নৌকা কর নিজ চালানি
সুখে কালা কাটাবি
মালের জোরে গুদাম ঘরে
গদির উপর যতন পাবি।
দাড়ি ছ'টা বিষম ল্যাঠা
সৎ পথে থাকিবি
অধম ফটিক বলে অসৎ হলে
জ্ঞান খড়গতে বলি দিবি।[৭৪]

৪.

ঘর ভাঙবে তোর আজ নহে কাল
কাল বৈশাখির ঝড়ো মেঘ
যে ঘরে তুই আছিস দিন কয়েক
ও তোর রং করা ঘর ঘুনে জ্বারা
জং ধরা লোহা পেরেক।
চৌদ্দ পোয়া চৌহদ্দি ঘরে
জুত লাগাইছে দুই খুঁটির পরে
আট কুঠরি নয় দরজা সাত তালা ঘরে
ঘরে বাস করলি তুই জনম ভরে
চিনলি না ঘরের মালেক।
সুখের নেশায় রয়েছিস বিভোর
দুই চোখে তোর মোহ ঘুমের ঘোর
নয় দরজা আটকানো নয় খোলা সকল দোর
ঘরের প্রহরী একজন মাত্র
তোর চোর জুটেছে জন ছয়েক।
জানিস না সে প্রহরী কেমন
নিয়ত সে জোগায় পরের মন
ঘরের লোক ভোগায়ে মারে স্বভাব তার এমন
তারে কেমন করে করবি শাসন

www.pathagar.com

হারায়েছিস জ্ঞান বিবেক।
মনি কাঞ্চন পরিপূর্ণ ঘর
সময় থাকতে তাহার সন্ধান কর
এ ঘর পলে উঠবে না আর দুই খুঁটির উপর
তুই পাবিরে সেই রত্নের আকর
যত্ন করার কৌশল শেখ।
গুরুর কৃপা লভিয়ে ভবে
অজানা ঘর জানবি কবে
প্রহরী হুঁশিয়ার হয়ে পাহারায় রবে
পাগল বিজয় বলে সেই দিন হবে
আত্মতত্ত্বের অভিষেক।[৭৫]

৫.

যে দেশে নাই জন্ম মৃত্যু
সেই দেশেতে কাল কাটাই
দয়াল তুমি আমার সাথে চলো
মারফতের দরবারে যাই।
সেই দেশে বাস করে যারা
আহার নিদ্রা চায় না তারা
চেতন রাখে মালেক সাঁই।
যে চিনেছে পিন রাহার ঘর
পাঞ্জেগানা তিরিশ রোজার
নাইকো অধিকার
লা-ই -লাহা ইল্লাল্লাতে
ফানা ফিল্লা হওয়া চাই।
গুটি চালা পাশা খেলা
একাকী খেলা নো যায়
খেলব বলে রূপের পাশা
তার মধ্যে এক সর্বনাশা
ওযে দেখায় ডানে মারে বায়।
ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ ব্যোম
খেলার গুটি পাঁচ রকম
ওসে ভোমে গুটি দোমে ঘুরায়।
গুরু রূপে দিয়ে আঁখি
খোটে বসে খেলা শিখি
বাছের কয় মোর বুঝতে বাকি
কোন গুটি কোন খোটে নেয়।[৭৬]

www.pathagar.com

৬.

একখানা তরীর কথা মনে পড়েছে
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম
সেও তরী গড়েছে।
সতঃ রজঃ তমঃ তিনটি গুণাগুণ আছে
এ কথা বলি দশের কাছে
সেই তরীতে তিন বেটা
এক বিটি বসত করতেছে।
বিটি যখন বাজায় কাশি
তিন বেটা নাচে
তিন বেটার আর জাতির বিচার নাই
বিটিরে দেয় গুণ টানিতে
হাল ধরে তিনটি ভাই।
রঙ্গ দেখে মরি হেসে লাজে মরে যাই
এ দুঃখ কার কাছে জানাই
ওসে ক্ষণেক হাসে রঙ্গ রসে
ক্ষণেক খায় সেই বিটির মাই।
যখন পড়ে বিপদে
ধরে সেই বিটির পদে
মা আমায় রাখ সুপথে
তোমা বিনে কেউ নাই।
বিটির মর্ম সবে কি জানে
আমি শুনেছি পুরাণে
সাধু যারা জানে তারা জ্ঞানের সন্ধানে
বোকা তুই জানবি কেমনে
সেই অষ্ট দশম ভুজং মূর্তি
সেই বিটি যায় রণে
বলব বিটির কি কথা
বিটির অপার ক্ষমতা
বিটি হয় পারের কর্তা
তাইতে গুণ টানে।[৭৭]

৭.

কত চিস বস্তু পড়ে আছে
হাজার হাজার লাখে লাখ
এই সময় তুই দেল দরিয়ায় ডুবে দেখ।
আছে তোর দেহ পোরা
দেখ মন নজর করে দূরবীণ ধরে
তুমি মুখে বলো শরিয়তি

www.pathagar.com

দেখাও নবীর অখ্যাতি
তরিক তরিক আগে দেখ।
হায়াতুল মোরসালিন জিনি
ছিলেন তিনি কোন নবীর উছিলায়
সে যে আছে মক্কা নগরে
জন্ম আব্দুল্লার ঘরে
কোন নবী গাছের পরে
ডাকছে খোদার উল্টো ডাক।
মোক্তার ফকির বলে মন
গুরুর চরণ তলে পড়ে থাক
নবীকে না চিনলে জীবন যায়
তোর হ্যাচকা টানে রোজ হাসরের মাঠে
যে তোরে করিবে পার।[৭৮]

৭ মাজারের গীত

মাজার আরবি দরগা শব্দের প্রতিশব্দ। ধাতুগত অর্থ জিয়ারতের স্থান। মানুষের রওজা বা কবর কিংবা সমাধিস্থলও বলা হয়।

জেলার সদর উপজেলা, কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলায় রয়েছে অনেকগুলো মাজার। এসব মাজার গড়ে উঠেছে স্থানীয় ফকির-দরবেশদের স্মৃতি রক্ষার্থে। শুধু ফকির দরবেশই নয়, সুফীবাদে বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ কোনো কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় করেই তার আস্তানায় মাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাজারকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকবিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে। এরা ধর্মপ্রাণ, ইসলামের আকিদায় প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করে। তারপরেও এরা মাজারে যায়, মাজারের খাদেমদার এবং যার নামে মাজার তাঁকে বিশ্বাস করে। শুধু তাই নয়, মাজারের নিয়মকানুনগুলো মেনে চলে।

এসব মাজারে বার্ষিক উরশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ভক্তরা তাঁদের মানত নিয়ে উপস্থিত হন। কোনো কোনো মাজারে ৩ দিন কিংবা ৫ দিন পর্যন্ত উরশ চলে। ঐ সময় মাজারে আয়োজন করা হয় গানের। একতারা ও হারমোনিয়াম বাজিয়ে ভক্তরা গান পরিবেশন করেন। সাধারণত মারফতি, মুর্শিদি এবং হাসনরাজা ও লালন সাঁই'র গান পরিবেশন করা হয়। কোনো কোনো মাজারে বায়না করে আনা হয় গানের দল। তারা রাতভর পয়ার বা বিচার গান পরিবেশন করেন। এসব গানে বলা হয় সৃষ্টিকর্তার কথা, মাজারের গুরুর কথা, সর্বোপরি মানুষ তথা মানবতার কথা। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মাজারের গীত বা গান শোনেন। গ্রামবাংলায় মাজারের গীত বহুল প্রচারিত।
মাজারের একটি গীত এরকম–

আমি হলাম জনম কানা
আর হলো না কিছুই জানা
জীবন গেলো, বুঝলাম না তোমার ভাও।
গুরু আমার পথ বাতলাইয়া দাও
পড়ে আছি পথের পাশে আমার তুমি নাও।[৭৯]

www.pathagar.com

৮ গাজীর গান

লোকসাহিত্যের প্রধান উৎস লোকসংস্কৃতি। লোকজীবনের আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডকে ধারণ করেই প্রাচীন রীতি-নীতিগুলো এখনও টিকে আছে। গাজীর গীত গোপালগঞ্জ জেলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। গাজীর গীত আমাদের পুথিসাহিত্য থেকে উৎসারিত। আঠার শতকে মুসলমানদের একমাত্র পাঠ্য ছিল পুথি সাহিত্য। এসময়ই পুথি লেখকের আবির্ভাব। আর এ সময়ই লেখা হয় আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী, গাজীকালু ও চম্পাবতী, ছয়ফুলমুলক বদিউজ্জামান, জঙ্গনামা, লায়লী মজনু, আমীর হামজা, ইউসুফ জোলেখা, হানিফার লড়াই, গুলে বাকওয়ালী, বানেছা পরীর কিচ্ছা প্রভৃতি।

এসব পুথিকাব্য যাঁরা লেখেন, তাঁরা হলেন : শাহ গরীবুল্লা, আব্দুল হাকিম, হেয়াৎ মামুদ, আবদুর রহীম, নওজীস খাঁ, আব্দুল নবী, মোহাম্মদ খান, মুনশী আমিরুল প্রমুখ। এসব পুথি সাধারণ পাঠক সমাজে ভীষণ সমাদৃত ছিলো। সুর করে পুথি পাঠ করা হতো মজলিশে। অনেকে বিশ্বাস করতেন পুথির কাহিনি সত্য। পুথির প্রধান প্রধান চরিত্রগুলোর আছে অলৌকিক ক্ষমতা।

গাজীকালু ও চম্পাবতী কন্যার পুথি রচনা করেন লোককবি আবদুর রহীম। তিনি বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার গলাচিপা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গলাচিপা গ্রামের উত্তর পশ্চিমে আশুত্যা বাজার আর দক্ষিণে বয়ে গেছে সুসন্ধা নদী। লোককবি আব্দুর রহীম বিরচিত গাজীকালু ও চম্পাবতী কন্যার পুথি গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে এক সময় বিষাদ সিন্ধুর মতো সুর করে পড়া হতো। এই পুথিটির আখ্যানভাগ মর্মস্পর্শী। পয়ার, ত্রিপদী ও ধুয়াগানে কাহিনি নির্মাণ করা হয়েছে। কাহিনির মূল চরিত্রে গাজী, গাজীর ভাই কালু, ব্রাহ্মণ নগরের রাজকন্যা চম্পা, চম্পার বাবা মুকুটরাজা ও ব্যঘ্রকুল। গাজীকালুর সহচর ব্যঘ্র। তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী একটি বস্তু 'আশা' চালান দিতে পারতেন। বিপদে আপদে বাঘ ও আশা ব্যবহার করতেন। এটি গাজী ও চম্পার প্রেমকাহিনি হলেও গাজীকে চম্পার জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে। আব্দুর রহীমের বর্ণনায় সাম্প্রদায়িকতা বর্তমান। তা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান সমাজে এই পুথিখানি আজো সমাদৃত। গাজীর গীত এই পুথিখানিকে আশ্রয় করে। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতো কোনো বাড়িতে গাওয়া হলে মানুষের কল্যাণ হবে। অনেকে মানত করতো সন্তান ধারণের, অনেকে মানত করতো ঘরে রোগব্যাধি দূর করার জন্য। গাজী কালু ও চম্পাবতীকে নিয়ে রচিত এই পুথির প্রতিটি পদ অনুসরণ করেই গাজীর গীত পরিবেশন করা হতো। পুথিপাঠ নয়, মূলপুথির কাহিনি কখনও সংলাপের মাধ্যমে আসরে বলা হতো। পুথিতে উল্লেখিত গানগুলো যথাযথভাবে গাওয়া হতো বা এখনও হয়।

গাজী কালুর আশার কেরামতি এবং মানুষ খেকো বাঘকে বশীভূত রেখে সংকট থেকে নিস্তার পাওয়া এক অলৌকিক ব্যাপারই বটে। সাধারণ মানুষ এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে গাজীর গীত মানত করতো বা করে থাকে। গীত পরিবেশনে দলের প্রধান মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তার সঙ্গী-সাথীরা গান পরিবেশন ও সংলাপে অংশ নেন। গোপালগঞ্জ জেলার সর্বত্র গাজীর গীত অনুষ্ঠিত হয়।[৮০]

www.pathagar.com

গাজীর গীতের নমুনা

পয়ার

প্রথমে বন্দিনু প্রভু সৃচি নিরাঞ্জন॥
এতদিন ভুনতে যত তাহার সৃজন
সৃজিয়া সকল জীবে আহার যোগায়॥
দুঃখ সুখ মৃত্যু রোগ তাহার আজ্ঞায়
মৃত্তিকা গগনোহি তার সমতুল॥
পুজিবার যোগ্য সেই সকলের মূল
তাহার বর্ণনা করি কিবা শক্তি মোর॥
পতিত পাবন সেই করুণা সাগর
মহা ২ পাপী কত আমার সমান॥
কৃপা করি উদ্ধারিয়া স্বর্গে দিবে স্থান
তাহার পরম সখা নবী মোস্তফার॥
লক্ষ কোটি সালাম দুরূদ পরে তার
সখা সঙ্গী যত তার আছে ভার্য্যাগণ॥
নবী বংশের যত আর হইল উৎপন
সবাকারে কোটি ২ সালাম আমার॥
সদয় রুহুক প্রভু উপরে তেনার॥

কাহিনি আরম্ভ

ত্রিপদী

বৈরাট নগরে ধাম, শাহা সেকান্দর নাম,
রূপ যিনি পূর্ণ শশধর॥
অতিশয় চমৎকার,
নগরের শোভা তার,
স্বর্গ তুল্য দেখিতে সুন্দর
ধনেতে কারূণ যিনি,
ছিল শাহা হেন ধনি,
দাতা ছিল হাতেম সমান॥
রোস্তম হারিবে আর,
শক্তি হেন ছিল তার,
হারিবেক শাম নুরিমান
সমরের সেনা তত,
আকাশের তারা যত,
গণিবার সাধ্য নাহি কার॥
কর দিত হবে সবে মিলে,
কত রাজা মণ্ডলে,
তবে ছিল ভাবত সংসার,
কহিলেন যবনেরে,

www.pathagar.com

বলি রাজা দর্প করে,
রাজকর না দিব কখন॥
লইতে বলির কর,
তবে শাহা সেকান্দর,
চলে গেলো তাহার ভবন॥
অনেক যুদ্ধ করিয়া,
বলি রাজা ক্রোধ হৈয়া,
শেষ রাজা হারিল সমরে॥
সেকান্দর শাহার পায়,
হারিয়া সে বলি যায়,
গলে বসন বান্ধিয়া সে পরে॥
ছিল তার অতি ধন্যা,
অজুপা নামিনী কন্যা,
সেকান্দর হাতে সুপে দিল॥
অজুপারে দীন পড়ে,
তবে শাহা সেকান্দরে,
আনিয়া সে বিবাহ করিল॥
পাতালেতে গেলো চলি,
কন্যা দিয়া রাজা বলি,
বৈরাটেতে রহে সেকান্দর॥
অজুপা সীতার ঘরে,
তবে কিছু-দিন পরে,
হইল এক সুপুত্র সুন্দর॥

পয়ার

বৈরাট নগরে ঘর শাহা সেকান্দর
অজুপা তাহার পত্নী অতি মনোহর॥
হইল সন্তান এক অজুপার ঘরে
চাঁদের সমান রূপ ঝলমল করে॥
রূপেতে হইল আলো সমস্ত ভু
রাখিল তাহার নাম জুলহাস সুজন॥
দিনে ২ সেই পুত্র বাড়িতে লাগিল
দ্বাদশ অব্দের যবে বয়েস হইল॥
একদিন চলিলেন করিতে শিকার
লইয়া অনেক লোক সাথে আপনার॥
হইলেন উপস্থিত এক কাননেতে
কাননের মধ্যে মৃগ খুঁজে সকলেতে॥
হঠাৎ হরিণ এক উঠে দৌড় দিল

www.pathagar.com

ভুপের নন্দন তার পশ্চাতে চলিল॥
মায়ার হরিণ সেই কি করে তখন
একটি সুরঙ্গ দিয়া করিল গমন॥
দেখিয়া নৃপের পুত না পারে থাকিতে
সুরঙ্গের পরে চলে হরিণ মারিতে॥
এখানেতে লোক সবে না দেখে তাহায়
কাননে ২ তারা খুঁজিয়া বেড়ায়॥
অনেক খুঁজিল নাহি পাইল দরশন
আক্ষেপ করিয়া সবে চলিল তখন॥
সুরঙ্গেতে গিয়া সেথা সেকান্দর সুতে
দেখে হেন অন্ধকার রজনী হইতে॥
এদিক ওদিক কিছু দেখিতে না পায়
বিপাকে পড়িয়া যুবা করে হায় ২॥
পায়ের ঠাহরে তবে চলিতে লাগিল
এগার কোসের পথ চলে যদি গেলো॥
চক্ষু মেলি দেখে এক সুন্দর শহর
সুবর্ণের অট্টালিকা সুবর্ণের ঘর॥
সুবর্ণের বৃক্ষ আর সুবর্ণের ফুল
সোনার কোকিল কাজ ভঙ্গ বুলবুল॥
কীটপতঙ্গ যত আদি সকলি সোনার
স্বর্গের সমান পরী দেখিতে বাহার॥
দেখিয়া সে জুলহাস আশ্চর্য হইয়া
ধীরে ২ পুরি মধ্যে প্রবেশিল গিয়া॥
জঙ্গ বাহাদুর নাম সে দেশি রাজার
পুত্রের সমান করে পালন প্রজার॥
সেকান্দরের সুত সে অতিথের মতে
উপস্থিত হৈল গিয়া রাজার বাটীতে॥
দেখিয়া তাহার রূপ সেই রাজ্যেশ্বর
অজ্ঞান হইয়া পড়ে পালঙ্গ উপর॥
কতক্ষণ পরে রাজা চেতন পাইয়া
জিজ্ঞাসিল জুলহাসে কোলে বসাইয়া॥
কি নাম তোমার বাছা ঘর কোথা হয়
কেবা তোর মাতা পিতা দেহ পরিচয়॥
জুলহাস বলেন শুন পরিচয় মোর
বৈরাট নগরে ঘর পিতা সেকান্দর॥
অজুপা সুশীলা হয় আমার জননী
মা বাপের দুলাল আমি মায়ের পরাণী॥

www.pathagar.com

আমি বিনে পুত্র কন্যা কেহ নাহি আর
মরিবেন মাতা পিতা শোকেতে আমার॥
জঙ্গ রাজা বলে বাছা শান্ত কর মন
আমার রাজ্যতি এই জানিবে আপন॥
এক কন্যা বিনে মোর আর কেহ নাই
তাহাকে বিবাহ করি থাক এই ঠাঁই॥
এস রাজত্ব আমি তোমাকে শুপিব
তোমাকে রাজত্ব দিয়া তীর্থে চলি যাব॥
তব যোগ্য কন্যা সেই পরমা সুন্দরী
পাঁচ তোলা নাম তার যিনি হুর পরী॥
শুনিয়া বৈরাট রাজা স্বীকার করিল
শুভ দিনে বিয়া তবে জঙ্গ রাজা দিল॥
পাইয়া সুন্দর কন্যা জুলহাস সুজন
রহিলেন মাতা পিতা হইয়া বিস্মরণ॥
এখানেতে লোক সবে অনেক খুঁজিয়া
সেকান্দর শাহা কাছে কহিল আসিয়া॥
অদৃশ্য হইয়া গেছে তোমার নন্দন
খুঁজিনু অনেক মোরা না হইল দরশন॥
শুনা মাত্র সেকান্দর মুন্তে হাত দিয়া
অজ্ঞান হইয়া ভুমে পড়িল ঢলিয়া॥
পুত্র ২ বলি শাহা কাঁন্দে উচ্চস্বরে
হাহাকার শব্দ হইল বৈরাট নগরে॥
অজুপা সুন্দরী কাঁন্দে লুটিয়া ধুলায়
দাস দাসী সবে কাঁন্দে করে হায় ২॥
আসিয়া জ্যোতিষগণ গণিয়া তখন
কহিলেন সবাকারে শান্ত কর মন॥
জীবমানে আছে পুত্র পাতাল নগরে
জঙ্গ রাজ নামে তার কন্যা বিয়া কৈরে॥
কিছু কাল পরে পুনঃ পাইবা তাহায়
তবে সবে কহিলেন ভাবিয়া খোদার মনে ২॥
কাঁন্দে রানি হইয়া আকুল
আহা পুত্র সদা কাল মুখে এই বোল॥
একদিন কেঁদে নাথ কাছে কয়
সাগর দেখিব মোর মনে ইচ্ছা লয়॥
না পারি থাকিতে আর গৃহেতে বসিয়া

www.pathagar.com

শুনিয়া দিলেন শাহা সওয়ারী করিয়া॥
মাহাফায় আরোহিয়া গিয়া সে সাগরে
জলের তরঙ্গ দেখে হরিষ অন্তরে॥
ইতিমধ্যে দেখে এক সিন্দুক কাঠের
আসিয়া লাগিল সে কূলতে ঘাটের॥
দাসীগণে আজ্ঞা দিল অজুপা সুন্দরী
সিন্দুক উঠায়ে মোরে দেহ শীঘ্র করি॥
যেই দাসী যায় সেই সিন্দুক ধরিতে
সিন্দুক ভাসিয়া যায় মধ্য সাগরেতে॥
একে ২ সব দাসী ফিরিয়া আসিল
অজুপা সুন্দরী তবে পশ্চাতে চলিল॥
জলেতে নামিয়া সখী হাত বাড়াইতে
আসিল সিন্দুক সেই অজুপার হাতে॥
তখনি খুলিয়া দেখে সিন্দুক ভিতর
ছয় মাসের শিশু এক পরম সুন্দর॥
কোলেতে লইয়া শিশু অজুপা সুন্দরী,
ঘরেতে আসিয়া দ্রুত পালে যত্ন করি॥
দিনে ২ শিশু সেই বাড়িতে লাগিল
কালু বলিয়া নাম অজুপা রাখিল॥
মাতা পিতা কোথা তার নির্ণয় না জানি
অজুপার শূন্য পুত্র এই মাত্র শুনি॥
আব্দুর রহীম বলে মধুর পাচালি
গাজীর জনম কথা শুন সবে বলি॥

গাজীর জন্মের বিবরণ ও ফকির হইয়া যাওয়া

পয়ার করিয়া ঋতুর স্নান অজুপা যুবতী
আপন পতির সঙ্গে করিলেন রতি॥
সেই রাত্রে স্বপ্ন এই অজুপা দেখিয়া
আকাশে চন্দ্র আসি পেটে সান্ধাইল॥
স্বপ্ন দেখিয়া সতী উঠিল কাঁপিয়া
জিজ্ঞাসিল মহিপাল বুকে হাত দিয়া॥
কি কারণ কাঁপ প্রিয়া কহ বিবরণ
রানি বলে শুন প্রভু মোর নিবেদন॥
উদরেতে গগণের চাঁদ প্রবেশিল
স্বপ্ন দেখিয়া প্রাণ কাঁপিতে লাগিল॥
সেকান্দর বলে সতী না বলিও কারে
জন্মিবেক সু-সন্তান তোমার উদরে॥
শুনিয়া হরিষ অতি অজুপা সুন্দরী

www.pathagar.com

করেন খোদার স্তব দিবা ও সর্ব্বরী॥
একমাস দুই মাস তিন মাস গেলো
চারি মাসে রক্ত বীজ মিলে মাংস হইল॥
পঞ্চম মাসেতে মূর্তি জন্মিল মাংসতে
খোদার আজ্ঞায় প্রাণ প্রবেশিল তাতো॥
পরেতে লিখিল প্রভু ললাটে তাহার
আয়ু মৃত্যু ভক্ষ্য ভিত দুঃখ সুখ তার॥
যতেক লিখিল আর কৈলে পুথি বাড়ে
আশ্চর্য খোদার কাজ দেখ চিন্তা করে
দিনে ২ শিশু সেই বাড়ে গর্ভ পুরি
সপ্তম মাসেতে সতী অজুপা সুন্দরী॥
নানা ইতি মিষ্টি দ্রব্য করেন ভক্ষণ
মিষ্টি দ্রব্য আস্বাদান লাগে কি কখন॥
ঘন ২ হাই আর মুখে উঠে জল
খাইতে অধিক সাধ ঠিকরি অম্বল॥

৯. কর্মসংগীত

কর্মে নিয়োজিত থেকে কিংবা কর্মকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার জন্য যে সংগীত গাওয়া হয় বা গাওয়ানো হয়, তাকে আমরা কর্মসংগীত বলে থাকি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সংগীতকে শ্রমসংগীতও বলা হয়। গ্রামবাংলায় কৃষি শ্রমিকের অভাব নেই। এরা মাঠে কাজ করে, তাদের নদীবিধৌত এলাকায় নৌকার চালকরাও শ্রম বিকায়। এরাও এক অর্থে শ্রমিক। এরা কর্মে থেকে কখনও কখনও কাজ করার সময় মনের আনন্দে গান গেয়ে ওঠেন। সাধারণ মানুষের এই বিনোদনটি চিরায়ত রূপ পেয়েছে।

ছাদ পেটানো গানকেও আমরা কর্মসংগীত বলে থাকি। সেকালে কোনো ইমারত তৈরি হলে অর্থাৎ ইট-পাথরের দালান তৈরি করা হলে ছাদে ইট, সুরকি ঢালাইয়ের পর শ্রমিকেরা হাতের মুগুর দিয়ে ছাদ মজবুত করার জন্য পেটাতো। অধিকারি বা সরকার আনা হতো গান গাওয়ার জন্য। ঐ অধিকারি বা সরকার যেকোনো গান পরিবেশন করতে পারেন না। ছাদ পেটানোর নির্ধারিত গান পরিবেশন করতে হয়। কারণ, শ্রমিকগণ হাতের মুগুর তালে তালে ছাদে পেটান। তাই সরকার বা অধিকারকে তাল লয় নির্ধারণ করেই গান পরিবেশন করতে হয়। হাল আমলে এখন আর ছাদ তৈরি করতে ছাদ পেটানো গান শোনা যায় না। আধুনিক প্রযুক্তি প্রাচীন নিয়ম-রীতিকে ভেঙে দিয়েছে।

কিন্তু শ্রমিকের মুখে এখনও কর্মসংগীত শোনা যায়। কৃষি শ্রমিক, মাল্লা শ্রমিক এমনকি একজন রাখালও তার শ্রম বিনিময়ের কালে অজান্তে গেয়ে ওঠেন গান। সে গান নানা প্রকারের হতে পারে। তবে গ্রাম-গঞ্জের এসব শ্রমিকেরা সাধারণত লোকসংগীত গেয়ে থাকেন। কখনও কখনও বহুল প্রচারিত গান তাদের কণ্ঠে শোনা যায়। এখানে একটি গানের নমুনা দিচ্ছি–

www.pathagar.com

আমরা ফসল ফলাই
মুগ, মুসুরি কলাই
মাঠে মাঠে করি কাজ।
আউশ, আমনে ভরি গোলা
পুলকে দখিন দুয়ার খোলা
কাটে সকাল সন্ধ্যা সাঁঝ।

১০. রয়ানী গান

রয়ানী একটি আঞ্চলিক শব্দ। এই শব্দটি বৃহত্তর বরিশাল, গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নড়াইল ও বিক্রমপুর এলাকার পল্লি গাঁয়ের সাধারণ মানুষের কাছে খুব পরিচিত। রয়ানী বললেই এসব এলাকার মানুষজন বোঝে মনসামঙ্গলের গান অর্থাৎ বেউল্যা–লখিন্দরের গীত।

গোপালগঞ্জের লোকসংস্কৃতিতে রয়ানীর একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। গোপালগঞ্জ হিন্দু প্রধান এলাকা হলেও মুসলমান সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে সাপের দেবী মনসা খুবই পরিচিত এবং বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি গত পাঁচশো বছর ধরে লোক সমাজের মনোরঞ্জন করে আসছে।

বেহুলা লখিন্দরের গান বা কাহিনি মনসা মঙ্গল কাব্য বিধৃত। মধ্যযুগে নারায়ণ দেব, কানাহরি দত্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজবংশী দাস ও বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কবি বিজয়গুপ্তের জন্ম তারিখ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেছেন ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দের কিছু পূর্বে কিংবা ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল জেলার আগৈলঝারা উপজেলাধীন ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থটির নাম পদ্মাপুরাণ। পদ্মাপুরাণে মনসার আবির্ভাব, মনসা পূজার প্রচলন এবং চাঁদ সওদাগরের ছেলে লখিন্দরের সাথে বেহুলার বিয়ে এবং বাসররাতে লখিন্দরকে সাপের দংশন ও বেহুলার স্বামীকে জিইয়ে আনার অপূর্ব কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনির সারমর্ম হলো সাপের দেবী মনসার নামে পূজা প্রচলন। সেকালে সাপের দংশন মানে মানুষের মৃত্যু। এই মৃত্যু ভয়ের কারণেই সাধারণ মানুষ কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যগান প্রচারের সাথে সাথে ঐসব এলাকায় পূজার প্রচলন শুরু হয়। কবি বিজয়গুপ্ত স্বপ্নে মনসার আদিষ্ট হয়ে পদ্মাপুরাণ রচনা করেন এবং দল গঠন করে গ্রামে গ্রামে গান পরিবেশন করেন। তাঁর দলের নামকরণ করা হয় রয়ানীর দল। এই রয়ানীর দল পনের শতক থেকে আঠার শতক পর্যন্ত লিখিত পুথি অনুসরণ করে কখনও মুখস্ত পুথি গানের সুরে পরিবেশন করে টিকিয়ে রাখে। পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ প্রকাশের পূর্বেই বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে মনসাপূজা, মনসা মন্দির নির্মাণ ও মনসা মানত এবং বয়ানী গান ব্যাপকভাবে প্রচলন হয়।

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ বরিশাল থেকে প্রথম পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত হয়। লোকজসংস্কৃতির উৎস হলো লোকবিশ্বাস বা লোকাচরণ। গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতো মনসা

www.pathagar.com

মন্দিরে মনসার বাহন সাপকে দুধ কলা প্রদান করলে, দেবী তুষ্ট থাকবেন, পুজো দিলে সাপে কখনও দংশন করবে না। সেই সর্পভীতি থেকেই আবার রয়ানী গান শ্রবণ করলে মনসা দেবী সাপের কবল থেকে পূজকদের রক্ষা করেন এবং ধনমান ঐশ্বর্য সম্পদ বৃদ্ধি করবেন।

এভাবেই লোকবিশ্বাসে রয়ানী আজও হিন্দু ও মুসলিম সমাজে সমাদৃত। তবে রয়ানী গানের আয়োজক হিন্দু সম্প্রদায়। দুধকলা মানত একসময় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। রয়ানী গোপালগঞ্জ জেলায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলো, যা আজও বিদ্যমান। এর কারণ কবি বিজয়গুপ্তের ৫০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত মূল মনসা মন্দির থেকে গোপালগঞ্জ জেলার পশ্চিমসীমানা মাত্র ৬ মাইল দূরে।

গোপালগঞ্জের পূর্ব সীমানায় কোটালীপাড়া উপজেলা অবস্থিত। এখানে রয়েছে বেশকিছু মনসা মন্দির। এই উপজেলার গচাপাড়া গ্রামের মনসা বাড়ি প্রসিদ্ধ জায়গা। এখানে গড়ে উঠেছিলো একটি বিরাট পাকা মন্দির।

শ্রাবণ মাসের শেষ দিন মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন থেকেই রয়ানী গানের শুরু। শুধু বেউল্যা–লখিন্দরের কাহিনি বা পালা শোনার জন্যই নয়, সাপের উপদ্রব, স্বপ্নে সর্প দেখা, বিত্ত-বেসাতের উন্নতি ও নবদম্পতির সুখী জীবন কামনায় রয়ানী গানের মানত করে গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং ওই শ্রাবণ মাসের শেষ দিন থেকে শুরু হয় রয়ানী গান। রয়ানী দলের সরকারই প্রধান। আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি পদ্মাপুরাণের হুবহু পদ নিচু কণ্ঠে গায়েনদের বলে দেন। গায়েনরা দুই ভাগে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে গানের পদ, তাল-লয়-সুর সহকারে পরিবেশন করেন। গায়েনরা নারী পুরুষ হয়ে থাকে। নারী গায়েনদের হাতে থাকে চামর।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, গায়েনরা কখনও গান পরিবেশনে পদ, সুর-তাল-লয় পরিবর্তন করতে সাহস পায় না। তারা মনে করেন পদ্মাপুরাণ বিজয়গুপ্তের লেখা পবিত্রগ্রন্থ। একারণেই ৫০০ বছর আগে লেখা পয়ার ও লাচারীর পদগুলো সঠিকভাবে পরিবেশন করতে হয়। এ কারণে গায়েনদের খুবই কষ্ট হয়। আবার পরিবেশনকালে কখনও কখনও মানতকারীকে গায়েনদের সাথে আসরে অভিনয় করতে হয়। এমনিতেই বেউল্যা লখিন্দরের কাহিনি মর্মান্তিক। শ্বশুরের ময়ূরপঙ্খি সাতটি নৌকা জলে ডোবানোর বাসররাতে স্বামীর মৃত্যু এবং বেউল্যাকে সতী সাবিত্রী থেকে দেবতারে তুষ্টি করে স্বামীকে জিইয়ে আনাসহ নানা ঘটনা সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে প্রচণ্ড দাগ কাটে। তার সবকিছুর মূলে একচক্ষু কানা দেবী মনসার পূজার নামে ষড়যন্ত্র। তবুও রয়ানী গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতিতে টিকে আছে। লোকবিশ্বাসই রয়ানীর আশ্রয়।

বিজয়গুপ্তের রয়ানীর কিছু গীত অংশ

লখিন্দরকে দংশন

বিষেতে ব্যাপিল কালী পূর্ণিত বিকট।
বজ্রফণা ধরি যায় লখাইর নিকট॥
মনে মনে চিন্তে কালী কি হবে উপায়।
অশুভের চিহ্ন নাই লখিন্দরের গায়॥

www.pathagar.com

কালীর কথা শুনি হইল দৈববাণী।
বাসরে থাকিয়া তাহা শুনিলেক নাগিণী॥
প্রদীপের তৈল মাখি, ললাটেতে দেও দেখি,
তবে লক্ষ্মী ছাড়িবে উহার।
শুনিয়া আকাশ বাণী, বিষাদিত নাগিণী,
দীপ তেল দিল লখাইর গায়।
লোহার বাসর ঘরে, নাগিণী শিয়রে,
সানন্দে বিজয়গুপ্ত গায়॥

-::-

মনে বিষাদভাবে মোর কি হইল।
আপনার অঙ্গে মাখে প্রদীপের তৈল॥
শরীরের অশুভ চিহ্ন ততক্ষণে হইল।
লখাইর আঙ্গুলে মাখায় প্রদীপের তৈল॥
ডান ধারে হইতে নাগিণী বাম দিকে যায়।
লখিন্দরের চরণ পড়ে কালীনাগের গায়॥
নাগ বলে ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমরা হও সাক্ষী।
চান্দ বানিয়ার পুত্র কেন মোরে মারে লাথি॥
এবার সহিলাম আমি ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া।
আবার পড়িলে চরণ যাইব দংশিয়া।
বিধির নিয়ম কভু খণ্ডান না যায়।
আর বার পড়ে চরণ নাগিণীর গায়॥
এবার এড়িলাম আমি সুন্দর দেখিয়া।
আরবার পড়িলে চরণ যাইব দংশিয়া।
শিয়র হইতে নাগিণী পৈথানেতে (১) যায়।
আরবার চরণ পড়ে নাগিণীর গায়॥
দয়াভারে নাগিণী বুজিল দুই আঁখি।
মনে মনে নাগিণী দেবতা করে সাক্ষী॥
যোড়হস্তে বলে নাগ শুনহ গোসাঞি।
পদ্মার বোলে কামড়াই মোর দোষ নাই॥
এতেক বলিয়া মনে করে ধরফড়।
কেনুয়া আঙুলে মারে বজ্র কামড়।
কামড় লইয়া কালী বলে বিষ বিষ।
ঘা মুখে ওলাইল কালকুট বিষ॥
বজ্র সমান যেন নাগিণীর ঘাও॥
উহু উহু করিয়া লখাই ঝাটে তোলে গাও॥
ঘায়ের বেদনায় লখাই চারিদিকে চায়।
আঙুলে কামড় দিয়া নাগিণী পলায়॥

www.pathagar.com

সত্বর পলায় কালী ভয়ে প্রাণ ফাটে।
ধর ধর বলি লখাই ধড়ফড়ি উঠে॥
পবনের গতি হেন নাগিণীর তেজ।
সত্বর বাহিরে গেলো ঘর রহিল লেজ॥
লেজ ধরিয়া লখাই করে টানাটানি।
ধরিয়া রাখিতে নারে প্রখর নাগিণী॥
রাখিতে না পার নাগ পলাইল ঝাটে।
নরসিং কাটারি দিয়া নাগিণীর লেজ কাটে॥
অষ্ট আঙ্গুলে লেজ কাটিয়া রাখিল।
সত্বর গমনে কালী পদ্মার স্থানে গেলো।
লেজ কাটা গেলো কালী বড় পাইল ব্যথা।
পদ্মার গোচরে গিয়া কহে সকল কথা॥
যোড়হস্তে কহে কথা পদ্মার গোচর।
তোমার প্রসাদে মাতা দংশি লখিন্দর॥
অপমান করে মোরে সুন্দর লখাই।
কাটিয়া রাখিল লেজ শুন দেবী আই॥
চান্দর যে বংশনাশ করিলাম ভালো মতে।
নাগিণী চলিয়া গেলো আপন পুরীতে।
ঘায়ে ব্যাকুল লখাই করে ধড়ফড়।
বেহুলার পৃষ্ঠেতে মারে বজ্র চাপড়॥
নিদ্রায় আকুল বেহুলা নাহিক চেতন।
উঠ উঠ বলে লখাই ডাকে ঘনে ঘন॥
চক্ষুতে জল দিয়া নখে মাংস বিন্ধে।
তবু নাহি জাগে বেহুলা অচেতন নিন্দে॥
উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়া ঝাটে তোল গাও।
বিজয়গুপ্তেরে রাখ বিষহরি মাও॥

লখিন্দরের বিলাপ

ওগো বেহুলা তোমার অঞ্চলের নিধি নিল চোরে,
কত নিদ্রা দাও গো সুন্দরী। (ধুয়া)
আজু বিয়া হৈল রাতি, না চিনিলা নিজ পতি,
নাগিণী দংশিয়া গেলো মোরে।
যদি জানিতাম সাচে, এতেক নির্ব্বন্ধ আছে,
বিয়ার রাত্রে সাপে খাবে মোরে॥
এক দিবসের লাগি, তোমার বধের ভাগী,
এই পাপে নরকে বিভোগ।
না জানিয়া হইল কি, উঠ প্রিয়ে চন্দ্রমুখী,

www.pathagar.com

বিয়ার রাত্রে সর্পাঘাত যোগ।

তুমিত বড়র ঝী, তোমাকে বলিব কি,
এ তোমার কেমন সাহস।
যার পতি সর্পে খায়, সে কেমনে নিদ্রা যায়,
নারীর রাখিল অপযশ॥

হাতে নরসিং কাতি, মিছা সে জাগিলা রাতি,
কোনো কার্য্যে এতেক প্রহরী।
জাগিয়া এতেক জন, রাখিতে নারিলা ধন,
প্রভাতে নাগিণী করে চুরি।

মরণে নাহিক ভয়, জন্মিলে মরণ হয়,
বিধির নির্ব্বন্ধ নহে আন।
এও সে রহিল দুঃখ, না দেখিলাম মায়ের মুখ,
তোমার সঙ্গে না হৈল আলাপন॥
দংশিল দারুণ নাগে, গারুড়িয়া কেবা জাগে,
কুটুম্ব ব্যথিত জাগে কে।
কালনিদ্রা পরিহর, জাগিয়া জিজ্ঞাসা কর,
আমারে জিয়াইতে পারে কে।

নিদ্রালী লাগিয়া গায়, সুখে বেহুলা নিদ্রা যায়
নাহি শুনে লখাইর করুণ।
পদ্মাবতী দরশনে, সানান্দে বিজয় ভণে,
লোক বলে মনসা দারুণ॥

-::-

বাসরেরত লখিন্দর প্রাণ নহে স্থির।
কালবিষের ঘায় পোড়ায় শরীর॥
কালনাগিণীর বিষে পোড়ে সর্ব্ব গা।
অন্তকালে না দেখিলাম বাপ আর মা॥
বেহুলা সুন্দরী হয় সাহের কুমারী।
কারে সমর্পিয়া আমি যাব হেন নারী॥
এইরূপে বেহুলার জন্ম গেলো ছারখার।
সংসারের সুখভোগ না করিল আর॥
চান্দ হেন বাপ মোর সোনা হেন মাই।
তাহাকে ত্যাজিয়া আমি যমপুরে যাই॥
বাহিরে যাইতে লোহার ঘরে পথ থাকে।

www.pathagar.com

লড় দিয়া বাহিরে যাই দেখুক সর্ব্বলোকে।
প্রাণশক্তি বিপরীত ডাকি রাত্রিভাগে।
হেন বুঝি কোন জন নিদ্রে নাহি জাগে॥
তব সঙ্গে সঙ্গে নৈল মনে রইল দুঃখ।
মৃত্যুকালে না দেখিলাম জননীর মুখ॥
নাগিণীর বিষজ্বালে করয়ে কাকুতি।
অঙ্গুলি ছাইয়া বিষ ধরিলেক ছাতি॥
কার প্রাণ স্থির হয় পদ্মার নারীকলা।
কতক্ষণ পরেতে বিষেতে ছাইল গলা॥

-::-

আমার মনের দুঃখ মনে রহিলরে। (ধুয়া)
কারে দিয়া যাব আমি চম্পক নগরী।
কারে দিয়া যাব আমি বেহুলা সুন্দরী॥
মনের মানস মোর না হৈল অবসান।
যাহার সঙ্গে দেখা নাই হৈল বিদরে প্রাণ॥
বাপে তোলাইল ঘর লোহার বাসর।
নির্ব্বন্ধ মরণ হইল তাহার ভিতর॥
সদাগর না দেখিলাম যত বন্ধুজন।
অন্তিমকালে না দেখিলাম মায়ের চরণ॥
আহা মাতা সোনেকার গুণের অন্ত নাই।
মা বলিয়া ডাকে আর এমন লক্ষ্য নাই॥
ছয় ভাইর শোকে মায়ের সদা তনু পোড়ে।
আমি বিনে জননী কেমনে রবে ঘরে॥
চক্ষু ওষ্ঠ ধরিলেক নাহি বোল চাল।
লড় বড় করে গলা মুখে পড়ে লাল॥
নিদ্রিত হইল চক্ষু তণু জর জর।
কপাট লাগিল দন্ত করে কড় মড়॥
ব্রহ্মারন্ধ্র ধরিল জীবন নাহি আর।
উত্তরশিয়রী পড়ে চান্দর কুমার।
লোহার ঘরে ঢলিয়া পড়িল লখিন্দর।
প্রাণ কাঁন্দি লইয়া যায় যমের কিঙ্কর॥
খাট হইতে লখিন্দর বহে গড়াগড়ি।
তবু নিদ্রা না ভাঙ্গিল বেহুলা সুন্দরী॥

নিন্দ্রিতাবস্থায় বেহুলাকে স্বপ্ন দেখান

চারিভিতে চাহে পদ্মা কেহ নাহি কাছে।
লখাইর প্রাণ আনিবারে চারি নাগ পাঁচে॥

www.pathagar.com

অগ্নিকাল মহাকাল ফণী মহাফণী।
চারি নাগ লইয়া ধামু চলিল আপনি॥
কাহার শকতি বুঝে দৈবের ঘটন।
যমদূত সঙ্গে পথ হইল দরশন॥
চল চল আরো দূত রাখি যাও জীব।
বজ্রকামড় মারি বলে শিব শিব॥
বিপরীত বিষজ্বালে প্রাণ বড় দয় (১)।
জীবত্যাজি যায় দূত মনে পেয়ে ভয়॥
যমের কাছে গেলো দূত এড়িয়া লখাই।
জীব আনি দিল ধামু মনসার ঠাঁই।
ঢলিয়া পড়িল লখাই নাহিক চেতন।
রাত্রি শেষে বেহুলাকে দেখাল স্বপন॥
উঠ উঠ বেহুলা গো কত নিদ্রা যাও।
লখিন্দর ঢলিয়াছে গা তুলিয়া চাও।
ছাওনী উপরে ঢলিল তোমার স্বামী।
তোমার সাধনে জিয়াইয়া দিলাম আমি॥
শেষ রাত্রি আসিল কালী না দেখিল বিয়া।
তোমার স্বামী খাইয়া সে যায় পলাইয়া।
ঢলিয়াছে লখিন্দর প্রাণ নাহি ধরে। (২)
নিদ্রা ত্যজি গা তুলিয়া চাও তাহার তরে॥
অন্তর্ধ্যান হইলা দেবী স্বপন দেখাইয়া।
স্বপন দেখিয়া বেহুলা উঠিল জাগিয়া॥
স্বপন দেখিয়া বেহুলার প্রাণ ফাটে।
প্রভু প্রভু বলি বেহুলা ততক্ষণে উঠে॥

রয়ানী গান এখনও টিকে আছে সাধারণ মানুষের লোকজ সংস্কৃতিতে।

১১. কবিগান

আঞ্চলিকতার বিশেষত্বে ঐতিহাসিক গোপালগঞ্জের রয়েছে সুদূর অতীতের এক গৌরবময় ঐতিহ্য। বিভিন্ন ধারার সংযোগ সাধন ঘটেছে এখানকার স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত লোকসংস্কৃতিতে। কবিগান, জারি, সারি, মুর্শিদ, ভাটিয়ালি, বৈঠক, দেহতত্ত্ব, মারফতি, নগর কীর্তন, যাত্রাগান ও অন্যান্য সুরলহরী সমৃদ্ধ করে দিয়েছে গানের ভুবনকে। কবিগান তার মধ্যে অন্যতম। গোপালগঞ্জকে পূর্ববঙ্গের কবিগানের সাধনপীঠ বলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে যেসব চারণ কবিয়াল কবিগানের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে রামবসু, নিত্যানন্দ বৈরাগী, হরু ঠাকুর, মুকুন্দ দাস, রাসু নৃসিংহ, রাম নিধি ও লক্ষ্মীকান্ত স্মরণীয়। এসব চারণ কবিদের চমৎকারিত্বে বাহবা না কমতেই ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলাদেশে কিছু অধ্যাত্মবাদী চারণ কবিদের সৃজনশীলতায় কবিগানের ব্যাপৃতি বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়ে। গোপালগঞ্জ সদর

www.pathagar.com

উপজেলায় দুর্গাপুর গ্রামের চারণ কবি মনোহর সরকারের বাড়ি ছিল পূর্ব বাংলার চারণ কবিদের তীর্থস্থান। কোটালীপাড়া উপজেলার পোলসার গ্রামের সাধক পুরুষ গণেশ পাগল কবিগান বড় ভালোবাসতেন। চারণ কবি মনোহর সরকারের কাছে তিনি ভক্তিডোরে অবদ্ধ হয়ে বাকি জীবন মনোহর সরকারের বাড়িতে কাটিয়েছেন। এই মহামানবের সমাধি স্থান আজ তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। কবি রসরাজ শ্রীমৎ তারকচন্দ্র, কবিকেশর পাগল রাজেন্দ্রনাথ, হরিবর, মনোহর, নকুল, রসিক, নিশিকান্ত, চারণ কবি সম্রাট বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী, অনাদি, রাইচরণ, কুসুম কুমারী, ক'বেল কামিনী, মহানন্দ হালদার, রয়ানী সম্রাজ্ঞী কামিনী সুন্দরী, নারায়ণ, স্বপন, কালিপদ, প্রমুখ চারণ কবিদের সুরছন্দে লোকসংস্কৃতি অঙ্গন যেন কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে আছে। কবিগান মূলত সুরছন্দ, যুক্তি-তর্ক সম্বলিত একটি প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান। সাম্প্রতিক একজন চারণ কবি নিশি কান্ত সরকার কবিগান সম্পর্কে যা বললেন–'এই কবিগান একটি ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন-বন্দনা বা বাণীবন্দনা, মালসী বা ভবানী, সখিসংবাদ, কবি, টপ্পা, ধুয়া, মনোশিক্ষা পাঁচালি ও মিলন।

বাণী বন্দনা

আমায় কোনো আলোকে কোনো লোকে কে গো আনিলে
হয় আশালতা সফলতা তোমায় জানিলে
এলোক আলোকের আধার এলোক সুধারও সুধার
মনে বলে এলোকে মোর দিলে অধিকার।
আমায় আমি পাইনা খুঁজে তুমি সেধে না দিলে
এলোক ভূলোকের উপর এলোক সকলার পর
পাই না বুঝে পাই না খুঁজে এলোকে কার ঘর।
এলোকে কী সুন্দর, সুন্দর লহর আনিলে।
অন্তরা : কোনো পাশে বাজে কারো বাঁশী
কে আছ গো এ দেশবাসী
সুরে সুরে যন্ত্রে তন্ত্র কি হরিয়া
রাখিয়াছ তোমার ওই বাঁশরীতে ভরিয়া
সুরে শুধু সদা সুধা পড়ে ঝরিয়া
স্মরিয়া সুখ সাগরে ভাসি।
এদেশ হতে আর বিদেশে নিও না
বাসনার কামনার কোনো ধন দিও না
এ লোকের হাসি যে বাঁশরীর বাজনা
ভালোবাসি গো ভালোবাসি।

ভবানী বা মালসী

আমি অহরাত্র ভাবিমাত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্য
মা তোর যেখানে যা না সাজে
তাই সাজলি কোন কাজে
জগৎ মাঝে তোর একি চরিত্র।

www.pathagar.com

ফুকার : ও মা কৃপণেরে দিয়ে ধন করলি ধনের মহাজন
তাতে মা তোর স্বার্থ কি, এরূপ কত শত দেখি
মা-মা-মা গো যারা পরহিতে সদারত
তাদের তো নাই শক্তি তত, দাতার যদি টাকা হতো
আমরা সবাই হতাম সুখী।
মিশ : ভবে কিছু নাই সর্বাঙ্গে সুন্দর দেখে শুনে
জানি যত মহাজ্ঞানী মহাগুণী, তারা সব একগুণেতে নিকৃষ্ট।
মুখ : যা কিছু মা তুই করিস, করবার হাত তাই করতে পারিস।
তাই বলে কি সৃষ্টি করবি নষ্ট।
প্যাচ : কেহ মিথ্যা মকদ্দমা করে
জয় হয়ে যায় রাজ হুজুরে
টাকার জোরে মিথ্যা স্বাক্ষীর বলে।
আবার সতীর চাইতে সুখ সম্পত্তি বেশ্যাদের কপালে
দুর্দান্ত নরকের ভণ্ড সত্য বাদীর কারাদণ্ড
ভ্রমান্ধ মিথ্যা কথায় হয় সন্তুষ্ট।
ফুকার : খেটে কত খাটনি দিবা রাত্রি
ফসল হয় না জমিতে
বিনা চাষে হয় উড়ি
পড়ে চাষির মাথায় বাড়ি
মা-মা মাগো
ঘাস গুল্ম তোর কতই আছে
কাল স্বরূপ ফসলের পাছে
তার চাইতে মান করেছে
অজাত জার্মানি কচুড়ি।
মিশ : যারা খেটে মরে দিবা রাত্রি
তার ঘরে নাই ভাত
যত লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষ্মী সাক্ষাৎ
প্রমাণ আছে যথেষ্ট।
অন্তরা : মা তোর সৃষ্টির কৌশল ভূমণ্ডলে
আগাছায় ফলে বেশি ফল
দিলি বানরের বুদ্ধি অমানুষের বুদ্ধি
অসুরের গায়ে দিলি বল
ধান্য হয় মা দক্ষিণে লক্ষ্মীর বাস সেইখানে
এমন সোনার দেশে দিলি নোনা জল

www.pathagar.com

দিলি পলাশ আর মান্দার দেখিতে সুন্দর
নাই গন্ধ নাই পরিমল।
চিতান : তুমি সুর দিলে পাতি শৃগালে না দিলে তার তাল,
যত তালিম লোকের রাঙাসুর, এ আর এক সৃষ্টির কসুর,
মা তোর সকল কাজের পিছে এক জঙ্গাল
মা-মা মাগো।
ফুকার : মূর্খ-হয় সব ধনী সন্তান, গরীবের ছেলে হয় বিদ্বান,
এই আর একটি অলগ্ন বলতে উৎসাহ হয় ভগ্ন
মা-মা মাগো,
যত ভালো বউ পায় বোকা লোকে, জ্ঞানীরা সব প্রায়ই ঠকে,
দম্পত্তির দাম্পত্য সুখে, মা তুই ঘটাইছিস বিঘ্ন।
মিশ : যারা খেটে মরে দিবারাত্র, তার ঘরে নাই ভাত
যত লক্ষ্মী ছাড়ার লক্ষ্মী সাক্ষাৎ, প্রমাণ আছে যথেষ্ট।

সখি সংবাদ

বাশুলী আদেশে দ্বীজ চণ্ডীদাসে রচিল শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন
ও তার যত কথা, তাতে শুধু পবিত্রতা সুশিক্ষার সূক্ষ্ম নির্দশন।
ফুকার : এক নিভৃত নিকুঞ্জ বাসে রাইকে বলে, বলে ভালোবেসে
শ্যামবনমালী এই নাও প্রেম পুষ্পের শেষের অঞ্জলী
কার পঞ্চেন্দ্রিয় চরিতার্থ হারাইলে তব পরমার্থ
দুর্লভ জনম গেলো ব্যর্থ আর তো চাই না রাই রসকেলি।
মিশ : আমায় বিদায় দাও জন্মের মতো আমি স্ব-ধামেতে যাই
অমনি শুনে কেঁন্দে কয় রাই একি বলো বলো।
মুখ : তুমি যাবে যথা আমায় নেবে তথা এই না কথা ছিল।
প্যাচ : বিদায় বলিয়া নাথ কি দায় ঘটালে
মম হৃদয় সাগরে বাড়ব অনল উঠালে
কে তোমার সাধিয়েছিল করিতে পীরিতি
বলো বলো এই নাকি পুরুষের রীতি।
আগে কত না করেছি মানা
আমায় ছুঁইও না ছুঁইও না
বলে কত না করেছি মানা
মথুরার ঘাটে যেতে সখি সাথে পথে পথে
কতবার না বয়েছিলে বাঁধা
হায় গো আমারে ভালোবাসিতে
তোমার ওই ভালো বাঁশিতে
ডেকেছিলে বলে রাধা রাধা।
আমার সেই শরে প্রাণ পাখি বিঁধে
কালা কাল গেলো হে কেঁদে কেঁদে

www.pathagar.com

তোমায় না পাইব যতদিন কেঁদে কেঁদে
করিব ওই স্বরূপে রূপের ধ্যান বন্ধুরে।
আমি তোমায় মিলাইব প্রেম স্বরূপে চিনাইব
তোমার সনে অন্তর দিয়া জেনে
অন্তর্যামী দুটি কথা বল।
মুখ : তুমি যাবে যথা
খোচ : ছেড়ে গোপীর সেবা
কোন দেশে বা বেশি আলো
ফুকার : আগে জানতাম তুমি রসিক সুজন
করে কত সাধন ভজন লভিলে আমায়
তোমার পীরিতিতে যে জাত কুলমান যায়,
বন্ধু তোমার অদর্শনে দিন যাবে অশ্রু বর্ষণে
আকর্ষণে বিকর্ষণে কেন একদিন পাব না তোমায়।
মিশ : আমি কেন বা সতী ধর্মে দিলাম জলাঞ্জলী
এখন সেই অনুতাপে জ্বলি কর্মের ফল ফলিল
মুখ : তুমি যাবে যথা আমায় নিবে তথা
এই না কথা ছিল।
অন্তরা : বন্ধুরে আমারে কাঁন্দায়ে যেন তুমি থাক সুখে
তোমার যত প্রকার আগুন আছে।
তা দিয়ে দাও আমার বুকে
বন্ধুরে তোমার যত দুঃখ রাশি
আমার বক্ষে না পরশে আসি
যেন ভালোবাসি দূরে থেকে।
আমি যাই যদি অকূলে মিলে
যাব প্রীতির স্মৃতি রেখে
কালা কালি দিলাম কূলে
লোক সমাজে বের হবো কোন মুখে।
আমি ঝাঁপ দিব অকূল পাথারে
তোমার প্রেম পীরিতি দুঃখে।
চিতান : কী দূরভিসন্ধি দুই মন করে বন্দি
এখন করিতে চাও ছিন্ন
স্বয়ং প্রজাপতি দিল এ মিলন আরতি
কেন বিরতি কি জন্য।
ফুকার : আগে সাজায়ে পারের তরী কাণ্ডারি হয়ে হরি
নিলে তরীতে বুঝি দুর্বলা অবলার সর্বনাশ করিতে
তুমি গোলক বিহারী কর্ণধার বলে মন ভুললে রাধার

www.pathagar.com

সুখ নাই এবার সুখ নাই এবার
আমার ডুবে হবে বুঝি মরিতে।
মিশ : আমি কেন বা সতীধর্মে ছিলাম জলাঞ্জলী
এখন সেই অনুতাপে জ্বলি, কর্মের ফল ফলিল।

কবি

একদিন কাল কুঠিলা কালার ভয়ে
সন্ধ্যার পরে রাইকে নিয়ে শুয়ে আছে সন্দেহ মনে
যখন বাথান থেকে আয়ান ঘোষ যায় মাতালের বেশে
সে এই ঘরে এসে ঢুকল গোপনে।
ফুকার : আয়ান ঘরে গিয়ে করল ওজন
এক শয্যায় শোয়া দু'জন
লজ্জায় তার বদন হলো ম্লান
ভাবে সোনার ভাগ্নে শুভ লগ্নে
আজ বুঝি ঘরে অধিষ্ঠান হায় মরি হায়!
বিছানার পিছন থেকে এ দৃশ্য চোখে দেখে
এমন ভাগের কাজে রাগে ঠেকে
কুটিলার ঠ্যাং ধরে দেয় টান।
মিশ : ধরল কৃষ্ণ ভেবে কুটিলা তার দাদাকে ঠেসে
ওসে গোলমালে বলাই কয় এসে
কুটিলা করিস কী ঘরের কোণে।
মুখ : একেত আঁধার রাতি কেন শয়ন ঘরে
হাতাহাতি করিস ভাই বোনে
প্যাচ : তোকে লোকে বলে কীসের লাগি
এই ব্রজে একমাত্র তুই ভাই সোহাগী
আজ কেন রাগারাগি হয়
বুঝি পান হতে চুন খসে গেছে
খুন চড়েছে গায়।
ঘরের কোণে আঁধারে সেরে রেখে রাধারে
এমন কৌশলে ধরে দাদারে
গাধার ন্যায় সাজালি বৃন্দাবনে।
খোচ : তোদের স্বপনের গোপন ছবি দেখল সর্বজন।
ফুকার : যেদিন ছেদা কুম্ভে জল আনিতে, পাঠায়ে দেয় যমুনাতে
বৈদ্যরাজ ভাবিয়া মনে
নাকি তোর মতো সধবাসতী কেহ নাই এই বৃন্দাবনে।
হায় শেষে বিপরীত হলো দেশে কলঙ্ক রলো
কুম্ভের তল দিয়ে জল সরে গেলো
বুঝি তোর দাদার কারণে।

www.pathagar.com

মিশ : ও তোর দাদার সাথে আঁধার রাতে করেছিস যে কাম
গাহে দেশ ভরে তোদের দুর্নাম এই বুঝি ছিল মনে।
অন্তরা : কেন এতকাল কালারে লয়ে জ্বালা দিলি রাধারে
সরলা রাই রজবালা তোর দাদার চেয়ে সাদারে।
বাধ ঘটালি দাদার সাথে ওতোর দাদারে ধরে
আঁধার রাতে মিছামিছি খাটবে না জোর
ভেঙেছে সবার ঘুমোঘোর
মাল কোঠায় আজ ধরেছি চোর
তোরে আর তোর দাদারে।
তুই রয়েছিস রাস্তা জুড়ে
রাধা কাঁন্দে আস্তাকুড়ে
রাইকানুর মিলন বাতাসে
আগুন জ্বলে ফাগুন মাসে
চাঁদ উঠিল নীল আকাশে অমাবস্যার আঁধারে
ও তুই রাধাকে দুই পদে দলে
দাদাকে নিয়ে তোর দলে
আন্দোলন চালাইছিস খুব
জানি সাধু চোর নয় দ্রব্যে ঘটায়
কপালের গুণে ঠিক তোরা
ভাইবোনে সামান দুই বেকুপ।
ফুকার : ও তোর বাল্যকালে পতি মল্লে
ভাইয়ের বাড়ি এলি চলে
তুই তো বুঝিস নিজের দর
হায় তোর দুর্নাম সবাই রটে শুনতে পাই
গোঠে মাঠে গিয়ে কালিন্দির যমুনার ঘাটে
কলসি বেঁধে জলে ডুবে মর।

●

একদিন বিদ্যুৎ বৃন্দাবন আনন্দে
সাজালেন শ্রীনন্দের নন্দন
শোভে নানা ফুলের বন
লয়ে গোপীগণ পঞ্চরস করে আস্বাদন
কও দেখি গোপীগণে এই ত্রিলোকের
স্ত্রী লোকের স্তনে আছে কোন কোন রস
কেন চর্ম পিণ্ড দর্শনমাত্র
পুরুষের হরষিয়া ওঠে গাত্র
নেত্র ভ্রমরের ন্যায় পড়ে
শেষে ঢাকিলে কাপড়ের তলে

www.pathagar.com

তলে তলে পোড়ে।
পদ্ম নয়লো পদ্মাকার
মধু নয়লো মধ্যাধার
আসে ওই সাকারে কোন নিরাকার
মন কেন দরশে মাগে পরশ
ধীর লোকে ভাবে ওকে ক্ষীর ভরা কলস।
স্তন আদিতে হয় বদরিকা
পৌগন্ডে পেয়ারা হয় চেহারায়
কত কৃশাঙ্গিনীর বৃদ্ধাকালে
তলে দুটি দয়া কলা নকলকায়
যেমন বাঙ্গি, তরমুজ, ক্ষীরাই, শশা
নারী বিশেষে স্তন হয় একরূপ একদশা
যখন বড়াই বুড়ি লাঠি লয়ে-
পথে চলে বাঁকা হয়ে
তার মাই দু'টি কয় তালে দোলে
আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ঠিক
মাঝখানে আঙ্গুল চারেক ফাঁক
দুই খানা মধুর চাক এক গাছের ডালে।

আসরে দাঁড়িয়ে পর্যায়ক্রমে এভাবে বন্দনা, মালসী বা ভবানী, সখিসংবাদ, কবি, দোহাররা গেয়ে থাকেন। তারপরে চারণ কবিরা শুরু করেন কবিগান গাইতে। কবিগানের পাল্লায় একজন প্রশ্নকর্তা আরেকজন উত্তরদাতা থাকেন। উত্তরদাতা বিভিন্ন যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়ে থাকেন। উত্তরদাতার পরিবেশিত জবাব ভুলেভরা তা প্রমাণ করতে প্রশ্নকর্তা আরও সুন্দর সুন্দর যুক্তিতর্ক টেনে আনেন। এভাবে পালাক্রমে চলে কবিগান।' কবিয়ালরা পরিশেষে মিলন গেয়ে কবিগান শেষ করেন। এই গানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সারিন্দা, হারমোনিয়াম, জুড়ি, পাকোয়াজ, বাঁশি ব্যবহার হতে দেখা যায়।

কবিগানের বিশেষত্ব হলো আসরে দাঁড়িয়ে অবিরতভাবে ছন্দে ছন্দে পাঁচালি বলে যাওয়া। শুধু গতানুগতিক পাঁচালিই নয়। যার যার সাধ্য অনুযায়ী এটিকে তাৎপর্যময় করে পরিবেশন করে থাকেন। গোপালগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা অঞ্চলে এখনও লোকের মুখে কুসুম কুমারীর কবি গানের গল্প শোনা যয়। যতদূর জানা যায় তিনিই বঙ্গের প্রথম মহিলা চারণ কবি। নিজের দায়িত্বে দল গঠন করে বড় বড় নামজাদা কবিয়ালদের সঙ্গে কবিগান গেয়েছেন। অনেককে হার মানিয়েও দিয়েছেন। একবার আমিরাবাদে বিখ্যাত কবি নিবারণ বসুর বিপক্ষে কুসুম কুমারী গান করেছিলেন। তার লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় ড. দীনেশ সিংহ-এর বাংলার কবিয়াল ও কবিগান নামক গ্রন্থে। আসরে দাড়িয়ে কবি নিবারণ বসু কুসুম কুমারীকে প্রশ্ন করলেন—

www.pathagar.com

বল কুসুম কুমারী
মেয়ে হয়ে কোন সাহসে
করতে এলি সরকারি?
লোকে কথায় কথা কয়
চৌদ্দ হাত কাপড়ে
নারীর কাঁধে কাছা রয়
এতো রান্না ঘরের বান্নাতো নয়
শাস্ত্র জানা দরকারী।
কবিগান ছেলে খেলা নয়
কেবল কাজল পরে চোখ ঠেরিলে
সে কি কবি হয়?
ও তোর শাস্ত্রের সঙ্গে নাই পরিচয়
রাঁধতে জানিস তরকারি।

কবিয়াল কুসুম কুমারী আসরে দাঁড়িয়ে উক্ত গানের জবাব দিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করে দিয়েছিলেন :

'সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠা হলো নারী
ভেবে তারণ কারণ নারীর চরণ
বক্ষে ধরেন ত্রিপুরারী।
পাগল শিব তালে নাচে,
গঙ্গা তার শিরে আছে
গঙ্গাধর নাম পেয়েছে
শিরে গঙ্গা ধরি।
আবার রাধার পদে স্বনাম লিখে
খাতক হলেন বংশীধারী।
নারীকে নিন্দা করা কি খাটে?
নারী ব্রহ্মা ভাণ্ড উদারী
তন্ত্র শাস্ত্রে তাই রটে'
অসাধ্য কর্ম সাধিতে,
বিশ্ব স্রষ্টা নারী সৃষ্টি করেন জগতে
নিজে আদ্যাশক্তি খড়্গ হাতে
অসুরের মাথা কাটে'
সুন্দ আর উপসুন্দ,
দেবতার বিরুদ্ধে যেদিন করিল দ্বন্দ্ব
সেদিন পায়ে পড়ে দেবতাবৃন্দ
তিলোত্তমার পায়ে লোটে'
সীতা অসতী সাজিল
শতস্কন্ধ রাবণের বধ করেছিল
নারী বিশ্ব প্রসব করেছিল
বুঝি তোর জন্ম বাপের পেটে।

www.pathagar.com

১২. সারি গান

পরস্পর অবস্থানকে সার বা সারি বলা হয়। সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করে যে গান পরিবেশন করা হয় তা সারিগান নামে পরিচিত। কর্মোদ্যম অটুট রাখতে কিংবা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সারিগানের উৎপত্তি। কিছু আশ্রাব্য পদ বা কিছু চটুল কথা এতে স্থান পেতে দেখা যায়। তত্ত্বীয় কোনো বিষয়াদি এতে তেমন অবলম্বন করা হয় না। বিশেষ একটা চরিত্রকে এখানে তুলে ধরা হয়। শালীনতা ভঙ্গের ঘটনা একমাত্র সারিগানেই ঘটতে পারে। সাধারণত ভারী বস্তুর স্থানান্তর ঘটাতে পরিবেশিত সারিতে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নৌকা বাইচের সময়ে সারি পরিবেশনকালে বাদ্যযন্ত্রের আবশ্যকতা আছে। এতে বিশেষ করে নাকাড়া ও কাশি এই দু'টি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয়। একজন বাচাড়ি নৌকার মালিক বঙ্কিম সরকারের কাছে এবিষয়ে কিছু জানতে চাইলে তিনি যা বললেন–'বাণিজ্যিক চিন্তায় নৌকা বাইচে আমরা অংশ নিই না। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারলে সেটা আমাদের বড় আনন্দ। ভাঙা ভাঙা সুরে সারিগান গাওয়ার অর্থ হলো তালে তালে বাছিয়ারা সামনের দিকে ঝোঁকে আর এতে নৌকা সামনের দিকে ছুটে চলে। কিছু অশালীন খেউড় গান গাইলে বাছিয়ারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এটি একটি ভালো উপায়। কর্মে উদ্যম আনতে তাই সারি গান গাওয়া হয়।' গোপালগঞ্জ জেলাটি পশ্চিম অংশ থেকে পূর্ব অংশ জলাময় বেশি। এ-কারণে পূর্ব গোপালগঞ্জে সারিগান বা নৌকা বাইচের প্রচলন বেশি। তারমধ্যে জালিরপাড়, বড়ডোমরাশুর, কদমবাড়ি শেওড়াবাড়ি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কিছু আঞ্চলিক সারিগান উল্লেখ করা হলো।

●

ওলো বরুর মা
তোর মেয়ের নিকার যোগাড় কর
মাইয়ার নিকার যোগাড় কররে খালেকের মা
তোর মাইয়্যা বাহির হলো এখন জানবে ক্যান
ওলো বরুর মা
তোর মেয়ের নিকার যোগাড় কর।
খাম্বুর হইয়া কিল দিলে গাম্বুর হইয়া ওঠে
পাড়ার লোকে উঠিয়া বলে কিসের চিড়া কোটে
ওলো বরুর মা
তোর মেয়ের নিকার যোগাড় কর।
গাই বিওইছে উত্তর ডাঙ্গায় বাছুর নিল চিলে
মোনাই খাসিয়া গেছে গাই দোয়াবা কিসে
ওলো বরুর মা
তোর মেয়ের নিকার যোগাড় কর।
বড় মিঞা গেলোরে ভাই মাইনুদ্দিনগে বাড়ি

www.pathagar.com

পাতলা পাতলা কয় কথা ঘন নড়ে দাঁড়ি
ওলো বরুর মা
তোর মেয়ের নিকার যোগাড় কর।
আলু বান্দি ছালু বান্দি বিড়াল বান্দি খাটালে
ছেমড়িগো চরণ বন্দি ছ্যামড়াগো কপালে
ওলো বরুর মা
তোর মেয়ের নিকার যোগাড় কর।
কত্তায় বাড়ি নাইরে মাদারীপুরে গেছে
বছর বিয়ানো বউ চোরে নিয়েছে
ওলো বরুর মা
তোর মেয়ের নিকার যোগাড় কর।
বাড়ি নাই বাড়ির কত্তায় গেছে বহু দূর
নতুন নোটে চিড়া কোটে গাপুর গুপুর
ওলো বরুর মা
তোর মেয়ের নিকার যোগাড় কর।

●

কালা ছেড়ে দে কলসি আমার যায় বেলা
হে নাগর
জলেরও তরঙ্গ দেখে প্রাণ কাঁদে মোর ডরে
আইজ আমি কমু না কথা ফিরে যা তোর ঘরে
নে নাগর।

পরের রমণী দেখে জ্বলে কেন মোর
গলায় কলসি বেঁধে জলে ডুবে মর
হে নাগর।

তুমি হও যমুনার জল আমি ডুবে মরি
মরিব যমুনায় ডুবে তোমার গলা ধরি
হে নাগর।

কেমন তোমার মাতাপিতা কেমন তোমার হিয়া
একেলা পাঠাইছে ঘাটে কলসি কাঁখে দিয়া
হে নগার।

ভালো আমার মাতা পিতা ভালো আমার হিয়া
একেলা পাঠাইছে ঘাটে কলসি কাঁখে দিয়া
হে নাগর

www.pathagar.com

ভালো আমার মাতা পিতা ভালো আমার হিয়া
তোমার দেশে আসব বলে না করিছি বিয়া
হে নাগর।

কলসি ভরিয়া রাধে ডাইনে বামে চায়
হৃদয়ে পূর্ণিমার চাঁন কলসির ভিতর আয়
হে নাগর।

•

প্রেম করিসতো খালই নৈয়া আয় রে রাঙাদ্দি (২)
কলা বাগানে যাইয়া প্রেম করে দুইজনে
তাই দেখিয়া এক জোগাইল্যা মিট মিটইয়া হাসে
খালইয়ের ভিতর ভইরা প্রেম টোপে টোপে পড়ে
তাই দেখিয়া ন'দি উঁকি মাইর্যা দেখে।
প্রেমের মূল্য জানে না কেউ, তোরা সব জানিস
কেন তোরা উঁকি মারিস আমার কথা শোন
জগৎ মাঝে আছে সবার সব লোকে জানে
আমাকে দেখিয়া তোরা এমনি করস ক্যান।

•

হুমনা রে হুমনা হুমনা রে হুমনা
ওহো ওহো ওয়ো ওয়ো ও য়ো হো।
আজ মারব তোরে রে মোরোগা
কাল মারব তোরে
ওহো ওহো ওয়ো ওয়ো ও য়ো হো।
নিশীথে জাগিয়ে ওঠরে মন ডাকিয়া
মনতো রয় না ঘরে রে মোরোগা
আজ মারব তোরে রে মোরোগা
কাল মারব তোরে

ওহো ওহো ওয়ো ওয়ো ও য়ো হো।
বাড়ির কাছে আগড়ার বাগান রে
জড়িয়ে ধরিছে আমার চুল রে মোরোগা
আজ মারব তোরে রে মোরোগা
কাল মারব তোরে
ওহো ওহো ওয়ো ওয়ো ও য়ো হো।

•

ওরে কাতলা মাছের পাতলা আঁশটিয়া
বেপারী তোরে লইয়া খাইমু

www.pathagar.com

ওহো ওহো ওয়ো ওয়ো ও য়ো হো।
ওরে আমার বাড়ি যাবারে বেপারী বসতে দিমু মোড়া
জলপান করতে দিমু কমলা লেবুর জোড়া
রে বেপারী
ওহো ওহো ওয়ো ওয়ো ও য়ো হো।
ওরে আমার বাড়ি যাবা রে বেপারী বসতে দিমু পিড়া
জলপান করতে দিমু শালি ধানের চিড়া
রে বেপারী
ওহো ওহো ওয়ো ওয়ো ও য়ো হো।
ওরে আমার বাড়ি যাবা রে বেপারী সাথে দিমু খই
উড়গি ধানের মুড়গি দেব গামছা পাতা দৈ
রে বেপারী
ওহো ওহো ওয়ো ওয়ো ও য়ো হো।
ওরে আমার বাড়ি যাবা রে বেপারী শুইতে বড়ই সুখ
শুইয়া পৈড়া দেখবা চাহি চান সুরুজের মুখ
রে বেপারী
ওহো ওহো ওয়ো ওয়ো ও য়ো হো।

•

মা বোল বলি আয় কোলে রে নিমাই চান
যেকালে জন্মিল নিমাই নেমু তরু তলে
আর হইয়া যদি মরতে নিমাই
না নৈতাম কোলে রে নিমাই চাঁন।
আগে যদি জানতাম নিমাই যাবি রে ছাড়িয়া
শিশুকালে মারতাম তোরে দুধে বিষ মিশাইয়া
কোথা হতে এলো গুরু বসতে দিলাম ঠাঁই
কিনা মন্ত্র দিয়া করাইল সন্ন্যাসী রে নিমাই।
বারো না বছরে নিমাই তের নাহি হলো
মাথারও ক্যাশেতে নিমা'র কণ্ঠ না ঘিরিল।
নিমাই রে করাইলাম বিয়া কুলের কামিনী
সেই না বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া জ্বলন্ত অগ্নি।
দেখ রে নদীয়ার লোকজন দেখ রে দাঁড়াইয়া
নিমাই চান সন্ন্যাসে গেলো মা বাপও ছাড়িয়া।

১৩. জারিগান

জেলার প্রতিটি উপজেলায় সেকালে সাধারণ মানুষের কাছে বেশি প্রিয় ছিল জারিগান ও কবিগান। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ জারিগান ও কবিগান শুনতো। তবে

www.pathagar.com

জারিগান ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আর কবিগান সুখ্যাত হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য। উভয় সম্প্রদায় কোনো মানত বা পর্ব উপলক্ষে জারিগান বা কবিগানের আয়োজন করতো। জারি কথাটি জার শব্দ থেকে এসেছে। এখানে জার শব্দের অর্থ শোক। কারবালার করুণ কাহিনি এর উৎস।

জারিগানের আয়োজন করা হতো যেকোনো সময়। তবে বর্ষাকাল বাদে বছরের অন্য সকল ঋতুতে গান শোনা যেত। আবদুল গণি বয়াতি, মোসলেম বয়াতি, খোরশেদ বয়াতি, আবদুল কাদের বয়াতি ও বেল্লাল বয়াতি গোপালগঞ্জ জেলার মানুষ না হয়েও এই জেলার সর্বত্র জারিগান পরিবেশন করতো। আবার কবিগানের সরকার বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, রাজেন্দ্রনাথ ও রবি সরকার মুসলমানদের ডাকে সাড়া দিয়ে জারিগান গাইবার জন্য বায়না নিতেন। জারিগান চলতো পাল্লা দিয়ে। কখনও আসরের বয়াতি বা সরকার শ্রোতাদের নির্ধারণ করা বিষয় নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে গান পরিবশন করতেন। উভয়ে প্রতিপক্ষের উত্তর দিতেন। প্রশ্নোত্তরের ফাঁকে ফাঁকে মূল জারিগানের আসর জমতো। মীর মশাররফ হোসেন রচিত বিষাদ সিন্ধু এবং আমাদের পুথি সাহিত্যের কাহিনিগুলো বয়াতিরা আসরে উপস্থাপন করতেন। এজিদ বধ ও হানিফের লড়াই ছিল সবার প্রিয়। রাতব্যাপী চলতো জারিগান।

তবে একটি কথা সত্যি, কালের আবর্তে হারিয়ে যেতে বসেছে জেলার অন্যতম বিনোদনের মাধ্যম এই জারিগান। এখন আর জারিগানের খোলা খুঁজে পাওয়া যায় না। শীতের শিশির ঝরা রাতের সেই জারিগানের আসর বসে না গ্রামবাংলায়। হারিয়ে যাচ্ছে জারিগান। গোপালগঞ্জের প্রতিটি এলাকায় ছিল জারিগানের খোলা। বছরের নির্বাচিত সময়ে বসতো আসর। বেতার, টিভি, পত্র-পত্রিকা ও আকাশ সংস্কৃতির কারণে লোকজ সংস্কৃতির এই ধারাটি নদীর ক্ষীণ স্রোতের মতো টিকে আছে বলতে হবে।

জারিগানের সাথে জারিনাচ সম্পৃক্ত। জারি দলের লোকেরা মূল গায়েন বা বয়াতি যখন গান পরিবেশন করেন, তখন দোহাররা নেচে নেচে গানের ধুয়া ধরেন এবং নাচেন।

জারি নাচের সঙ্গে মোহররমের আবেগ জড়িত। এখন আর মোহররমের দিনে জারি নাচ দেখা যায় না। কেউ কেউ দল গঠন করে শোকের দিনে শোক নৃত্য পরিবেশন করে। জেলার প্রাচীনরা বলেন, 'জারিনাচ ছিল, মোহররমের অন্যতম আকর্ষণীয় দিন। এদিন শিন্নিও রান্না করা হতো। আর জারিগানের আয়োজন ছিল বাধ্যতামূলক।'[৮১]

তথ্যনির্দেশ

১. মজিবর মোল্লা, বয়াতি. বয়স-৫৬ বছর, গ্রাম: কংশুর, থানা: গোপালগঞ্জ সদর
২. ঐ
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. সুশান্ত দাস, লোকগীতি শিল্পি, বয়স-৬৪ বছর, গ্রাম: আড়ুয়াকংশুর, থানা: গোপালগঞ্জ সদর
৬. বিবেক বালা, পদকার, বয়স-৫০ বছর, গ্রাম: খাটিয়াগড়, থানা:
৭. খোকন সরকার, লোকগীতি শিল্পী, বয়স-৪৯ বছর, গ্রাম: বিদ্যাধর, থানা: কাশিয়ানী

www.pathagar.com

৮. পুতুল হালদার, গৃহিণী, বয়স-৫২ বছর, গ্রাম: বিদ্যাধর, থানা: কাশিয়ানী
৯. জিন্নাত বয়াতি, বয়স-৬০ বছর, গ্রাম: উলপুর, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর।
১০. কালিচরণ মজুমদার, গ্রাম: বড়খোলা, মাদারীপুর
১১. হারান শীল, বয়স: ৬৮ বছর, গ্রাম: কংশুর, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর।
১২. গেদু ফকির পদকার, গ্রাম: বনগ্রাম, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর
১৩. রজনীকান্ত, উপজেলা: কাশিয়ানী
১৪. হারান শীল, বয়স: ৬৮ বছর, গ্রাম: কংশুর, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর।
১৫. সুশান্ত রায়, লোকসংগীত শিল্পী, বয়স: ৪২, আড়ুয়াকংশুর, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর
১৬. কালিচরণ মজুমদার, গ্রাম: বড়খোলা, মাদারীপুর
১৭. চারণ কবি অনাদী সরকার, গ্রাম: চুনখোলা
১৮. চারণ কবি সম্রাট বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, জেলা: নড়াইল
১৯. চারণ কবি অনাদী সরকার, গ্রাম: চুনখোলা
২০. চারণ কবি সম্রাট বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, জেলা: নড়াইল
২১. ঐ
২২. ঐ
২৩. আলোক হীরা, বয়স: ৩৯ বছর, উপজেলা: মুকসেদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ
২৪. চারণ কবি সম্রাট বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, জেলা: নড়াইল
২৫. চারণ কবি রসিক সরকার
২৬. ঐ
২৭. চারণ কবি সম্রাট বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, জেলা: নড়াইল
২৮. চারণ কবি নিশিকান্ত সরকার, বয়স: ৬২, উপজেলা: ফকিরহাট, জেলা: বাগেরহাট
২৯. ঐ
৩০. ঐ
৩১. ঐ
৩২. ঐ
৩৩. ঐ
৩৪. ঐ
৩৫. চারণ কবি স্বপন কুমার পাণ্ডে, বয়স: ৪৭, গ্রাম: তাড়াশি, উপজেলা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ
৩৬. চারণ কবি স্বপন কুমার পাণ্ডে, বয়স: ৪৭, গ্রাম: তাড়াশি, উপজেলা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ
৩৭. ঐ
৩৮. ঐ
৩৯. চারণ কবি অনাদী সরকার, গ্রাম: চুনখোলা
৪০. চারণ কবি সম্রাট বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, জেলা: নড়াইল
৪১. বাবুল পাগলা, বয়স: ৪০, গ্রাম: পারঝনঝনিয়া, উপজেলা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ

www.pathagar.com

৪২. চারণ কবি অনাদী সরকার, গ্রাম: চুনখোলা
৪৩. চারণ কবি নারায়ন বালা,
৪৪. চারণকবি তারক সরকার, গ্রাম: জয়পুর, জেলা: নড়াইল
৪৫. শ্যামল ভৌমিক, বয়স: ৫১, গ্রাম: রামদিয়া, উপজেলা: কাশিয়ানী, জেলা: গোপালগঞ্জ
৪৬. সদানন্দ বিশ্বাস, লোকসংগীত শিল্পী, গ্রাম: আড়ুয়াকংশুর, উপজেল: গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ
৪৭. চারণ কবি সম্রাট বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, জেলা: নড়াইল
৪৮. বয়াতি মজিবর মোল্লা, বয়স: ৫৪, গ্রাম: কংশুর, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর, জেলা: গোপালগঞ্জ
৪৯. বয়াতি মজিবর মোল্লা, বয়স: ৫৪, গ্রাম: কংশুর, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর, জেলা: গোপালগঞ্জ
৫০. চারণ কবি সম্রাট বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, জেলা: নড়াইল
৫১. বয়াতি মজিবর মোল্লা, বয়স: ৫৪, গ্রাম: কংশুর, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর, জেলা: গোপালগঞ্জ
৫২. রীতা রানী সরকার, বয়স: ২৭, গ্রাম: বিদ্যাধর, উপজেলা: কাশিয়ানী, জেলা: গোপালগঞ্জ
৫৩. চারণ কবি সম্রাট বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, জেলা: নড়াইল
৫৪. কার্তিক শীল, বয়স: ৪৫, গ্রাম: কংশুর, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর, জেলা: গোপালগঞ্জ
৫৫. চারণ কবি অনাদী সরকার, চুনখোলা
৫৬. মিতা বাইন, লোকসংগীত শিল্পী, বয়স: ৩৫, গ্রাম: ঘৃতকান্দি, উপজেলা: কাশিয়ানী, জেলা: গোপালগঞ্জ
৫৭. দিলীপ বিশ্বাস, বয়স: ৫০, উপজেলা: টুঙ্গিপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ
৫৮. লোক কবি অশ্বিনী কুমার
৫৯. অলোকা বিশ্বাস, বয়স: ৩৮, উপজেলা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ
৬০. শেলেন মণ্ডল, বয়স: ৪১, গ্রাম: বানিয়ারচর, উপজেলা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ
৬১. ঐ
৬২. লুকাস হাওলাদার, বয়স: ৫৬, গ্রাম: বানিয়ারচর, উপজেলা: মুকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ
৬৩. ঐ
৬৪. চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, বয়স: ৪৮, পেশা: সৌখিন গায়ক, গ্রাম: ধীরাইল, উপজেলা: কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ
৬৫. নিলীমা সরকার,বয়স: ৪২, পেশা: গৃহিণী গ্রাম: বিদ্যাধর, উপজেলা: কাশিয়ানী, জেলা: গোপালগঞ্জ
৬৬. ঐ
৬৭. ঐ
৬৮. ঐ
৬৯. চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, পেশা: সৌখিন গায়ক, বয়স: ৪৮, গ্রাম: ধীরাইল, উপজেলা: কাশিয়ানী, জেলা: গোপালগঞ্জ

www.pathagar.com

৭০. ঐ
৭১. ঐ
৭২. জিন্নাত বয়াতি, বয়স: ৬০, গ্রাম: উলপুর, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর, জেলা: গোপালগঞ্জ
৭৩. ঐ
৭৪. সাধক ফটিক গোসাই, গ্রাম: মাইচকান্দি, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর, জেলা: গোপালগঞ্জ
৭৫. চারণ কবি সম্রাট বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী, জেলা: নড়াইল
৭৬. হারান শীল, লোকসংগীত শিল্পী, বয়স: ৬৮, গ্রাম: কংশুর, উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর, জেলা: গোপালগঞ্জ
৭৭. ঐ
৭৮. ঐ
৭৯. ভেলু ফকির, পূর্বচিত্রাপাড়া, কোটালীপাড়া।
৮০. মো. মজিবুর রহমান, গ্রাম : গচাপাড়া, কোটালীপাড়া।
৮১. রমেশ চন্দ্র বাগচী, গ্রাম : পূর্ব পাড়া, কোটালীপাড়া।

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

আধুনিক যুগে বাদ্যযন্ত্রের বহুমাত্রিকতা সত্ত্বেও লোকবাদ্যযন্ত্র আগের মতো অটুট আছে। লোকবাদ্যযন্ত্রে গভীরতা ও সরসতা অন্য বাদ্যযন্ত্র থেকে আলাদা একথা বলতে কোথাও বাধা নেই। যেজন্য প্রাচীনকাল থেকেই লোকবাদ্যযন্ত্রের আহ্বান সমুন্নত রয়েছে লোকসমাজে। এখানকার লোকবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আছে একতারা, দোতারা, খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, সারিন্দা, পাকোয়াজ, ঢাক, জয়ডঙ্কা, কাশি, বাঁশের বাঁশি, খোমক, নাকাড়া, ডুগডুগি, নূপুর ঝুমুর, প্রেম জুড়ি ইত্যাদি। এই সকল বাদ্যযন্ত্র দিয়ে সুরের ভূবন মোহিত করে রাখা হয়।

ক. বাঁশি

গোপালগঞ্জ অঞ্চলের শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষ বাঁশির সুর ভালোবাসে। এক সময় রাখাল মাত্রই বাঁশি বাজাতো। বর্তমানে মাছ চাষের কারণে আগের মতো গরুর পাল নেই, রাখালও নেই। তাই রাখালের হাতে বাঁশিও এখন আর শোভা পায় না। তবে যাত্রাপালা, কবিগান, বাউলগান, কীর্তনের আসরে গায়ক ও শিল্পীরা বাঁশি ব্যবহার করে। বাঁশির জন্য তল্লা বাঁশের মাথার অংশ বা চিকন সোজা প্রকৃতির বাঁশ বা মোটা কঞ্চি কেটে পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর সেটা পরিচ্ছন্ন করে ভালো করে রোদে শুকানো হয়। অতঃপর আগুনে লোহার শিক পুড়িয়ে এর তাল লয়ের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে ছিদ্র করা হয়। এভাবে বাঁশিতে ছয়টি ছিদ্র থাকে।

খ. একতারা

একতারের বাদ্যযন্ত্র হলো একতারা। গ্রামে-গঞ্জে বাউল-ফকিরদের হাতে সহজে একতারা চোখে পড়ে। এর গঠনপ্রণালী যেমন সহজ, নির্মাণ উপকরণও সাধারণ। পাকা লাউয়ের খোলের তলায় শুকনো চামড়া মোড়ানোর পর বাঁশের ডাটি লাগানো হয়। তলার চামড়া থেকে কাঠির মাথা পর্যন্ত একটি কাঠিতে তার বেঁধে নেওয়া হয়। ডাটির মাথায় একটি শক্ত কাঠি সংযুক্ত করা হয়। এর সাহায্যে তার টান টান রাখা হয়, যাতে বাজনার উপযুক্ত থাকে। বাউল, বৈরাগী, ফকিররা একতারা বাজিয়ে গান গায়।

গ. দোতারা

এ অঞ্চলের অন্যতম জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র দোতারা। পেশাদার বাউল গায়করা প্রায় সবাই দোতারা বাজিয়ে গান গায়। কাঠের খোলের উপর শুকনো চামড়া আবৃত করা হয়। খোলের গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত দুটি তার বেঁধে দেওয়া হয়। মাথায় দুটি কাঠি পেঁচানো থাকে। এর সাহায্যে তার বাজনার উপযোগী করে রাখা হয়।

www.pathagar.com

ঘ. ঢোল

নানা অনুষ্ঠানে ঢোলের ব্যবহার অপরিহার্য। গান, নাচ, বিয়ে-অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা, পূজাপার্বণ, হরেক লোকজ খেলায় ঢোলের ব্যবহার হয়ে থাকে। মাটি বা কাঠের লম্বা খোলের দুই মুখ ফাঁকা রাখা হয়। শুকনো চামড়া দিয়ে খোলা মুখ দুটি ঢেকে দেওয়া হয়। মোটা সুতো দিয়ে দুই মুখের চামড়া টেনে বেঁধে রাখা হয়, যাতে করে যথাযথভাবে বাজানো সম্ভব হয়।

ঙ. ঢাক

মূলত ঢোলের বৃহৎ আকারের সংস্করণ হলো ঢাক। পূজা-পার্বণ উৎসবে ঢাক বাজানো হয়। বড় ধরনের অনেক উৎসবের সূচনা হয় ঢাকে বাড়ি দিয়ে অর্থাৎ ঢাক বাজানোর মধ্য দিয়ে। ঢাকের আওয়াজ খুব তীক্ষ্ণ এবং বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চ. হারমোনিয়াম

এটি একটি সুপ্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। হারমোনিয়াম সকল ধরনের গানের সাথে মেলানো যায়।

ছ. কর্নেট

কর্ণেট এক ধরনের বাঁশি হিসেবেই এলাকায় পরিচিত। কর্ণেটের আওয়াজ না হলে যাত্রাপালা হয়ই না। এ অঞ্চলে যাত্রাপালা, সার্কাস, বিয়ে, বরযাত্রা, পূজা-পার্বণে কর্ণেট ব্যবহৃত হয়।

জ. ডুগডুগি

গোপালগঞ্জ অঞ্চলে ডুগডুগির ব্যবহার বেশ দৃষ্টিগোচর হয়। এটিকে গুরুত্বপূর্ণ একটি লোকবাদ্য বলা যায়। সাধারণত সাপুড়ে, বেদে, বিভিন্ন পেশার ফেরিওয়ালারা ডুগডুগি বাজিয়ে মানুষকে বিশেষ করে বাচ্চাদের আকৃষ্ট করে। সাপখেলা, বানরখেলা দেখানোর সময় সাপুড়ে ও বেদেরা ডুগডুগি বাজায়। এর নির্মাণ কৌশল সহজ এবং উপকরণও সহজলভ্য। সাধারণত কাঠের খোলের দুপাশে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ডুগডুগি তৈরি করা হয়।

ঝ. অন্যান্য

উপরোক্ত লোকজ বাদ্যযন্ত্রগুলোর বহুল ব্যবহারের বাইরে আরও কিছু লোকবাদ্যের অল্পবিস্তর ব্যবহার চোখে পড়ে। এগুলোর মধ্যে শঙ্খ, খোমক, সারিন্দা, কাঁসি, মন্দিরা, করতাল, বেহালা, চাকি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

১. নববর্ষ

নববর্ষ অর্থ নতুন বছর। বাঙালির জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে নববর্ষ বলতে বোঝায় ১লা বৈশাখকে। আমরা অনেকেই জানি এদেশে তিনটি বর্ষ প্রচলিত আছে। আর এগুলো প্রচলিত ছিল সেই মোগল ও ইংরেজ আমলে। তারও আগে শকাব্দ সন চালু ছিল এই অঞ্চলে। এদেশে মুসলমানরা চালু করেন হিজরি সন, যার উদ্ভব মধ্যপ্রাচ্যে। ইংরেজরা চালু করেন খ্রিষ্টাব্দ।

সম্রাট আকবর ছিলেন ভারতবর্ষের জনপ্রিয় শাসক। তিনি এদেশের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে এবং খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে তার মন্ত্রীরা সদস্য আমির ফতেহ্ উল্লাহ সরাজীর মাধ্যমে বাংলা সন চালু করেন এবং বৈশাখকে প্রথম মাস নির্ধারণ করেন সেই ১৫৫৬ সালের ১১ই এপ্রিল। আর বাংলা নববর্ষ শুরু হয় ১৫৮৫ সালে। পয়লা বৈশাখ মানে বাংলা সনের বৈশাখ মাসের প্রথম দিন। এ দিনটি নতুন বছরের প্রথম দিন হিসেবে আমাদের দেশে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে পালন করা হয়। জেলার সর্বত্র বাংলা নববর্ষ আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়।

বাংলা সনের প্রাচীন উৎসব অনুষ্ঠান : বাংলা নববর্ষের সাথে কতকগুলো সর্বজনীন এবং কিছু আঞ্চলিক উৎসবের যোগ রয়েছে। সর্বজনীন উৎসবের মধ্যে আছে মেলা। গ্রামবাংলায় চৈত্র সংক্রান্তি বা পহেলা বৈশাখে প্রাচীনকাল থেকেই অনেকে মেলা থেকে সারা বছরে সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতো। এসব দ্রব্যের মধ্যে ছিল শখের জিনিস যেমন–পুতির মালা, সুগন্ধী তেল, সাবান, আলতা, খেলনা, খাদ্যদ্রব্য, হাঁড়ি-পাতিল, দা-কুড়াল, বটি ইত্যাদি। এ ছাড়া ছিল বিনোদনের আয়োজন নাগরদোলা, পুতুলনাচ, বায়স্কোপ, যাত্রা ইত্যাদি।

পুণ্যাহ : জমিদার বাড়িতে এই অনুষ্ঠন হতো। প্রজারা জমিদার বাড়িতে যেয়ে ওই দিন খাজনা দিত এবং জমিদার বাড়িতে মিষ্টিমুখ ও আদর-আপ্যায়নের সুযোগ পেত। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর বাংলাদেশ থেকে এ উৎসব উঠে গেছে। তবে এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে এই প্রথা চালু আছে।

হালখাতা : হালখাতাও একটি সর্বজনীন উৎসব। এটা প্রধানত ব্যবসায়ীদের অনুষ্ঠান। ব্যবসায়ীরা সেদিন পুরনো বছরের হিসাব নিকাশ সমাপ্ত করে এবং নতুন বছরের জন্য হিসেবের খাতা খোলে। সেদিন তারা ক্রেতাদের আপ্যায়ন করে থাকে।

আমানী : কৃষকের নববর্ষের সুপ্রাচীন আচারমূলক অনুষ্ঠান। চৈত্র সংক্রান্তির রাতে বাড়ির গিন্নি একটি ঘটে আতব চাল এবং আমের কচি ডালের গোড়া ভিজিয়ে রাখতেন। সকালে বাড়ির সকলের গায়ে সেই পানি ছিটিয়ে দেওয়া হতো। লোকবিশ্বাস নববর্ষে এতে বাড়ির সকলের সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।

www.pathagar.com

২. নবান্ন

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলের এই বঙ্গদেশে ফসল পার্বণের মধ্যে নবান্ন উৎসব অগ্রগণ্য। বহুপূর্বে অগ্রহায়ণ মাসকে বছরের প্রথম মাস ধরা হতো। অগ্র মানে প্রথম বা আগ, আর হায়ন মানে বছর। বছরের প্রথম মাস বলে অগ্রহায়ণ মাস নামকরণ করা হয়েছিল। অন্যান্য মাস থেকে এই মাসের ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। নবাগত শীতের আমেজের এই ঋতুটি নতুন ধান ও নানাবিধ সুখাদ্যের জন্য ছিল প্রসিদ্ধ। সদ্য তোলা কাঁচা ধানের গতর থেকে মৌ মৌ সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো। কৃষক পরিবারগুলোতে বয়ে যেত অনাবিল আনন্দ। অবস্থাসম্পন্ন পরিবারগুলো জেগে উঠতো নবান্ন উৎসবের পসরা নিয়ে। এই নবান্ন উৎসবটি সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমান সেচ প্রকল্প ও বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের ফলে আমন ধানের চাষ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে এই জনপদে আগের মতো ধুমধামের সহিত নবান্ন উৎসব পালিত হয় না। বিশেষ করে এটি একটি পারিবারিক উৎসব। নবান্ন উৎসব পালনকারী একজন গৃহকর্তা কংশুরের গৌরাঙ্গ দাস বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করলেন-'এই নবান্ন পার্বণটি পিতৃপুরুষদের পার্বণ হিসেবে আমরা গণ্য করে থাকি। যদিও এর কলেবরে আগের থেকে অনেক ভাটির চিহ্ন লেগেছে। আজও ঐ দিনে আমরা পূর্ব পুরুষদের শ্রদ্ধা-অর্পণে স্মরণ করে থাকি। ব্রাহ্মণদেরকে উপস্থিত রেখে জাঁকজমক সহকারে ছোট বেলায় আমরা এই পার্বণ করতে দেখেছি। এখনও মাঝে মাঝে এই উৎসবটি পালন করি বটে, আগের মতো আর হয় না। নতুন ধানের শীষ থেকে ধান ছাড়ায়ে পৃথক করে রাখতে হয়। সেই ধানের চাউল গুঁড়া করে দুধ ও মিষ্টি দ্রব্যের সাহায্যে তৈরি করা হয় নবান্ন। চিড়া-মুড়ি ফলমুল এগুলোও থাকে। পাড়া-পড়শি উপভোগ করে এই নবঘন পার্বণটি। তদুপরি প্রত্যেক গেরস্ত সাধ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের খাবারের আয়োজন করে থাকতো। বাংলায় এসব ঐতিহ্য ধীরে ধীরে যেন মুছে যাচ্ছে। এগুলো ধরে রাখার জন্য মানুষ কই?'

৩. ফল্গু-উৎসব

ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও প্রতিপদের সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব হয়। অনুষ্ঠানের আগের দিনে হয় বহ্নুৎসব। এই বহ্নুৎসব খুব আনন্দ সহকারে কিশোর বালকরা উপভোগ করে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যখন সখিদের নিয়ে এই আনন্দঘন উৎসবের আয়োজন করলেন তখন বাধ সাধলেন কুটিলা। হোলিখেলার আগের দিন কুটিলা বুড়ি একটি পর্ণ কুটিরে বসে তাদের অমঙ্গল কামনা করতে থাকেন। কৃষ্ণের সাথিরা তা জানতে পেরে কুটিলা বুড়ির সেই পর্ণ কুটির আগুন ধরিয়ে ভস্মিভূত করে দেয়। সেই থেকে দোলের আগের দিন কিশোর বালকরা রাশীকৃত খড় ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ সংগ্রহ করে একটি কুড়ে ঘর বানিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি হলো বহ্নুৎসব। দোলের দিনে রাধাগোবিন্দের দোলার সঙ্গে হোলিগান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা বের হয়। সাতপাড় বৌলতলী, কুষ্ণপুর এলাকায় কৃষ্ণভক্তরা এই হোলি খেলায় অংশ নেয়। রাস্তাঘাটে দেখা যায় রঙের ছড়াছড়ি।

www.pathagar.com

৪. গায়ে হলুদ

বিয়ের আগের দিনে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান খুবই আকর্ষণীয়। এই অনুষ্ঠান উভয় পক্ষের স্ব-স্ব বাড়িতে হয়। পাড়ার বৌ-ঝিরা আসে গায়ে হলুদ লাগাতে। রান্না করা হয় ক্ষীর-পায়েস। তিল-তুলসী-দূর্বা-ধান কপালে ছোঁয়ায়ে হিন্দু পরিবারগুলো গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। যেসকল সধবার সন্তান-সন্ততি অক্ষত ও জীবীত আছে কেবলমাত্র তারাই বর ও কনের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানাদির কর্ম ক্রিয়া করে থাকে। হাতে মেহেদি, গায়ে হলুদ ও পায়ে আলতা দিয়ে কনেকে করে তোলে সৌন্দর্যময়ী। তেমন একজন সধবা নারী মঞ্জু রাণী দাস (৫২) বললেন, 'এই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে আমরা গানও গেয়ে থাকি।' যেমন–

কওছে কওছে কওছে অলদি
তোমার জম্ম কাহার লাগি রে অলদি
আমার জন্ম বাঁশ বাগানে
নবীনা নয়নার গায়ে লাগি
ওরে সখি নবিনা নয়নার গায়ে লাগি।
কওছে কওছে কওছে অলদি
তোমার জন্ম কাহার লাগিরে অলদি
আমার জন্ম ঘরের কানছি
কামিনীর গতরে লাগি
ওরে সখি কামিনীর গতরে লাগি।

৫. বিবাহ

বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে চলে বর-কনে দেখা দেখির পর্ব। সর্বাগ্রে কনে দেখার পর্ব। ছেলের অভিভাবকগণ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি পূর্ব নির্ধারিত দিনে কনে দেখতে যান। কনে দেখার অনুষ্ঠানে কনের পক্ষ নামী দামী খাবারের আয়োজন করে বর পক্ষকে দুর্বল করতে চেষ্টা করে। কনে দেখার পর্বটি বেশ চমৎকার। বর পক্ষ গোলাকৃতি হয়ে নকশিকাঁথায় বসে। কনে পানের থালা নিয়ে এসে ভক্তি করে ওই আসরের এক কোণে আশ্রয় নেয়। অন্তর তার থর-থর করে কাঁপতে থাকে। না জানি কি বলে আর কি বলি। বরের পক্ষ থেকে টুকি-টাকি প্রশ্ন ছুটে আসে। তার ভিতর প্রথম থাকে 'তোমার নাম পরিচয়' বল। সব থেকে মজার ঘটনা হলো–বাড়ির অন্যান্য বালিকারা ও মহিলারা দরজার ফাঁক, বেড়ার ফাঁক দিয়ে অনুষ্ঠান দেখে আর ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করে কন্যাকে উত্তর দানে সহায়তা করে। বরপক্ষ মেয়ের রূপ-গুণ, বাড়ির পরিবেশ, বংশ মর্যাদা, আপ্যায়ন সব যাচাই করে পছন্দ অপছন্দ নির্ধারণ করেন। মেয়ে দেখার অনুষ্ঠানে মেয়ের সম্মানার্থে নগদ টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়।

ছেলে দেখার পর্বটি ঐরকম। কনের অভিভাবকবৃন্দ ছেলের বাড়ি গিয়ে পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা, ছেলের চরিত্র সবকিছু দেখে পছন্দ হলে উভয় পক্ষ পঞ্জিকা দেখে ভালো দিনক্ষণ ঠিক করে বিয়ের দিন ধার্য করেন। তবে বিয়ের আগে বরপক্ষ কনের বাড়িতে গহনা, কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়ে আশীর্বাদ করে আসে। এতে থাকে সোনার

www.pathagar.com

আংটি, বড় রুই মাছ, পান-সুপারি, মিষ্টি ইত্যাদি। অতঃপর বর কনে অপেক্ষা করতে থাকে কবে আসবে সেই বিয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ।

বিয়ে : গায়ে হলুদের পরে প্রতীক্ষার চাওয়া সেই বিয়ে অনষ্ঠান, সবাই এক পলক দেখতে চায়। কনের বাড়িতেই সেই বিয়ে পর্ব সু-সম্পন্ন হয়। নওশা পায়জামা-পাঞ্জাবি আর মাথায় টোপর পরে বরযাত্রীদের প্রধান আকর্ষণ ও মধ্যমনি হয়ে উপস্থিত হয় কনের বাড়ির সিংহ দরজায়। অনেকে শেরওয়ানি পরেও জামাই সাজে, পায়ে থাকে নাগরা জুতা। এক্কেবারে শাহেন শাহ্। বরযাত্রীর প্রবেশ দ্বারে সুসজ্জিত করে বানানো হয় গেট। ওই গেটে কনের পক্ষের যুবক যুবতীরা চিনি, বাতাসা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এ দিকে বরের শুভাগমন সংবাদ পেয়ে কনে দুধ পানিতে হাত ভিজিয়ে রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত কাবিন রেজিস্ট্রি না হবে, ততক্ষণ কনেকে দুধ পানিতে হাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। এর অর্থ হলো দাম্পত্য জীবনে বরের মেজাজ ও মর্জি দুধ পানির মতোই ঠান্ডা থাকবে। সেই প্রবেশ দ্বারে অবস্থানরত যুবক-যুবতীদের প্রবেশ মূল্য না চুকিয়ে ওই ভবসমুদ্র পার হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে চলতে থাকে বাকবিতণ্ডা। নানা ধরনের প্রশ্নও ছুঁড়ে মারা হয় বর পক্ষের দিকে। যেমন–

> 'আসসালামু আলাইকুম অ্যান
> নওশা আইছে শাদী করতে
> তোমরা আইছ ক্যান"।

বরের পক্ষ এর উত্তর দিচ্ছে এমনভাবে–

> ওয়ালাইকুম সালাম ওভা
> নওশা আইছে শাদী করতে
> আমরা তার শোভা।

অবশেষে কথা কাটাকাটি শেষ করে বরকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় বিবাহ অনুষ্ঠানে। বিয়ে শেষে কন্যা বিদায় পর্ব আসলে হৃদয় বিদারক এক দৃশ্য। মা-বাবা-ভাই-বোন তাদের এত দিনের পালিত ধন আজ সে আপন ঘরপানে চলে যাচ্ছে। তাদের দাম্পত্য জীবন কেমন কাটবে, কীরকম হবে ভবিষ্যৎ জীবন। সকলে অশ্রু-সজল চোখে বিদায় দেয় নব দম্পতিকে।

হিন্দুদের বিয়ে সধারণত রাতে অনুষ্ঠিত হয়। এ বিয়েতেও গেটে প্রবেশ মূল্য না দিয়ে ঢোকার কোনো সুযোগ থাকে না। বিয়েতে উঠানে সুসজ্জিত করে বসার ব্যবস্থা করা হয়। মুখোমুখি হয়ে কনের পক্ষ ও বরপক্ষ বসে। গ্রামবাসী প্রথমে জানতে চায় বর কে? তার পর বরযাত্রীদের মাঝখানে থেকে বড় উঠে এসে প্রণাম করে সামনে পিড়িতে এসে বসে। বরকে রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্ন শেষে কনের পক্ষ বা গ্রামবাসী বরপক্ষের কাছে আর্থিক সাহায্য চায়। ওই আর্থিক সাহায্য গ্রামের সার্বজনীন কোনো কাজে ব্যয় করা হয়। পরিশেষে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে একজন দাঁড়িয়ে বরকে আশীর্বাদ করে থাকেন। তারপর বরকে নিয়ে যাওয়া হয় বিয়ের পিড়িতে। হিন্দুমতে রেজিস্ট্রির মাধ্যমে বিবাহ হয় না। চন্দ্র, সূর্য, আগুন, জল সাক্ষী রেখে পিতা, পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কন্যা দান করে থাকেন।

www.pathagar.com

৬. চড়কপূজা বা চণ্ডীপূজা

চড়কপূজা বা চণ্ডীপূজা গ্রাম বাংলার একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। চড়কপূজার মাধ্যমেই শিবাসন বা নীলপূজার সমাপ্তি ঘটে থাকে। চড়কপূজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অনেক মেলা। পূর্বপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত চড়ক উৎসব সর্বজনবিদিত। শত শত বছর বয়স এই চড়ক উৎসবের। পূর্বপাড়া চড়ক উৎসবের আকর্ষণীয় দিক হলো শত বছরের পুরোনো চড়কগাছটি পুকুর থেকে তুলে চড়ক মন্দিরের দক্ষিণ মাঠে পোতা এবং মানতকারী বানফোড়া মানুষগুলোকে চড়কগাছে ঘোরানো। এ উপলক্ষে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় চড়কের মেলা। হিন্দু-মুসলমান এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়ে উপভোগ করে চড়কের চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানমালা। চড়কপূজার দিন একটি পাত্রে শিবের বিগ্রহ রাখা হয়। এই পূজার আনুষঙ্গিক বানফোড়া, চড়কগাছে ঝোলানো, হাতে, জিহ্বায় ও পিঠে লোহার শিক বিদ্ধ করা এবং জলন্ত শিক শরীরে ফোড়া হয়। এ উপলক্ষে মেয়েরা শিবের গাজন গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়ায়। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার এ পূজার কিছু নিয়ম বন্ধ করলেও পূর্বপাড়ার চড়ক উৎসবে এসব দেখা যায়। সাতপাড়, টুঠামান্দ্রা, হাইশুর, রাউৎপাড়া ও অন্যান্য স্থানে এই চড়ক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

চড়কপূজা বা চণ্ডীপূজা

এই চড়ক সম্পর্কেও গায়ক খোকন বিশ্বাসের বর্ণনাটি ছিল এরকম-'শ্রীকৃষ্ণ সখিদের নিয়ে একদা রাসলীলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শিবঠাকুর ভাবলেন আমি যাব ওই রাসলীলা দেখতে। তাই নিজরূপ গুপ্ত করে নারী রূপ ধারণ করে তিনি যোগ দিলেন ঐ লীলা অনুষ্ঠানে। দেখা গেলো রাস চলছে না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন হয়তো এখানে কোনো কামুক এসেছে। তাই তিনি একে একে পরীক্ষা করতে লাগলেন, দেখি সে কে। সত্যিই শিবঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের কাছে ধরা পড়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন এখান থেকে ওই

www.pathagar.com

কামুক ভোলাকে বের করে দাও। এতে ভোলানাথ খুব ক্রোধান্বিত হলেন। ভীষণভাবে লজ্জিত হলেন। রাগে ভোলা মহেশ্বর নিজের মাথার জট ছিড়ে ফেলে দিলেন। কী ভয়ানক দৃশ্য ! এতেও শিবঠাকুরের রাগ সম্বরণ হলো না। তাই তিনি নিজের লিঙ্গ ধরে ছিড়ে ফেললেন। ছিন্ন লিঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠে থরথরি কম্পে লাফাতে শুরু করে। পৃথিবী থরথর কাঁপছে। ধরা প্রায় রসাতলে যায়। দেবতারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ছুটে গেলেন গোলাকবিহারী নারায়ণের নিকট। বললেন প্রভু এখন কী করা। শিবঠাকুর নিজ লিঙ্গ ছিড়ে ফেলে দিয়েছেন। ছিন্ন লিঙ্গের কম্পনে ধরা যে রসাতলে যেতে বসেছে। প্রভু নারায়ণ বললেন, ভয় নেই শিব লিঙ্গের পূজা কর। এতে ধরা রক্ষা পাবে। সেই থেকে শুরু হয় শিবলিঙ্গ পূজা। এই শিবলিঙ্গের পূজায় অনেক লোমহর্ষক করণ ক্রিয়া স্থান পেয়েছে। যেমন : পিঠে বড়শি ফুঁড়ে চণ্ডীতে ঘুরানো, খেজুর সান্ন্যাসী ইত্যাদি। খেজুর সন্ন্যাসী চৈত্র সংক্রান্তির দিন বা তার আগেও যেকোনো দিন হতে পারে। খেজুর সন্ন্যাসী হলো খেজুর গাছের মাথায় উঠে কাঁটাযুক্ত ডগা মাড়িয়ে হেঁটে বেড়ানো। এতে সাধারণত শিবাসন বা লিঙ্গপূজায় যারা শাং হিসেবে নিযুক্ত থাকে তারাই অংশ নেয়। তারপর খড়গের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং দাঁড়ানো অবস্থায় অন্যরা তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তবে চড়ক ঘোরা সবচেয়ে আকর্ষণীয়। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে এক পলক চড়ক ঘোরা দেখতে। পিঠে খালি বড়শি বিঁধে কীভাবে একটা মানুষকে ঘুরানো হয় বা সে স্বেচ্ছায় ঘোরে তা অনেক দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

৭. জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমী তিথিতে পূজিত হয় কৃষ্ণের বালগোপাল মূর্তি। এর অপর নাম জন্মাষ্টমী। পালনকারীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তারিখ বা তিথি ভাদ্র কৃষ্ণাঅষ্টমী। পালনের ধরন হচ্ছে উপবাস, কৃষ্ণপূজা, ভক্তিমূলক গান, আলোচনা সভা ইত্যাদি। সম্পর্ক কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্য।

জন্মাষ্টমী বা কৃষ্ণাষ্টমী হিন্দু ধর্মীয় উৎসব। এটি বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়। এর অপর নাম কৃষ্ণাষ্টমী, গোকুলাষ্টমী, অষ্টমী রোহিনী ও শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী ইত্যাদি।

হিন্দু পঞ্জিকা মতে সৌর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যখন রোহিনী নক্ষত্রের প্রাধান্য হয় তখন জন্মাষ্টমী পালিত হয়। উৎসবটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে প্রতিবছর মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময় পড়ে। অনুষ্ঠানটি রাধাকৃষ্ণ, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, জগন্নাথ, শ্রীনাথজি এবং অন্যান্য নামেও পরিচিত। কৃষ্ণ ভক্ত ও বৈষ্ণব ভক্তরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজক। এই উৎসবে যেসকল ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হয় তারমধ্যে ভগবত গীতা, পুরাণ, গীতগোবিন্দ, মহাভারত ও ব্রহ্মসংহিতা উল্লেখযোগ্য। গোপালগঞ্জের প্রায় প্রতিটি হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে এই জন্মাষ্টমী ব্রত পালন হতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা ও পারণ শেষে পরদিন ভক্তরা মহা প্রসাদ গ্রহণ করে থাকে। গোপালগঞ্জের সদর উপজেলায় কংশুর গ্রামে গৌরাঙ্গ দাসের বাড়িতে প্রতিবছর মহা ধুমধামের সাথে এই অনুষ্ঠানটি পালন হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

৮. পৌষ সংক্রান্তি

১.

ও-ওরে ঘোষ গেলো বাথানে সইরে যশোদা গেলো ঘাটে
ও-ওরে শূন্যগৃহ পাইয়া কৃষ্ণ সকল ননী লোটে।
ও-ওরে ননী খাইছে কেরে কৃষ্ণ ননী খাইছে কে
ও-ওরে আমি কৃষ্ণ খাই নাই ননী দাদা খেয়েছে।
ও-ওরে আমি যদি খাইতাম ননী থুইতাম আধাআধি
ও-ওরে ভাই বলরাম খাইছে ননী ভাণ্ড করছে খালি।
ও-ওরে ছাটি হাতে নন্দরাণী পিছে পিছে ধায়
ও-ওরে লম্ফদিয়া উঠল কৃষ্ণ কদমের শাখায়।
ও-ওরে নামো নামো ওরে কৃষ্ণ পেড়ে দেব ফুল
ও-ওরে ডাল ভাঙিয়া পড়বা কৃষ্ণ মাজা ভাঙার কুল।
ও-ওরে ডালে ডালে হাঁটে কৃষ্ণ পাতায় দিয়া পাও
ও-ওরে তাই দেখিয়া নন্দরাণীর চমকে উঠে গাও।
ও-ওরে একে সত্য দুইয়ো সত্য তিনো সত্য কর
ও-ওরে নন্দ হয় তোমার পিতা আমায় যদি মার।
ও-ওরে নেউলিয়া উছঁলায়ে রাণী কৃষ্ণকে নামাল
ও-ওরে গাভী ছান্দা দড়ি দিয়া কৃষ্ণকে বান্ধিল।
ও-ওরে মেরো না মেরো না মাগো বন্ধন জ্বালায় মরি
ও-ওরে মাতুলোরও ধেনু রেখে দেব ননীর কড়ি।
ও-ওরে চেন না চেন না মাগো আমি কৃষ্ণ কে
ও-ওরে এমন সাধ্য নাইরে কের আমায় বাঁধতে পারে।
ও-ওরে পূর্ব জন্মের ছিলে মাগো নামে ধরাসতী
ও-ওরে কাটাস্তনের দুগ্ধ খেয়ে মাগো আমায় বান্ধিলি।

২.

যে দেবে সরায়
তান্নক্ষ্মী খরায়
যে দেবে মুঠি মুঠি
তার আঙুল কুটি কুটি
যে দেবে আচ্যায়
তান্নক্ষ্মী ছ্যাচায়
যে দেবে স্যারে
তান্নাক্ষ্মী ঘরে, ইত্যাদি।

এভাবে যুবকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল বা অর্থ সংগ্রহ করে প্রস্তুতি নেয় বাস্তুপূজার। সংক্রান্তির দিনে নদীর কূলে বা পুকুর পাড়ে কিংবা কোনো জলাশয়ের তীরে

www.pathagar.com

মাটি দিয়ে বেদি তৈরি করে বাস্তুভিটা কল্পনা করা হয়। বাস্তপূজা মানে মাতৃভূমিকে পূজা করা। মাতৃভূমিকে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রে এর উল্লেখ আছে–'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়ষী'। বেদীর কোনো এক ধারে এমনভাবে একটি কুমীর বানায়, মনে হয় যেন বাস্তু ভিটাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। পূজা শেষে পূজারীগণ কুমীরকে বহিঃশত্রু কল্পনা করে দা বা অন্য কোনো অস্ত্র দিয়ে টুকরো টুকরো করে।' এদিকে বাড়িতে বাড়িতে কুলবধূরা বিভিন্ন রংয়ের মাটি বা রং গুলিয়ে উঠানে নানা প্রকার লতাপাতা, পদ্ম ও ছবির আল্পনায় মনোমুগ্ধকর করে তোলে। শুরু হয় চিড়া-মুড়ি খাওয়ার মহা আয়োজন। খাওয়ার এ আনন্দে থাকে না কোনো জাতি ভেদাভেদ। দল বেঁধে এ ঘর থেকে অন্য ঘরে, এ বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি চলে মুড়ি খাওয়ার মহোৎসব।

৯. রথযাত্রা

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটি একটি অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে উৎসবটি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। জগন্নাথ দেবের রথ-ভ্রমণ উৎসব বলেও এটি খ্যাত। ভারতীয় রাজ্য ওড়িশা বা উৎকল দেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মহাধুমধামের সাথে রথযাত্রা উৎসব ভক্তরা পালন করে থাকে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের স্মরণে এই উৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে। এই উপমহাদেশের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রথযাত্রা ওড়িশার পুরী শহরের জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের মহিষাদল ও বাংলাদেশের ধামরাই জগন্নাথ রথ ও ইসকনের রথ বিশেষ প্রসিদ্ধ। গোপালগঞ্জেও এই রথযাত্রা উৎসবটি বিশেষভাবে পালিত হতে দেখা যায়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে মেলাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

রথযাত্রার ধরন : রথযাত্রার দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরসহ এই উপমহাদেশ জুড়ে সকল জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রমূর্তি মন্দিরের বাইরে সর্ব সমক্ষে বাহির করা হয়। তারপর তিনটি সুসজ্জিত রথে (কোনো কোনো স্থানে একটি সুসজ্জিত বৃহৎ রথে) বসিয়ে দেবতাদের পূজা সম্পন্নপূর্বক রথ টানা হয়। পুরীতে রথ টানতে প্রতি বছর লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। এই তিথিতে গোপালগঞ্জ জেলায়ও বহু জগন্নাথ ভক্ত এক আনন্দঘন পরিবেশে রথ টেনে থাকে। পুরীতে বছরে এই একদিনই অহিন্দু ও বিদেশিদের মন্দির চত্বরে এসে দেবদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়। পুরীতে যে রথগুলো নির্মিত হয় তাদের উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট। টেলিভিশন চ্যানেলে এই রথযাত্রা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

১০. গার্সি

গার্সি শব্দের কোনো আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায় না। সঙ্গত কারণে কিংবদন্তি ও কথকথাকারদের ব্যাখ্যা বিবরণী নিয়ে অদ্যবধি গোপালগঞ্জ, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর, কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া, মাদারীপুর ও এর আশপাশ এলাকাগুলোতে মহাধুমধামে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। কিংবদন্তি হতে এই পার্বণটি সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা এরকম–একদা গোলকে বসে মহাপ্রভু নিরঞ্জন সকল দেবতাকে স্মরণ করেন। আমন্ত্রিত দেবতাগণ গোলকে উপস্থিত হয়ে প্রভুকে বললেন, প্রভু আমাদেরকে কী জন্য

www.pathagar.com

স্মরণ করেছেন? মহাপ্রভু বললেন, যার যার শক্তি অনুযায়ী এখানে বসে সাধনা কর। দেবতারা এর কারণ জানতে চাইলেন। প্রভু নিরঞ্জন বললেন, 'বর্ষ পরিক্রমায় এটি একটি উত্তম তিথি। এই মুহূর্তের সাধনার চেয়ে বড় কোনো সাধনা ত্রিভূবনে নেই। তা শুনে দেবতারা যার যার শক্তি অনুযায়ী সাধনা শুরু করেন। তিথিটি হচ্ছে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন। এতে যার যার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। মহাপ্রভু আরও বললেন, মর্তে আমার অনেক ভক্ত আছে তাদের দ্বারে এ তত্ত্ব পাঠাতে হবে। গোলক থেকে ওই পরমতত্ত্ব দেব-দূতেরা মর্তে নিয়ে আসেন। সেই থেকে এই তিথিকে সবাই যোগ তিথি বলে গণ্য করে থাকেন। সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-আউলিয়া এই রাতে যার যার ইস্ট মন্ত্র জপ করেন। গৌরী ডাকিনী বিহারী শিবকে এই রাতটি ভরে বিভিন্ন যোগতত্ত্বের ব্যাখ্যা জানতে প্রশ্ন করেছিলেন। শিবও প্রতিটি যোগতত্ত্বের ব্যাখা শুনিয়েছিলেন। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, শিব শ্মশানবাসী গাঁজাখোর, কদাকারময় ও কুচনি পাড়ায় যেতে অভ্যস্ত। দেবী দুর্গা আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন পড়ন্ত বিকেলে রন্ধন কর্ম শেষ করে স্বামী শিবকে খাওয়ানোর জন্য পতির নিকটস্থ হলেন। মহামায়া দুর্গা তার হাব-ভাব দেখে বুঝতে পারলেন যে, আজ নিশীথে ডাকিনী বিহারের জন্য শিব প্রস্তুত হচ্ছেন। দেবী দুর্গা তাকে ওই পথ থেকে ফেরানোর জন্য বিনয় বচনে এক এক যোগতত্ত্বের ব্যাখ্যা জানতে থাকেন। রাত গভীর হচ্ছে তবুও দুর্গার প্রশ্ন করা শেষ হচ্ছে না। সারারাত চলল দু'জনের মধ্যে যোগতত্ত্বের প্রশ্নোত্তর পর্ব। আধার কেটে গেলো, পাখিরা ভোরের গীত গাইতে শুরু করল। দুর্গা ভাবলেন এখন দিন হয়েছে শিব আর কুচনি পাড়ায় যেতে পারবেন না। তাই তিনি স্বামীকে বললেন, এসো ভাত ব্যাঞ্জন পাক করেছিলাম এবার পেট ভরে খেয়ে নাও। সে থেকে আজও মানুষ আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিনে রান্না করে ১লা কার্তিক খায়। এমনও প্রবাদ আছে–

আশ্বিবে রান্দে বাড়ে কার্তিকে খায়
যে বর চায় বুড়ি সেই বর দেয়।

ছাত্র-ছাত্রীরা সারা রাত জেগে বই পড়ে। যার যে বিদ্যা জানা আছে তা সে এই রাতে তরজমা করতে থাকেন। ধর্ম প্রাণ মানুষগুলো বিভিন্ন ধর্মীয় দেহতত্ত্বমূলক গান পরিবেশন করে থাকেন। ধর্মীয় আবেশে মুসলমানদের শবেবরাতের আদলে এলাকার হিন্দু অধিবাসীরা এটা পালন করে থাকে। সৌহার্দ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশে ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে এটি খ্রিস্টান-মুসলমানদের মধ্যেও চলে এসেছে। মুসলমানদের মধ্যে এই গার্সি পালনের চিত্র যেভাবে ফুটে উঠেছে তা গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা বনগ্রামে হাজার চাঁদ ফকিরের মাজারে গেলে সহজে বুঝতে পারা যাবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভক্তরা ওই গার্সির রাতে যোগদান করে থাকেন। অনেক হিন্দুরাও সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করে হাজার চাঁদ ফকিরের গুণগান করেন। দেখা যায় হিন্দু-মুসলমান ভাবের ঘরে একাকার হয়ে আধ্যাত্মিক গান করে যাচ্ছে।

'দেল কোরান ঠিক না করে আয়াত কোরান কেউ পড় না
মানব দেহের ভেদ জেনে কর সাধনা
আলেফ লাম নাসিকা খানি শেরে দুই কণ্ঠে জানি
জিমে হয় জিকিরের ধ্বনি হেতে হাড়ের গঠনা।
ফেতে ফ্যাপসা পানি পোরা কাপেতে কলেজা ঘেরা

www.pathagar.com

বড় কাপ নাভিতে ঘেরা যেথায় দোমের ঠিকানা।
মুণ্ডুতে মিম হরফ এলো হেজে মগজে ছিল
তে যে দুই কান জানা গেলো, আইন গাইন দুই নয়ন
অধর যুগলে লাম মিম, সর্বঅঙ্গে আলেফের চিন
দুই বাহুতে আছে সিঁন শিন মুখেতে বের গঠনা।
তৈ যে তিল্লতে ছিল, ছুদৎ হৃদয় রাখিল
নফছোতেনু হরফ এলো মুখেতে বের যায় জানা
জিম জিম হামজারে জানগা মুর্শিদের ধারে
দাল জাল দুই জানুর পরে দলিলেতে যায় জানা।
দশ হরফ সাধনার গতি, সাধনে জ্বলে জ্ঞাতের বাতি
নিষ্ঠা রেখে রাতমতি গুরু কর ভজনা।
লাহুদ লাছুদ মালকুত জোবরুৎ, মোকাম আর মোকাম হাউৎ
মেছের কয় দিয়েছে মাবুদ সেথায় কেন খোঁজনা।'

এই গার্সি রাতের শেষ ভাগে দেখা যায় আলোর মিছিল। প্রত্যেক গেরস্ত ছোট ছোট মাটির প্রদীপ জ্বেলে পথে, ঘরের কোণে, দেবালয়ে সাজিয়ে দেয়। গার্সির রাতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ উপভোগ করে কিশোর বালকেরা। তারা দল বেঁধে কলাগাছের ডগা নিয়ে প্রত্যেক ঘরের বেড়ায় সম্মিলিতভাবে পিটায়ে পিটায়ে বলতে থাকে-

•

ইন্দুর বান্দর দূর যা
পাগলার মা'র নোট খুচে খা
ইন্দুর বান্দর দূর যা
ফটিকের মা'র নোট খুচে খা
ইন্দুর বান্দর দূর যা
কেনার মা'র নোট খুচে খা।

•

এই বাড়ির ইন্দুর-বান্দর ওই বাড়ি যায়
ওই বাড়ির শিব ঠাকুর এই বাড়ি আয়।

•

এই বাড়ির ইন্দুর বান্দর ওই বাড়ি যায়
ওই বাড়ির অমর আল্লাহ, এই বাড়ি আয়।

এখানে ইন্দুর-বান্দর বলতে অশুভ উপকরণের কথা ও অসুখ-বিসুখ, রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ দূর করার কথা বলা হয়েছে। বিপরীতভাবে অন্যবাড়ি বা প্রকৃতির কাছ থেকে শুভফলপ্রদ উপকরণকে গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমানের এলাকায়ও এই গার্সির আমেজ ছড়িয়ে পড়ছে। আশ্বিনের শেষের দিন সূর্য ডোবার আগে মহিলারা নিমপাতা, বেলপাতা, কাঁচা হলুদ, তেঁতুল ইত্যাদি যোগাড় করে রাখে। ভোরে সেসব পাটায় পিষে গায়ে মেখে স্নান করার রেওয়াজ এখনও প্রচলিত। এটি হলো শীতের

www.pathagar.com

দিনে গায়ের মলিনতা দূর করার পূর্ব প্রস্তুতি। মুখে তেঁতুল পোড়া লাগানোরও রীতি আছে। শীতের দিনে ত্বককে লাবণ্য রাখার এটি একটি সুন্দর পদ্ধতি।

১১. লাল নিশান তত্ত্ব

হরিচাঁদের যোগ্য ছেলে গুরুচাঁদ ঠাকুর সর্বপ্রথম ১৮৮০ সাল থেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রয়াসে মহাবারুণী উৎসব শুরু করেন। এই অধ্যাত্ম পুরুষ ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা প্রথমেই সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের দিক লক্ষ্য দিলেন। তিনি প্রথম নজর দিলেন নির্যাতিত, নিপীড়িত, শিক্ষা বঞ্চিত জাতির দিকে। তাইতো তাঁর মতুয়াদের মধ্যে সিংহভাগ মতুয়াভক্ত নিম্নবর্ণের লোক।

আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান এই মহামানব, অন্ধকারাচ্ছন্ন, অক্ষরজ্ঞানশূন্য জাতিকে ধর্মজ্ঞান সৃষ্টির জন্য, জাতিকে জাগ্রত করার জন্য তিনি প্রতীক চিহ্নস্বরূপ লাল রঙের তিন কোনো বিশিষ্ট লাল নিশান এবং নিশানের সাদা কাপড়ের ঝুলন সংযুক্তির বিধান রেখেছেন।

প্রত্যুষের উদীয়মান সূর্য লাল হয়ে উদিত হয় পূর্ব আকাশে। কোনো বাধা মানে না সে। এগিয়ে চলে সামনের দিকে। আলো ছড়িয়ে দেয় সারা পৃথিবীতে। তদ্রুপ এ অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতিকে সূর্যের ন্যায় অগ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। প্রত্যুষের লাল সূর্যের রঙে লাল নিশান তুলে দিয়েছে মাতুয়া ভক্তদের হাতে। জাতির অগ্রযাত্রার এক নিদর্শন মাত্র। আর নিশানের সাদা পাড়ের অর্থ হলো শান্তির প্রতীক।

১২. মহাবারুণী উপলক্ষে অনুষ্ঠান

ঘৃতকান্দী

জনশ্রুতি আছে যে, এই গ্রামে পূর্বে বিরাট গোচারণ ভূমি ছিল। গরু-মহিষ পালনের উপযুক্ত পরিবেশ থাকায় এখানকার বেশিরভাগ লোকে গাভী পালন করত এবং দুধ থেকে ঘৃত তৈরিতে পারদর্শী ছিল। উন্নতমানের ঘৃতের চাহিদাও বেড়ে যায় চারদিকে। গ্রামের মাঝখানে বিরাট পুকুর ছিল। যার নিদর্শন আজও দেখা যায়। এই পুকুর পাড়ে সপ্তাহে একদিন করে বসতো ঘৃত বাজার। সেখান থেকে এর নাম হয় ঘৃত বাজার; তা থেকে ঘৃতকান্দী।

শ্রীধাম ওড়াকান্দী গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত এই গ্রামটি। পূর্ব থেকেই হিন্দুদের বসত এই গ্রামে। শিক্ষায় বেশ উন্নত। অর্থ সম্পদেও পিছিয়ে নেই এরা। আদর্শ গ্রাম চৈত্র মাসের মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যু তিথিতে শ্রীধাম ওড়াকান্দি অনুষ্ঠিত হয় মহাবারুণীস্নান। স্নান উপলক্ষে বারুণীর দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম পাশ থেকে যত মতুয়া ভক্তের আগমন ঘটে, তাদের প্রত্যেককেই খিচুড়ি খাবারের ব্যবস্থা করে এই গ্রামবাসী। প্রায় ৩ একর জমি নিয়ে তৈরি করে প্যান্ডেল। থাকার ব্যবস্থাও এখানে থাকে। অন্তত এক হাজার লোক একই সঙ্গে বসে খেতে পারবে, এমন ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়। প্রায় একশত পরিবার এই খাবার পরিবেশন করে। খাবার পরিবেশনে প্রায় অর্ধেক যুবকই থাকে মুসলমান। জাতপাতের কোনো বালাই নেই এখানে। সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলন মেলা।

www.pathagar.com

১৩. অন্যান্য উৎসব

ক. ঈদ-উৎসব

ঈদ উৎসব মুসলমানদের কাছে অতি প্রিয়। দুটি ঈদেই জেলার সর্বত্র এই উৎসব আনন্দ হৈ হুল্লোড়ের মাধ্যমে পালন করা হয়। তবে ঈদুল ফিতর, যা ত্রিশ রোজার শেষে পালিত হয় তা কোরবানি ঈদের চেয়ে অনেক আনন্দের ও খুশির আমেজ বয়ে আনে।

ঈদ উৎসব

ঈদ উৎসব এলেও এর বাহ্যিক আচরণ অনেক বদলেছে। সেকালে গোপালগঞ্জের সমগ্র এলাকার সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে ঈদ উৎসব পালন করতো। এমনিতেই গোপালগঞ্জের সমগ্র এলাকার মানুষ কৃষিজীবী এবং হত দরিদ্র। তখন দুটো ফসল ফলতো। অনেক বছর ধানি মাঠ পানির তলে ডুবে থাকতো। কর্মজীবী মানুষেরা আবাদ করতে পারতো না। ফলে অভাব লেগেই থাকতো সারাবছর। এই উৎসব বলতে যা বোঝায়, তা কখনও দেখা যায়নি গোপালগঞ্জের শহর ও তখনকার থানা এলাকায়। সাধারণ মানুষ ঈদের দিন ঈদের নামাজ আদায় করতো। যারা একটু স্বচ্ছল, তারা আখের গুড়ে শিন্নি রান্না করে খেতো। সকালে সামিয়ানা টাঙিয়ে খোলা মাঠে বা বটগাছের ছায়ায় ঈদের নামাজ আদায় করা হতো। শিক্ষিত ঘরের ছোট সন্তানেরা বড়দের পা ছুঁয়ে সালাম করতো। শুকনো মৌসুমে ঈদ এলে ছোটরা আকাশে ঘুড়ি ওড়াতো। কোথাও ঘোড়দৌড় বা ষাঁড়ের লড়াই হতো। অবস্থাসম্পন্ন পরিবারে খানাপিনার বাড়তি আয়োজন থাকতো। পরিবারে শিন্নির চালই জোটাতে পারতো না বলা যায়। ঈদের এই বর্ণনা ৫০ বছর পূর্বের। বর্তমানে সেকালের ছবি আর দেখা যায় না গোপালগঞ্জের কোনো এলাকায়। দিন পালটেছে, মানুষের জীবনাচরণ বদলেছে। সেকালের অর্থাভাব এখন আর নেই। এলাকার কৃষিজীবী মানুষ ক্ষেতে দুই/তিন ফসল ফলায়। শিক্ষার হার বেড়েছে। প্রতিটি পরিবারে কেউ না কেউ চাকরি করছে। এখন

www.pathagar.com

সমগ্র গোপালগঞ্জের আনন্দের আমেজ নিয়ে ঈদ উৎসব পালিত হয়। আর এই আনন্দে দেখা যায় আধুনিকতার ছোঁয়া। ঈদের চিরাচরিত আচারণগুলোর মধ্যে যোগ হয়েছে খানাপিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আমোদ-আনন্দে গানবাজানার ধুমধাড়াক্কা। মিডিয়ার মাধ্যমে সে আনন্দ পৌঁছে যায় গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘরে।

খ. দুর্গোৎসব

শারদীয়া দুর্গোৎসব এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। এর বিশেষ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। একমাস বা দুই মাস পূর্ব থেকে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন আরম্ভ হয়। মৃৎভাস্করগণ যখন প্রথম মূর্তি বানাতে আসে সেদিন থেকে শুরু হয় এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানের দিন গোনা। বালক-বালিকার এক অনির্বচনীয় আহ্লাদে ডুবে থাকে। গোপালগঞ্জ জেলায় শত শত মণ্ডপে দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। পাঁচ দিনব্যাপী ব্যয়বহুল দুর্গাপূজা চালানো এককভাবে অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় বিভিন্ন এলাকায় পাড়া প্রতিবেশী যৌথভাবে এ পূজার আয়োজন করে থাকে। যারা বিত্তবান তারা এককভাবে এই পূজা চালিয়ে যান। দিবসের প্রথমভাগে এ পূজা সংঘটিত হয়ে থাকে। কলা বৌয়ের পূজার মাধ্যমে দুর্গাপূজা শুরু হয়। এই পূজার বিশেষ আকর্ষণ মহানবমীর কুমারী পূজা। প্রায় প্রতিটি পূজা মণ্ডপে দিবসের পূজা শেষে রাতভর চলে নাচগানের মহড়া। কোথাও কোথাও যাত্রাগানও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দূর্গা প্রতিমা

গোপালগঞ্জ জেলা শহরে কেন্দ্রীয় মন্দিরে ও গৌহাটিতে যে পূজা হয় তা বেশ আকর্ষণীয়। দূর-দূরান্ত থেকে দর্শকরা ছুটে আসে মা দুর্গাকে প্রণাম জানাতে ও অনুষ্ঠান উপভোগ করতে। সম্প্রতি সদর উপজেলার আড়ুয়াকংশুর গ্রামে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা অত্র অঞ্চলের জনগণের দৃষ্টি কেড়েছে। মুসলসান অধ্যুষিত এলাকায় এত জাঁকজমক

www.pathagar.com

সহকারে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালিত হওয়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় করেছে।

বনগ্রামের সহৃদয় মুসলমানরা এই পূজার নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। যেমন–নওয়াব আলী ফকির (৬৮), রুস্তু মোল্লা (৬৭), ফিরোজ ফকির (৪৭), মহসিন ফকির (৪৩) সাহাবুদ্দিন মোল্লা (৫৭), শান্ত মোল্লা (৫৫), কাওছার ফকির (৬৩), মহসীন মোল্লা (৩২) উল্লেখযোগ্য। পূজা সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের সার্বিক সহযোগিতা স্মরণযোগ্য।

এখানকার মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অন্য কোনো পূজামণ্ডপে দেখা যায় না। এমনকি শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীও পূজামণ্ডপে সুন্দর সুন্দর সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। এই শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রতিষ্ঠাতা লোকসাহিত্য গবেষক দীনেশ চন্দ্র পাণ্ডে। বিজয়া দশমীর দিন নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের ফলে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিসর্জন শেষে ভক্তরা পরস্পরের সাথে প্রণাম ও কোলাকুলি করে থাকে। দুর্গোৎসবের এই বৃহৎ আনন্দ বিয়োগের ধাক্কা হঠাৎ সামলানো কষ্ট বিধায় ৪ দিন পরে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার বিধান করা হয়েছে বলে প্রাচীনেরা বলে থাকেন।

কোটালীপাড়ার দুর্গাপূজার সেকালে খ্যাতি ছিল। কোটালীপাড়ার উনশিয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকের গ্রামগুলোয় অনুষ্ঠিত হতো দুর্গাপূজা। ধনী পরিবারের লোকেরাই এ পূজা করতেন। উনশিয়া-পশ্চিমপাড়া ছাড়া পরগণার গ্রামগুলোর যেখানে সাধারণ হিন্দুদের বসবাস, তারা কখনও পূজা করতো না। এরা ছিল জেলে, বাড়ৈ ও সাধারণ কৃষক। পূজার ব্যয়ভার তাদের বহন করা সম্ভব ছিল না।

অন্যদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও চাইতো নিম্নবর্ণের হিন্দুরা না করুক। ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় হাজার খানেক পূজা সেকালে অনুষ্ঠিত হতো। এসময় পূজায় মুসলমানেরাও নেমতন্ন পেত। তাদের জন্য আলাদা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। পূজার সময় সমগ্র কোটালীপাড়াকে মনে হতো উপশহর। রাতে হ্যাজাকের আলোয় কোটালীপাড়ার গ্রামগুলো ভাসতো।

এসব পূজার মধ্যে সিকিরবাজারের রাইচরণ বাবুর বাড়ির পূজা, পশ্চিমপাড়ার পাচু চৌধুরীর বাড়ির পূজা ও উনশিয়ার রামধন সাহার বাড়ির পূজা ধুমধামের সাথে অনুষ্ঠিত হতো। পূজা উপলক্ষে কোনো কোনো মণ্ডপে মুসলমান বয়াতিরা দলবেধে গান পরিবেশন করত। রাখি বন্ধন অনুষ্ঠিত হতো দুর্গা পূজায়। বর্তমানে পূজার সংখ্যা বেড়েছে। সাহা, বণিক ও চৌধুরীদের দুর্গা সাধারণ হিন্দু কর্তৃত্বের ঘরে ঠাঁই নিয়েছে। হয়তো সে আনন্দ নেই, কিন্তু আছে প্রাচীন রীতি-নীতি ও ভালোবাসার বন্ধন। জনশ্রুতি আছে, একবার দুর্গাপূজায় নরবলি হয়েছিল। নরবলি হয়েছিল সত্যি, তবে ইচ্ছে করে, না অনিচ্ছায় তা আদৌ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

মানুষের কাছে শোনা যায় কোটালীপাড়ার পশ্চিম পাড়া গ্রামের নিবাস পাচু চৌধুরীর বাড়িতে সেকালে আনন্দ হৈ-হুল্লেড়ে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতো। এই চৌধুরী পরিবার ছিল ধনে-মানে অভিজাত। বাড়ির সবাই ছিল শিক্ষিত এবং চাকুরে। পূজার সময় গম গম করতো বাড়ি। বাড়ির প্রাঙ্গণে ছিল স্থায়ী পূজা মন্দির। এই মন্দিরে হতো দুর্গাপূজা। মান্দিরের সামনে ছিল আটচালা টিনের ঘর। অদূরে বালির বেদি বা কাঠগড়া কিংবা ধুপকাষ্ঠ।

www.pathagar.com

দুর্গাপূজা উপলক্ষে মন্দিরের সামনে স্থাপিত বলির বেদিতে প্রতি বছর মহিষ বলি দেওয়া হতো। সাধারণত সপ্তমী থেকে নবমীর দিনে মহিষ বলি দেওয়া হতো। একবার বলি দেওয়ার জন্য একটি বিরাট মহিষ 'চান' (স্নান) করে সাজিয়ে আনা হলো বেদীর কাছে। আগেই ধার্য করা হয়েছিল পাচু চৌধুরীর বড় জামাতা মহিষ বলি দেবেন। তিনি শক্তিশালী খড়গ চালাতে ওস্তাদ ছিলেন। সেবার তার এককোপে বলি হয়েছিল একটি মহিষ ও তার পুত্র। পাচু চৌধুরী ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তি। বলির খবরটি ধামাচাপা দিয়ে রাখেন। ঢাক-ঢোলের আওয়াজে হত্যার খবরটি অনেকের কাছে অজানা থেকে যায়। পূজার আনন্দের মধ্যে লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয় অজ্ঞাতে। কিছুদিন পর বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টি আইন-আদালতে গড়াতে পারেনি। তারপর থেকে ওই মন্দিরে পূজা হয়েছে ঠিকই কিন্তু মহিষ বলি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এখনও অনেকে বলাবলি করেন যে, আসলে পাচু চৌধুরীর ভুলের কারণে তার ছেলের গলা কাটা যায়। ছেলেটি কোপ দেবার সময় মহিষ ধরতে গিয়ে সামনে পড়ে। ঘটনা যাই হোক না কেন, নরবলি যে হয়েছিল তা একদম সত্য।

পাচু চৌধুরীর বাড়ির সেই দুর্গাপূজা এখনও অনুষ্ঠিত হয়। তবে বাড়িতে নয়, এটি অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে, যা সর্বজনীন রূপ পেয়েছে।

গ. শ্যামাপূজা বা কালীপূজা

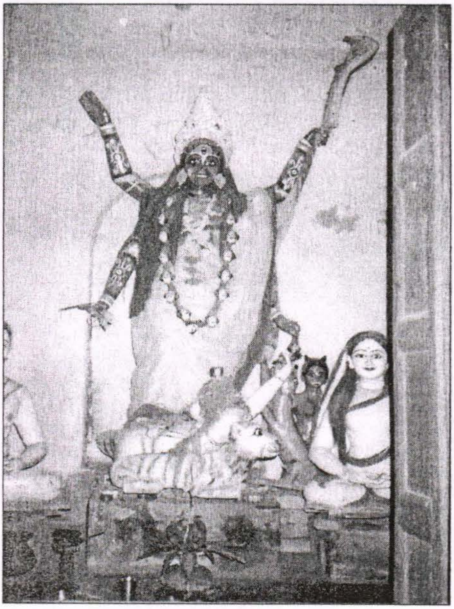

কালী প্রতিমা

www.pathagar.com

কালীপূজা দুর্গাপূজার মতো ব্যয়বহুল নয়। এ কারণে শ্যামাপূজা প্রায়ই এককভাবে করতে দেখা যায়। যে বাড়িতে দুর্গাপূজা হয় বেশির ভাগ সে বাড়িতে শ্যামাপূজাও হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার পরবর্তী অমাবস্যাতে কালীপূজা হয়। অমাবস্যার গভীর নিশীথে এই পূজা হওয়ার কারণে বালক-বালিকার বেশি আনন্দ উল্লাস করতে পারে না। তবে পূজার দিন ভূত চতুর্দশীতে কিশোর-কিশোরীরা খুব উৎসাহ উদ্দীপনায় দীপমালার আয়োজন করে থাকে। এই কারণে শ্যামা পূজাকে দীপাবলি পূজাও বলা হয়। উক্ত তিথি ছাড়াও অনেক এলাকা আছে সেখানে মাঘ মাসের অমাবস্যায় বা তাদের সুবিধামতো দিন তারিখে এই কালীপূজার আয়োজন হতে দেখা যায়। তবে দিনটি হতে হবে অমাবস্যা তিথিতে। টুঠামান্দ্রা, সাতপাড় ও নিজড়া শ্যামপূজার জন্য বিখ্যাত।

পূর্বপাড়ার ঐতিহ্যবাহী কালীপূজা

কোটালীপাড়ার পূর্বপাড়া একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এ গ্রামের সবাই হিন্দু। এই গ্রামের কালিমন্দিরটি আগে ছিল গ্রামের পশ্চিম পাশে আনন্দ পুকুরের পাড়ে। তিনশত বছর ধরে এই মন্দিরে কালীর পূজা হচ্ছে। প্রতি বছর দুর্গাপূজার পর এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গত কয়েক বছর হলো মন্দিরটি স্থানান্তর করে গ্রামের মধ্যখানে স্থাপন করা হয়েছে। সেখানেই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্বপাড়ার এই কালিপূজাকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি। প্রতি বছর অর্থাৎ গত ৩০০ বছর ধরে ৯ই পৌষ এখানে আয়োজন করা হয় কবিগানের। পূর্বে তিনদিন ধরে এই আসর আয়োজন করা হতো। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসতো এই গান শুনতে। এখানের কবির লড়াই ছিল সকলের কাছে প্রিয়। এই আসরে কবিগান পরিবেশন করেছেন জাতীয় পর্যায়ের কবিয়ালরা। এসব কবিরা হলেন–কবিয়াল বিজয় সরকার, কবিয়াল নিশি সরকার, কবিয়াল মকুল দত্ত, কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার, রবি সরকার, রসিক সরকার, কালিপদ সরকার এবং দ্বিতীয় নিশি ও দ্বিতীয় রাজেন্দ্রনাথ।

পূর্বপাড়া কালীমূর্তি

www.pathagar.com

ঘ. সূর্যপূজা

মাঘমাসের মকর সপ্তমী তিথিতে সূর্যপূজা হয়। নারীরা এ পূজার আয়োজন করে থাকে। এই সূর্যপূজা সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে–'দ্রৌপদী যখন পঞ্চস্বামী নিয়ে বনবাসে যান তখন তাকে মাত্র ছয় সের চাল দেওয়া হয়েছিল। কীভাবে এ অল্প পরিমাণ চালে বনবাসে তাদের জীবন কাটবে? এই চিন্তা করতে করতে দ্রৌপদী তার শাশুড়ি কুন্তীর কাছে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেছিলেন কীভাবে আমরা বেঁচে থাকব! কুন্তী এর উত্তরে বলেছিলেন যে, সূর্য দেবের সাধনা কর। এর উপায় তিনি করে দিতে পারবেন। দ্রৌপদী সূর্য দেবের সাধনা করেন। সূর্যদেব তার সাধনায় তুষ্ট হয়ে তাকে একটি স্বর্ণের থালা দেন এবং বলেন প্রত্যুষে স্নান সম্পন্ন করে ভাত রান্নার সময় ঐ ছ' সের চাল থেকে পরিমাণ মতো চাল গ্রহণ করে এক মুষ্টি চাল পাত্রে রেখে দিবে। দেখবে কোনোদিন আর তোমার চালের কষ্ট হবে না। রন্ধন শেষে ওই স্বর্ণের থালায় রেখে খাবার পরিবেশন করবে। শত শত লোক আসলেও সকলকে পেট ভরে খেতে দিতে পারবে। এতে কোনোদিন তাদের অন্নকষ্ট হয়নি। গ্রাম্য নারীরা অতিকষ্টে ও শ্রদ্ধার সাথে ব্রতটি পালন করে থাকে। ১লা মাঘ থেকে মকর সপ্তমী পর্যন্ত সূর্য ওঠার আগে স্নান করে এই ব্রত তারা পালন করে। স্নান করার আগে ও পরে তারা উলুধ্বনি দেয়। পৌরাণিক কৃষ্টিকে ধরে রাখার জন্য জীবননাশী শীতকে উপেক্ষা করে গ্রাম বাংলায় পালিত হয় এই ব্রত। সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে ভক্তি করে। অন্নকষ্ট থেকে পরিত্রাণের জন্য এবং সিঁথির সিঁদুর অটুট রাখতে তাদের এই কষ্টের ব্রত।

ঙ. দুর্গাসুর গ্রামে ৫১ হাত কালীপূজা

দুর্গাসুর নিবাসী হারান চন্দ্র মণ্ডল ১৪ বছর আগে কালী কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হন যে, হারান তুমি আমার মূর্তি গড়ে অর্চনার ব্যবস্থা কর। তোমাকে টাকার জন্য ভাবতে হবে না। আমার ভক্তরাই তোমার টাকার ব্যবস্থা করবে। স্বপ্নে দেখার পর তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সকাল বেলা হারান মণ্ডল পাড়ার সবাইকে ডেকে জানায় তার স্বপ্নের বিবরণ। পাড়ার সবার মত নিয়ে নিজ বাড়িতে আরম্ভ করেন পূজার ব্যবস্থা। ভাস্কর আরম্ভ করে মূর্তি গড়তে। আশ্চর্য যে ভাস্কর মূর্তি গড়তে গড়তে প্রথম বছর ৫১ হাত দৈর্ঘ মূর্তি গড়ে তোলেন, চেষ্টা করেও নাকি সে ছোট করে গড়তে পারলেন না। ৫১ হাত দৈর্ঘ্য কালীমূর্তির কথা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পূজার দিন হাজার হাজার দর্শকের আগমন ঘটে পূজা মন্দিরে। প্রত্যেকেই অবাক হয় মন্দিরে এসে। যে যা পারে সাহায্য করতে থাকে। দেখা গেলো পূজার সমস্ত ব্যয় সংকুলন হয়েও প্রচুর টাকা থেকে যায়। থেকে যাওয়া টাকা দিয়ে আজও সেখানে হয়ে আসছে এই পূজা। কালীপূজাকে শক্তিপূজাও বলে হিন্দু শাস্ত্রে। পৃথিবীতে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যিনি শক্তিকে অস্বীকার করেন বা বলেন শক্তি নেই। আমাদের দর্শনশক্তি আছে বলেই দেখছি। চলার শক্তি আছে বলেই চলতে পারি। শ্রবণশক্তি আছে বলেই শুনতে পাই। সকল কর্মকাণ্ড শক্তির অভাব হলে বন্ধ হয়ে যায়।

এই শক্তিপূজা উপলক্ষে দুর্গাসুর গ্রামে তিন দিন ধরে মেলা হয়।

www.pathagar.com

চ. শিবাসন বা নীলপূজা

নীলপূজা ও চড়কপূজা এই দুটি অনুষ্ঠান মূলত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নীলপূজার শেষের পর্বই হচ্ছে চড়ক পূজা। বলা যায় চড়ক পূজার শুভ সূচনা হয় শিবাসন বা নীলপূজার মধ্য দিয়ে। শৈব্যভক্তরা এই পূজার বিধিবিধান পরিচালনা করে থাকেন। নীলপূজা শুরুর আগে তারা শ্মশানে বা শিব মন্দিরে ভোগ সাজিয়ে স্তবস্তুতি করে ভোলানাথকে সন্তুষ্ট করে নেয়। মহেশ্বরের আশীষ নিয়ে ভালো দিনক্ষণ বেছে শুরু করে নীলপূজা। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে এই নীলপূজার প্রচলন আছে তবে চৈত্রমাসের অনুষ্ঠানেই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। প্রায় একমাসব্যাপী চলে পাড়ায় পাড়ায় শিবাসন নিয়ে এই কৃত্য। যিনি এই দলের নেতৃত্ব দেন তাকে বালা বলা হয়। সাধারণত অবলারে বালা বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু অবলা কে? যার বাকশক্তি রহিত। দেহ-মন-প্রাণ স্রষ্টার পদে সপে দিয়ে যিনি হৃদয়ে তাঁকে আসীন করে উপসনা করেন তিনিই বালা। প্রায় ৮/১০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় নীলপূজার দল। একজন বালা, যিনি অনুষ্ঠান বা দলকে দেখভাল করেন। কয়েকজন শাং থাকে। তাদের কাজ হলো শিবাসন বা অন্যান্য সরঞ্জামাদি বহন করে বেড়ানো। কয়েকজন গায়ক, যারা অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত করেন। এসব গানগুলো শিব-গৌরী জীবনালেখ্য সংক্রান্ত হয়ে থাকে। একে শ্লোক গানও বলা হয়। গানগুলো এরকম—

দেবী দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যাগ করি জন্ম নিলেন গিরিপুরী
জন্মিলেনও মেনকার উদরে
ও তার রূপের ছটায় ভূবন আলো উমা শশি গৃহে এল
বাপ ও মায়ে পালে সমাদরে।
একদিন পুষ্প তুলতে ভবানী বনে চলল একাকিনী
নূপুরেরও ধ্বনি শোনা যায়
আছে অক্ষয় বটবৃক্ষমূলে শিব রয়েছে শান কুলে
ভবানীকে দেখিবারে পায়।
দেবী দক্ষযজ্ঞে গেছে মারা প্রাণ প্রেয়সী হয়ে হারা
অঙ্গজ্বারা ভোলানাথ গোঁসাই
তাতে ফাল্গুন অষ্টমী তিথি ত্রিনয়নী ভগবতী
রূপ দেখিয়া ছাড়ে দুঃখের হাই।
তখন ডেকে বলে শূলপাণি তুমি হও কার নন্দিনী
একাকিনী এসেছ এই বনে
তোমার গলে দোলে চন্দ্র হার কোথায় বাড়ি কোথায় ঘর
বিবাহ হয়েছে কাহার সনে।
তখন হাস্য মুখে কয় ভবানী মেনোকা হয় মোর জননী
আমি হই সেই গিরিরাজার মেয়ে
আছে হিমালয়ে আমার ঘর শিব হবে মোর বিয়ের বর
তাইতে বাপ মায় না দিয়েছে বিয়ে।
শুনিয়া ভবানীর বাণী হাস্য মুখে শূলপাণি

www.pathagar.com

ভবানীকে ধরিবারে যায়
বলে কৈলাশেতে আমার ঘর আমি তোমার বিয়ের বর
বনে এলাম তোমারই জ্বালায়।
তখন গৌরী বলে একি কাজ বুড়ো তোমার নাইকো লাজ
দিবা নিশি শ্মশানেতে রও
দেখি লম্বা জটা মাথার পরে ছুঁইও না ছুঁইও না মোরে
কোন লাজেতে বিয়ে করতে চাও।
তখন শিব বলে শ্মশান ছাড়ি নবীন কুমার আমি হতে পারি
তুমি একবার ফিরে চাও সুন্দরী
আমি দেখে তোমার চন্দ্র মুখ পাসরিলাম সর্বদুঃখ
তোমার জ্বালায় হব দেশান্তরী।
গৌরী বলে করি মানা ও কথা আর মুখে আন না
আমার বিয়ে দিবে বাপ ও মায়
জানি পুরুষ জাতির এমনি ধারা পরের নারী দেখলে তারা
পাগল হয়ে ধরে গিয়ে পায়।
শুনিয়া গৌরীর বাণী মনোদুখে শূলপাণি
অনিমেষে চতুর্দিকে চায়।
গৌরীকে ভুলাবার তরে অঙ্গের বসন গুপ্ত করে
নটবর রূপ হলো শিবের গায়ে।
যেমন শুকনো লতায় ফোটে ফুল বিরহিনীর প্রাণ হয় আকুল
চম্পকেরই মালা দোলে গলে
বাজে স্বর্ণ নূপুর শিবের পায় গৌরী তখন ফিরে চায়
করজোড়ে শিবের প্রতি বলে।
ছিল মাথায় সর্প ফণি ধরা অঙ্গের ভূষণ বাঘছাল পরা
সে বেশ প্রভু লুকালে কোথায়
একদিন স্বপন মাঝে দেখি আমি তুমি হবা মোর গুণের স্বামী
মিছে কেন ছল কর আমায়।
দেবী নাহি মানে লজ্জা ভয় শিবের পানে সদা চায়
পাগলিনী ধরল গিয়ে গলে
এ দীন কালীচরণ কেন্দে কয় ওই রূপেতে দয়াময়
দিও দেখা জীবনান্ত কালে।

শিবাসন বা নীলপূজার বালাগিরি করেন এমন একজন বালা সিঙ্গা নিবাসী খোকন বিশ্বাস (৫০) এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিতভাবে যা বললেন–'প্রথমে বাণ রাজা এই শিবাসন বা লীঙ্গপূজা প্রচলন করেন। একদিন বিষ্ণুদেব বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন সব দেবতার আসন আছে, কেবলমাত্র শিব ঠাকুরের আসন নেই। তিনি শ্মশানে-মশানে পড়ে থাকেন। তাই তুমি শিবের জন্য একটা সুন্দর আসন তৈরি করে দাও। বিশ্বকর্মা

www.pathagar.com

বললেন, প্রভু কীভাবে আমি আসন তৈরি করব। আমার কাছে কোনো যন্ত্রপাতি নেই। লোহা কোথায় পাওয়া যাবে। দেবতারা চিন্তা করতে লাগলেন এখন কী করা। এদিকে প্রসূতি নামে এক মুনির কুমারীর গর্ভে লোহাসুরের জন্ম হয়। দেবতারা ছুটে গেলেন লোহাসুরের নিকট। লোহাসুর সর্বশেষ জানতে পেরে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে দেবতারা হেরে যায়। পরে গেলেন শিবঠাকুর। শিবঠাকুর ও লোহাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলতে থাকে। এতে শিবও লোহাসুরের কাছে পরাজয় বরণ করলেন। শুধু পরাজয় না, শিবঠাকুরকে বন্দি করে রেখে দিলেন। কোনো উপায় না পেয়ে তিনি লোহাসুরের কাছে মুক্তি দাবি করেন। লোহাসুর বললেন, মুক্তি দিতে পারি এক শর্তে। শিব বললেন কী শর্ত? লোহাসুর প্রত্যুত্তরে বললেন, যদি গৌরীকে আমার কাছে তুলে দাও তবে তোমাকে মুক্তি দিতে পারি। মনে মনে শিবঠাকুর খুব ক্রোধান্বিত হলেন। কত বড় স্পর্ধা! কত বড় ধৃষ্টতা! আবার ভাবলেন আগে রাজি হই পরে দেখা যাবে কি করা যায়। তাই শিবঠাকুর রাজি হলেন। মুক্তি পেয়ে গৌরীর কাছে বিমর্ষ বদনে বসে আছেন। গৌরী বললেন, প্রভু তোমার কি হয়েছে? তিনি পূর্বাপর সব ঘটনা খুলে বললেন। গৌরী বললেন, চিন্তা করো না আমি লোহাসুরকে বধ করব।

এদিকে দেবতারা সভাকরে লোহাসুরকে নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে থাকেন। গৌরী বললেন, আর কোনো চিন্তা নয়, আমিই ওকে বধ করে ফিরব। এদিকে গৌরীর আগমনে কালক্ষেপণ হচ্ছে দেখে লোহাসুর আবার অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বসে আছে। গৌরী এরইমধ্যে ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করে লোহাসুরের দিকে যাত্রা করলেন। লোহাসুরও গৌরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। উভয়ের মুখোমুখি সাক্ষাৎ। লোহাসুর গৌরীকে বলতে লাগলেন, এতক্ষণ আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। বাহ্ তোমার কি ভুবনমোহিনী রূপ। তোমাকে আমি আপন করে পেতে চাই। গৌরী বললেন, তোমাকে বরণ করতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। তুমি যদি আমার মতো সুন্দর হতে, তবে চিরদিন তোমার চরণ সেবা করতাম। লোহাসুর বলল, কীভাবে আমি তোমার মতো হতে পারি? কীভাবে তুমি এত সুন্দরী হলে? গৌরী বললেন, আমি আগুনে পুড়ে এত সুন্দরী হয়েছি। লোহাসুর বলল ঠিক আছে আমিও আগুনে পুড়ব। গৌরী আয়োজন করলেন অগ্নিকুণ্ডের। যে ভাতি দিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হলো সেই ভাতির মুখ গৌরীর যোনি দিয়ে আর শিবের জট দিয়ে তৈরি করা হয় ভাতির ছাউনি। লোহাসুর বুঝতে পারছে আমি গৌরীর ছলনা জালে বন্দি হয়ে পড়েছি। হ্যাঁ গৌরী তুমি শোনো আমি এখনই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তবে শর্ত তুমি কি আমার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করবে? গৌরী এতে রাজি হলেন। সেই থেকে দুর্গাপূজায় ফলফলাদি লোহার অস্ত্র দ্বারা কেটে নৈবেদ্য সাজাতে হয়। তারপর গৌরী সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। এবার ওই লোহা নিয়ে বিশ্বকর্মা দশ অবতার সংযোজিত শিবাসন নির্মাণ করলেন। এটিই হলো শিবাসনের বর্ণনা। তবে সব গাছ দিয়ে এই শিবাসন নির্মাণ করা হয় না। নিমগাছ, বেলগাছ ও চন্দন গাছ দিয়ে শিবাসন বানাতে হয়।' এই শিবাসন নির্মাণে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডেমাকৈড় গ্রামের গয়ালি বিশ্বাস, গান্ধিয়াশুরের অনিল ভাস্কর এবং রাউৎপাড়ার মন্টু মণ্ডল যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন।

www.pathagar.com

লোকমেলা

১. বৈশাখি মেলা

বাংলা নববর্ষের সর্বজনীন অনুষ্ঠানের মধ্যে বৈশাখি মেলার আয়োজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নানাস্থানে শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে পয়লা বৈশাখে, উপরন্তু, সারা বৈশাখ মাস ধরে ছোট-বড় নানারকম মেলা বসে। স্থানীয় লোকেরাই এসব মেলার আয়োজন করে থাকে। মেলাগুলোর স্থায়িত্বকাল তিন থেকে সাতদিন। গ্রাম বাংলায় এ মেলা হয় কোনো বিশাল বটগাছের নীচে কিংবা খোলা মাঠে। অনেক ক্ষেত্রেই মেলাগুলো অনুষ্ঠিত হয় কোনো না কোনো নদীর তীরে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে পণ্য আর পসরা নিয়ে। বাঁশি আর ঢোলের শব্দে মুখরিত হয় চারদিক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পিতামাতার হাত ধরে মেলায় আসে। তারা পুতুল কিংবা বাঁশি কেনার জন্য বাবা-মায়ের কাছে বায়না ধরে। কোথাও চলে কবিগান, কোথাও চলে নাগরদোলা। বিরাট মাঠ জুড়ে বসে গ্রাম্যমেলা।

লোকেরা কেউ আনে তরমুজ, বিক্রি হয় মাটির হাঁড়ি, পুতুল, পাখি, কোথাও বা বিক্রি হয় খই-মুড়ি, বাতাসা, কদমা। কামার আসে তার ছুরি, কাঁচি, দা নিয়ে। মেলা থেকে বহুদূরে শোনা যায় হাজার মানুষের কলগুঞ্জন। নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখে রয়েছে একটি সর্বজনীন প্রতীক। এরমধ্যে রয়েছে পুরনোর মাঝে নতুনের উত্থান। জীবনের একটি চিরন্তন অনিবার্য নিয়ম-শৃঙ্খলা এরমধ্যে ক্রিয়াশীল বলেই নববর্ষ মানুষকে এত সচেতন ও উদ্বেলিত করে।

অতীতে বৈশাখি মেলার ক্ষেত্র ছিল গ্রামবাংলা। সময়ের সাথে সাথে মানুষের চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটেছে। শহরভিত্তিক জীবনযাপন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, ফলে মেলার স্থানও গ্রাম থেকে শহরে সম্প্রসারিত হয়েছে। এখন বাংলাদেশের সর্বত্র শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে বৈশাখি মেলার আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকায়ও অনেক জাঁকজমক সহকারেই বৈশাখি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে নববর্ষের প্রথম দিন, বঙ্গাব্দ শুরুর প্রথম দিন পয়লা বৈশাখ। স্বাধীন বাংলাদেশে দিনটির মর্যাদা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। দিনটি এখন সরকারি ছুটির দিন। এদেশে আরও দুটি নববর্ষ পালিত হয় একটি ইংরেজি নববর্ষ, অপরটি আরবি নববর্ষ। কিন্তু এদেশে বাংলা নববর্ষেরই প্রভাব প্রতিপত্তি বেশি। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি জাতিসত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এবং সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বাংলা নববর্ষের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তার প্রবল প্রলয় রূপ। প্রায় সময়ই এদিনটি তার নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করে ঝড়ো হাওয়ার সাথে। তাই নববর্ষের প্রথম দিনটি আসে আমাদের জীবনে সগৌরবে ও প্রবলভাবে। এ যেন সবাইকে জানিয়ে দেয় জীবনসংগ্রামে সচেতন সংগ্রামী ও পরিশ্রমী হতে যাতে মানুষ জীবন গড়ার সত্যিকারের অনুপ্রেরণা লাভ করে। জীবনের পথে এগিয়ে চলার জন্য সে প্রভাব-প্রেরণার সঞ্চার

www.pathagar.com

করে। আমাদের সমস্যাসংকুল নিরানন্দ জীবনে নববর্ষ নতুন আশার সম্ভার নিয়ে দেখা দেয়। নববর্ষ তাই আনন্দের বার্তাবাহক। বর্তমান যুগেও নববর্ষ জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নতুন বছর উপলক্ষে সারাবছরের পরিকল্পনা প্রণয়নের শুরু বছরের প্রথমদিন থেকেই। কারণ জীবনে চলার পথে অতীতের মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ আমাদের জাতীয় জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক উৎসব। গোটা জাতির আবহমান ঐতিহ্যেরই এক ধারাবাহিকতা বাংলা নববর্ষের উৎসবের মধ্যে প্রতিফলিত। আমাদের গানে, কবিতায়, শিল্পকলায় নববর্ষ উৎসব নানাভাবে উচ্চারিত এবং উৎকীর্ণ। আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির একটা বড় অংশ জুড়ে আছে নববর্ষের পয়লা বৈশাখ।

গোপালগঞ্জ জেলার সর্বত্র নববর্ষ উদযাপন করা হয় ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে নববর্ষের কর্মসূচি শুরু। প্রতিটি এলাকায় বসে মেলা। ১ দিন, ৩ দিন ও ৭ দিন ধরে মেলা বসে। এই মেলা বৈশাখি মেলা নামে আজকাল বেশি পরিচিত। লোকজ সংস্কৃতির এই ধারাটি পূর্বের চেয়ে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়।

২. জলিরপাড়ের মেলা

গোপালগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী জেলার মধ্যে মুকসুদপুর উপজেলার জলিরপাড়ের দুর্গাপূজার মেলা অন্যতম। বিজয়া দশমীর দিন এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে এই মেলাটি উদ্‌যাপন হতে দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের বাচাড়ি নৌকা এসে বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এক এক নৌকার পরিবেশ এক এক ধরনের। লাল, নীল, সাদা, হলুদ বর্ণিল পোশাকে সাজ্জিত হয়ে বাছিয়ার তালে তালে বৈঠা টানে। এ এক মনোরম দৃশ্য। নৌকার সামনে থাকে দলনেতা বা নৌকার মালিক। নৌকার তালে তালে সামনের দিকে ঝুঁকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই নৌকা বাইচের সময় মাত্র দুটি যন্ত্রের ব্যবহার হতে দেখা যায়। তাহলো কাশি ও নাকাড়া। মাদারীপুর বিলরুট ক্যানাল নামের এই নদীটি তখন মনে হয় যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বাচাড়ি নৌকার পাশাপাশি হরেক রকমের জলযানে দর্শনার্থীরা ঘুরে ঘুরে দর্শন করে থাকে এই ঐতিহ্যবাহী মেলার দৃশ্য। স্থানীয় প্রশাসন ট্রলারে ভেসে ভেসে নিরাপত্তা ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। দুই পাড়ে অসংখ্য লোকজন জড়ো হয়ে উপভোগ করে এই নয়নাভিরাম দৃশ্য। শিশুদের খেলনা থেকে শুরু করে ঘরের প্রসাধনী ও সবধরনের খাদ্যবস্তু এই মেলায় বেচা-কেনা হয়।

৩. রামদিয়া দুর্গাপূজার মেলা

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা। পূজা শেষে রামাদিয়াতে এক বর্ণাঢ্য মেলা হয়। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে এটা দুর্গা পূজার আড়ং নামে খ্যাত। হাজার হাজার দর্শনার্থী উপভোগ করে এই মেলার আনন্দ। চলে নৌকা বাইচ। বাইচ শেষে প্রতি নৌকায় চলে লাঠি খেলা। মেলায় শাঁখা, খেলার পুতুল, কাঠের বিভিন্ন

www.pathagar.com

প্রকার তৈজস পাত্র, ঝিনুকের মালা, ছাচে তৈরি মাটির খেলনা, এর পাশাপাশি ওঠে মনোহারি মালামাল ও মিষ্টি দ্রব্য। মেলা শেষে প্রতিটি হিন্দু বাড়ি গিয়ে ছোটরা বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে। আর তারা ধান, দূর্বা, তিল, তুলসী ও মিষ্টি দিয়ে আশীর্বাদ করে থাকেন।

৪. দেবাশুর কালীপূজার মেলা

কালী হলেন শক্তির প্রতীক। এই দেবীর মন্দির নেই, এমন জনপদ বাংলাদেশে বিরল। শ্মশান কালী, ভাদ্রাকালী, চামুন্ডা কালী ইত্যাদি নামে তিনি সারা দেশে বিভিন্ন রূপে পূজিতা হচ্ছেন। সারা বছরই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তিথিতে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথি হলো কালীপূজার সবচেয়ে উত্তম তিথি। তাই এই তিথিতে সমগ্র শাক্ত ভক্তরা কালীপূজা করে থাকেন। দেবাশুর গ্রামে কাশিয়ানী থানার পূজাটি একটু ব্যতিক্রমী ও জাঁকজমকপূর্ণ। পূজার বেশ কয়েকদিন আগে থেকে আরম্ভ হয় আনন্দ ফূর্তি। সারা গ্রামের লোক যোগদান করে এই পূজায়। পূজাতে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে সারা ইউনিয়নের হিন্দু–মুসলমান। পূজা শেষে এখানে মেলা হয়। মেলার প্রধান আকর্ষণ থাকে নৌকা বাইচ ও লাঠি খেলা। পুরস্কারের বিশেষ প্রস্তুতি থাকে এখানে। সারাদিন চলে মেলার আনন্দ। মেলার দায়িত্বে থাকেন, বিশেষ করে, বর্তমান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান গাউছ সিকদার, মো. পানা মোল্লা প্রমুখ। মেলাই হলো এমন এক স্থান যেখানে সামাজিক কোনো বিভাজন থাকে না। মেলার অমোঘ আকর্ষণ থেকে তাই কেউই নিজেকে দূরে রাখতে পারে না। এসব বিবেচনা করে বলাই যায়, শতবর্ষী মেলার মতো শতশত লোকমেলা যতদিন সমাজে বহমান থাকবে ততদিন আমাদের সামাজিক বৈষম্য, মানসিক ভেদাভেদ অনেক দূরে সরে যাবে।

৫. বড়দল ও ভাঙারহাটের মেলা

কোটালীপাড়ায় যতগুলো বৈশাখিমেলা বসে তারমধ্যে বড়দলের মেলা ও ভাঙারহাটের মেলা দুটি অন্যতম। এ দুটি মেলা বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ ঐতিহ্য এবং গুরুত্ব বহন করে। অবস্থানগতভাবে ভাঙারহাটটি উপজেলার উত্তর অংশের বৃহত্তম হাট। ধীরে ধীরে এই হাটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর চারপাশে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জাসহ ব্যবসায়ের অনুষঙ্গ শিল্প-সমিতি-সংঘ ইত্যাদি গড়ে উঠতে থাকে। সাপ্তাহিক এ হাটটি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বসে। এর ঠিক পশ্চিমে রাধাগঞ্জ হাটটির দূরত্ব প্রায় পাঁচ কি.মি. এবং এটি সপ্তাহের শনিবার ও বুধবারে বসে। আয়তনে ভাঙারহাটের মতো বড় নয় এটি। তবে বহু পুরনো এ হাটটি নদীবন্দর হিসেবে বেশ ব্যস্ত এবং সমৃদ্ধ ছিল। জলপথ কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে দক্ষিণ দিকে সরে যায়। অর্থাৎ ঘাগর বাজারকে কেন্দ্র করে কোটালীপাড়ার ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে এবং রাধাগঞ্জের ব্যস্ততা হ্রাস পায়। এদিকে কালক্রমে বর্তমান ভাঙারহাটে রাধাগঞ্জ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্রগুলো ভেঙে নিয়ে আসা হয়। এভাবেই

www.pathagar.com

নতুন জমে ওঠা হাটটির নাম হয়ে যায় ভাঙারহাট, যা পূর্ব থেকেই কৃষি ও মৎস্য বাজার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল।

এই হাট দুটির মাঝামাঝি তবে ভাঙারহাট থেকে অপেক্ষাকৃত নিকটে, প্রায় এক কি.মি. দূরে, কোটালীপাড়ার একমাত্র চৈত্র সংক্রান্তি মেলাটি মেলে। চৈত্রের শেষ দিনে মেলাটির আয়োজন করা হয় বড় দল নামক স্থানে। এক দিনের পার্থক্যে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে বড়দল মেলার সব দোকানপাটসহ সকল আয়োজন ভাঙারহাটের বৈশাখি মেলায় স্থানান্তর করা হয়। এ ছাড়া ভাঙারহাটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সেনাইল বাড়ি নামক স্থানে একটি মেলা বসে। জানা যায় এটি কোটালীপড়ার সবচেয়ে পুরোনো চড়কগাছের মেলা। ভাঙারহাটের উত্তর দিকে হাজরা বাড়ির কাছাকাছি এক ভিটায় পাগলের মেলা নামে আর একটি মেলা বসে। স্থানীয়ভাবে উঁচু-টিলা জাতীয় স্থানগুলো ভিটা বলে পরিচিত। স্থানীয় সন্ন্যাসীরা এখানে জড়ো হয়ে বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানার মধ্যে থাকেন। তাদের ভক্তবৃন্দের অংশগ্রহণে মেলাটি প্রচণ্ড জনাকীর্ণ হয়ে থাকে। এসব পাগলের মুখ থেকে এদিন এ-অঞ্চলের ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যায়। এছাড়া তারা ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার উদ্দেশ্যে স্ব-স্ব পন্থায় ধর্মকর্মে মগ্ন হয়ে থাকেন। এই মেলা উপলক্ষে একসাথে এত ধর্মগুরুর সমাগম সাধারণ মানুষকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

এদিকে চৈত্রসংক্রান্তির বড়দলের মেলা থেকেই উৎসবপ্রিয় কোটালীপাড়াবাসী বাঁধভাঙা উল্লাসে মেতে ওঠে। বড়দলের মেলার স্থায়িত্ব এক দিন। এরপর এ মেলার আয়োজন অর্থাৎ দোকানপাট ভাঙারহাটসহ আশপাশের বিভিন্ন বৈশাখি মেলায় স্থানান্তর করা হয়।

বড়দল নামটি নিয়ে দুই ধরনের মত প্রচলিত। অনেকেই মনে করেন শুরু থেকেই মেলার জনসমাগম ও এই অঞ্চলের সবচেয়ে আয়তন বহুল হওয়ায় বড়দলের মেলা নামে এটি পরিচিতি পায়।

কেউকেউ আবার বলেন শুরু থেকেই স্থানটি বড়দল নামে পরিচিত ছিল। তাদের মতে, অনাবাদি খাস জমি ছিল জায়গাটি। বর্ষকালে সাধারণত প্লাবিত হয়ে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ ও ঘাস জাতীয় লতাগুল্মে আকীর্ণ থাকে। স্থানীয় কৃষকরা এসব উদ্ভিদকে দল বলে থাকে এবং নানা কাজে যেমন : পচিয়ে সার তৈরি, নীচু স্থান ভরাট, ভাসমান শাক-সবজি বাগান তৈরি ইত্যাদিতে ব্যবহার করে থাকেন। আশপাশে এর মতো বিস্তীর্ণ আয়তনের এবং এত বড় ও ঘন দল সমৃদ্ধ জমি চোখে পড়েনি বলে বড়দল নামে পরিচিত হয়ে ওঠে জায়গাটি।

সাধারণত মেলা অনুষ্ঠান স্থানীয় হাট-বাজার, মন্দির-আশ্রম, রাস্তার পাশের বড় বটবৃক্ষের নীচে অথবা কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় বসে। কিন্তু বড়দলের মতো খোলা মাঠে মেলা আয়োজন রহস্যজনক বটে! জমিটার মাঝের খানিকটা অংশ কিছুটা উঁচু ছিল এবং এখনও আছে, যেখানে একটি অতি পুরোনো বটবৃক্ষ দেখা যায়। জনশ্রুতি রয়েছে স্থানীয় ব্রাহ্মণরা স্থানটিকে গুপ্তধন সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। শুরুর দিকে অনেকেই সেসব দেখেছেন বলে শোনা যেত। সাতটি ঢাকনায় পেচানো সাপ। প্রথম হাড়িটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং তার উপরে একটি ময়না পাখি বসে

www.pathagar.com

আছে। জনশ্রুতি রয়েছে লোভী লোকেরা এই গুপ্তধন কুক্ষিগত করতে অনেক অপচেষ্টা চালাতো। এর ফলশ্রুতি তারা কেউ পাগল অর্থাৎ মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। তখন তারা কেবল এই গুপ্তধন সম্পর্কিত আলাপ করতে থাকত, কখনও একা একা বিড় বিড় করতে থাকত। কোনো এক সময় অধর্মের কর্মফলের পরিণতিতে সেই গুপ্তধন উধাও হয়ে যায়। এতে ধর্মগুরুরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ভবিষ্যতে গুপ্তধন ফিরে পেতে এবং ভাবী ধ্বংসলীলা বিশেষ করে গুপ্তধন সংক্রান্ত অভিশাপের আশঙ্কা থেকে এ অঞ্চলকে রক্ষা করতে এই স্থানটিতে মেলা বসানো হয়। তবে এসব গুপ্তধন পূর্বস্থানে ফিরে এসেছে কিনা জানা যায়নি। এখনও স্বপ্নের মাধ্যমে অনেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে গুপ্তধন দেখতে পান। বিশ্বাস করা হয় এসব গুপ্তধন জড় নয় বরং জীবিত। এটি স্থান পরিবর্তন করে। স্বপ্নে বিভিন্ন প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে এখনও অনেকের মস্তিষ্ক বিকৃতির ঘটনা শোনা যায়। কারো কারো কাছে স্বপ্নযোগে এসব গুপ্তধন বিভিন্ন জিনিস চায়। বিনিময়ে তাদের প্রচুর ধনরত্ন দেওয়ার আশ্বাস দেয়। শোনা যায় কারও কাছে ডাব-নারিকেল দাবি করে। এর অর্থ ধরে নেওয়া হয় অল্প বয়স্ক সন্তান। কখনও চাওয়া হয় পাকা নারিকেল। প্রাচীনেরা যার অর্থ বলেন বয়স্ক মা-বাবা। এসব অসম্ভব লেনদেন কেউ করেছে বলে শোনা যায়নি। তবে কেউ কেউ গুপ্তধনের কাছে বিভিন্ন ওয়াদা করে, যেমন–গুপ্তধন পেলে সে এ থেকে এত অংশ দান করবে। অথবা নিজ ধর্ম অনুযায়ী মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি উন্নয়নে ব্যয় করবে। এসব স্বপ্নে কেউ কেউ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেরও আদেশ পায়। গুপ্তধনের আশায় সেসব অনুষ্ঠান বিচিত্র হয়ে থাকে। এমনও ধারণা করা হয় ধর্মগুরুরা বড়দলে মেলা বসানোর ব্যপারে স্বপ্নে আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং এভাবেই কোনো এক সময় মেলা বসানোর পরামর্শ দেন তারা।

তবে ঠিক কখন থেকে এই মেলার আয়োজন করা হয় তার কোনো লিখিত ইতিহাস বা সর্বজন স্বীকৃত নির্দিষ্ট কোনো সময় জানা যায় না। বয়োবৃদ্ধরা মেলার আদি ইতিহাস তাদের বাপ দাদাদের কাছে শুনেছেন। তারাও শুনেছেন তাদের বাপ-দাদাদের কাছে। এমনও ধারণা করা হয় এ মেলার ইতিহাস বৈশাখি মেলার চেয়েও পুরোনো। যারা মেলাটি এখনও আয়োজনের সাথে জড়িত সেই দিঘলিয়া গ্রামের কালীবাড়ির ব্রাহ্মণরাও কেবল তাদের পরম্পরা অনুসরণ করে আসছেন। এর বাইরে কোনো ইতিহাস তারাও জানেন না।

বর্তমানে এই মেলায় বৈশাখি মেলার চেয়ে আলাদা তেমন কিছু চোখে পড়ে না। বয়সীরা দেখেছেন এখানে পূর্বে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের মানত সম্পন্ন করত। তবে এখানে কখনও চড়ক গাছের আয়োজন হতো কিনা জানা যায় না। এখনও পর্যন্ত এখানে কোনো ধর্মশালাও নির্মিত হয়নি। আগের চেয়েও ঘন জনবসতি দেখা যায় এবং বড় দলের মূল মাঠটিও দিন দিন আবাদি জমির আওতায় চলে যাচ্ছে। এককালে এখানে ঘোড়া দৌড়, নৌকা বাইচের আয়োজন করা হতো। কোনো কোনো বছর মেলায় সার্কাস খেলার আয়োজন থাকতো।

ভাঙারহাটের মেলার আলোচিত বিষয় মিষ্টি প্রস্তুতকারীদের প্রতিযোগিতা। এখানকার মিষ্টি বরিশাল ও ফরিদপুরে সমাদৃত ছিল। এ-ছাড়া মেলায় ফরিদপুরের খেজুর গুড়ও পাওয়া যেত।

www.pathagar.com

মেলায় কোটালীপাড়ার সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমাগম ঘটে। স্থানীয় কুমোরদের তৈরি খেলনা শিশু-কিশোরদের এখনও প্রধান আকর্ষণের বিষয়। কিছুদিন আগেও গৃহিণীদের সিংহভাগ প্রয়োজন মেটাতো এই মেলার জিনিসপত্র। গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় হাড়ি, কলসি, বড় পাত্র, মুড়ি-চিড়া ভাজার সরঞ্জাম, পিঠার সাজ ইত্যাদি এখনও কুমোরেরা যত্নের সাথে তৈরি করে। তবে দিন দিন মাটির তৈরি তৈজসপত্রের স্থান দখল করছে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল ইত্যাদি। মেলায় পূর্বে যেসব তামা-কাঁসার থালাবাসন, ঘটি ইত্যাদি দেখা যেত সেসব কেবলই ঐতিহ্য হয়ে স্মৃতিতে গাঁথা। তবে মেলাকে কেন্দ্র করে এখনও কাঠের আসবাব, বাঁশ-বেতের তৈজসপত্র এবং পেশাজীবীদের জিনিসপত্রের বিশেষ জোগান লক্ষ করা যায়।

ছোটদের বিনোদনের জন্য নাগরদোলা, পুতুলনাচ, ম্যাজিক শো ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এসব স্থানে উপচেপড়া ভিড় লেগে থাকে। কোনো এক সময় তারা ভীড় করে মাটির তৈরি খেলনার দোকানে। পরম আগ্রহের সাথে বেছে নেয় পছন্দের খেলনা–মাটির তৈরি রঙ বে-রঙের পুতুল, নৌকা, জাহাজ, পাখি, গরু, ঘোড়া, হাতি, ব্যাংক, ছোট-ছোট হাড়ি, কলস, কড়াই, চুলা, রঙিন ফলমুল ইত্যাদি। এসব খেলনা এখন প্লাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়ামেও তৈরি হয়। মেলার এক পাশে থাকে কিশোরীদের সাজগোজের সামগ্রী।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহের কারণে তালের পাখার দোকানগুলোতে ভিড় লেগেই থাকে। পাখায় ফুটে ওঠা নকশা এ অঞ্চলের ঐতিহ্যের চিহ্ন। অতিরিক্ত জটলা দেখা যায় বাঁশের তৈরি বাঁশি আর অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের দোকানগুলোতে। এসব দোকানগুলোর পাশ ঘেঁষে দেখা যায় বিভিন্ন খেলাধুলার সরঞ্জামের দোকান। সেসব দোকানে পোস্টার, ক্যালেন্ডার, বইপত্র ইত্যাদি মনহারী দ্রব্যাদি বিক্রি করা হয়।

মিষ্টির দোকানগুলোতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা জমিয়ে তোলে অতিথিপরায়ণ বাঙালি। এ ছাড়া ঝালমুড়ি, আচার, আইসক্রিম, চটপটি, চকলেট, চা-সিগারেট, মিষ্টি জর্দার পান ইত্যাদি দোকানের পাশাপাশি হকারদের হাতেও দেখা যায় এবং হকারদের সাথে পাল্লা দিয়ে স্থানীয় কিশোররাও এসব দোকান নিয়ে বসে।

সন্ধ্যার পরে যাত্রাপালা, নাচ-গান ইত্যাদির আসর বসে এবং চলতে থাকে মাঝরাত পর্যন্ত। কখনও প্রায় সারা রাত। শিশু-কিশোররা সারাদিন হৈ-হুল্লোড় শেষে দলে দলে বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরতে থাকে। সবার হাতে হাতে বিচিত্র সব জিনিসপত্র। কেউ বাঁশি বাজাতে বাজাতে, কেউ ঘুড়ি দোলাতে দোলাতে, কেউ খেলনা নাচাতে নাচাতে মহা আনন্দে ফিরে যায় গৃহপানে। মনে হয় মেলা থেকে আলোর বিচ্ছুরণ ছুটে যাচ্ছে চারদিকে।

মেলায় ভাণ্ডারহাটের সবদিকের গ্রাম থেকে জনসমাগম ঘটে। হাটের পূর্ব দিকের গ্রামগুলোর মধ্যে রয়েছে–হাসুয়া, পিড়ার বাড়ি, নাইয়ার বাড়ি, ভূতের বাড়ি, কাফুলা বাড়ি, জহরের কান্দি, বান্দাবাড়ি; উত্তরের দিকে–হাজরা বাড়ি, লাটেঙ্গা ভিটা, লকন্ডা, তুলসি বাড়ি, পোলোটানা, মুসুরিয়া, ঝুটিয়া, ফনাবাড়ি, কালিগঞ্জ ও মাছপাড়া; পশ্চিম দিকে–দিঘলিয়া, রাধাগঞ্জ, মান্দ্রা, খেজুরবাড়ি, লাখিরপাড়, রামনগড়, শ্রীফল বাড়ি এবং

www.pathagar.com

দক্ষিণ দিকের গ্রামগুলোর মধ্যে নারিকেলবাড়ি, ডগলাস গাববাড়ি, ভূতুরিয়া, বটবাড়ি, মাদারবাড়ি, দেবগ্রাম, পিত্তলপাড়া, সিতাইকুণ্ড, উত্তরপাড়া, পূর্বপাড়া হরিনাহাটি, চিত্রাপাড়া, উনশিয়া, পশ্চিমপাড়া, দক্ষিণপাড়াসহ সমস্ত দক্ষিণ কোটালীপাড়া অঞ্চল।

মেলায় বয়স্করা বা বড়দের দল বিশেষভাবে বিকেলের দিকে জড়ো হতে থাকে। তারা মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা, মিষ্টি ইত্যাদি তাদের বাড়ি ফেরা উদ্যোগী ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দেয়। রাতে জমে ওঠে গানের আসর। উৎসবে প্রিয় বাঙালিরা নারী-বুড়োদের সাথে নিয়ে উপভোগ করতে থাকে অনিন্দ্য উৎসব–ঐতিহ্যে ও স্পন্দনে ভরিয়ে দেয় বাংলার আকাশ-বাতাস-পথ-ঘাট।

৬. ফুলগাছার মেলা

প্রায় দুইশত বছর পূর্বে যতীন্দ্রনাথ মণ্ডলের পূর্বপুরুষ গৌরহরি মন্ডল মহাশয়ের ব্যবসা ছিল বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বাদায় কাঠ সংগ্রহ করা। একদা তিনি বাদায় গিয়েছিলেন কাছ সংগ্রহ করতে। শ্বাপদ হিংস্র জন্তু জানোয়ারের অভাব ছিল না। একবার বিপদ বুঝতে পেরে প্রায় সারারাত করুণ সুরে কেঁদে কেঁদে 'হে মা তুমি রক্ষা কর' বলে প্রার্থনা জানান, আর এভাবে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েন। বনমাতা স্বপ্নযোগে বলে, গৌর এই লাঠিখানা নে। এই লাঠিখানা পেয়ে একেবারে সোজা করে দাঁড় করিয়ে আস্তে ছেড়ে দিবি। লাঠি খানা যে দিকে হেলে পড়বে, ঐ দিকে কাঠ সংগ্রহ করতে যাবি না। তোর কোনো বিপদ হবে না। আরও বলে, লাঠিখানা বাড়ি নিয়ে তোদের বাড়ির কাছে যে বড় পুকুর আছে, ঐ পুকুর পাড়ে যে হিজল গাছটা আছে ওখানে রাখবি। আমি প্রতি বছর চৈত্র মাসের তৃতীয় শনিবারে ওখানে যাব। ওইদিন গাছটাতে ফুলদিয়ে সুন্দর করে সাজাবি আর পূজা দিবি। আমাকে যে ভক্তিভরে স্মরণ করবে আমি তার মনোবাসনা পূর্ণ করব। যতীন মণ্ডল নিজেই দেখেছেন সে লাঠিটা। লাঠিখানা ছিল পৌনে তিন হাত লম্বা এবং আঙুল পরিমাণ মোটা। লাঠিখানা গাছের গোড়ায়ই থাকতো। কিন্তু স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় লাঠিখানা কোথায় হারিয়ে গেছে আর পাওয়া যায়নি।

প্রকাশ থাক যে, স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় গ্রামবাসী কেউই এদেশে ছিল না । বন্যাও হয়েছিল মারাত্মক। তখন থেকেই এই গাছতলায় পূজা হতে থাকে। আর এখনও তা বহমান আছে। গাছটি বুড়ামার গাছতলা নামে খ্যাত। এই উপলক্ষে এখানে দুইদিনব্যাপী মেলা বসে। ভক্তরা দলে দলে যোগদান করে এই পূজার দিন। কেউ যদি বিপদে পড়ে কায়মনে বুড়ামার কাছে মানত করে, তার ফলও পায়। প্রতি বছর মায়ের কাছে মানত করে ধান বা অন্য কিছু। ওইদিন সে মানত পরিশোধ করে। এতে প্রায় ৫০-৬০ মন ধান পড়ে। চিনির তো কোনো কথাই নেই। চিনি তখনই ভক্তদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হয়। ধান পরে বিক্রি করা হয় এবং ওই টাকা দিয়ে মায়ের মন্দিরের উন্নয়ন কাজ করা হয়। মেলা শেষে চলে নানা ধরনের খাবারের ব্যবস্থা। জামাই-মেয়ে ও বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন এসে থাকে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

মেলাকে সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে পরিচালনার দায়িত্ব থাকে অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ থানা প্রশাসন।

www.pathagar.com

৭. ওড়াকান্দির মেলা

শ্রীধাম ওড়াকান্দি হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম তীর্থস্থান। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথিকে উপলক্ষ করে প্রায় সপ্তাহব্যাপী এখানে যে মেলা হয় তা মহাবারুণীর মেলা নামে খ্যাত।

এই জনপদের অনেক মেলা কালের অতলে হারিয়ে গেছে। কিন্তু মহাবারুণীর মেলাটি যেন দিন দিন আরও প্রসার লাভ করছে। বলতে গেলে হিন্দু সম্প্রদায়সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য ধর্মের লোক পুণ্য লাভের আশায় পুণ্যস্নানের এই মহাবারুণীতে যোগদান করে থাকে। হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাবলম্বীদের 'মতুয়া' বলা হয়। তারা লাল নিশান ধারণ করে জয়ডঙ্কা, কাঁসার ও পশুশৃঙ্গের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে 'হরিবল' বলতে বলতে পদব্রজে যোগদান করে এই পুণ্যতীর্থে। ওড়াকান্দিতে নারীপুরুষ সম্বলিত মতুয়ার দল প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে ঠাকুর বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করে। মতুয়াদের সেবা যত্ন করলে অশেষ পুণ্য লাভ হয় বলে পথে পথে প্রতিটি এলাকার গৃহস্বামীরা মতুয়াভক্তদের যে যার সাধ্যমতো আপ্যায়ন করে থাকে। তদুপলক্ষে যেসব খাবারের আয়োজন করা হয় তা মহাপ্রসাদ নামে পরিচিত। এতে সাধারণত নিরামিষ বা খিচুড়ির আয়োজন করতে দেখা যায়। এরপর ঠাকুরের জন্মতিথি অর্থাৎ মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে শুরু হয় পুণ্যস্নান। হরিচাঁদ ঠাকুরের উত্তরসূরিরা শ্রী শচীপতি ঠাকুর, শ্রী হিমাংশুপাতি ঠাকুর ও শ্রী পদ্মনাভ ঠাকুর প্রথমে স্নান করে শুভ উদ্বোধন শুরু করেন এই বারুণীস্নানের। তারপর ভক্তরা হরি মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করে উক্ত মন্দিরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কামনা সাগরে স্নান শুরু করেন। হরিবল, হরিবল রব ও জয়ডঙ্কার তানে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। বিদেশ থেকেও অনেক হরিভক্ত যোগদান করে এই মহাবারুণীর মেলায়। দেখা যায় প্রায় প্রতিবছরই স্থানীয় প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তা, রাষ্ট্র প্রধান ও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা এই ঐতিহাসিক মেলা উপভোগ করতে ছুটে আসেন। লক্ষাধিক হরিভক্তের এই মেলায় স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে নিরাপত্তার বিধান ও সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন।

ওড়াকান্দির মেলা

www.pathagar.com

পূজা–পার্বণ

'বারো মাসে তেরো পূজা' এই কথাটি কোটালীপাড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে প্রতিমাসেই পূজা অনুষ্ঠিত হতো। এলাকার সিংহভাগ মানুষ হিন্দু হওয়াতে এমনটি হতো। আবার পাকিস্তানি এবং ব্রিটিশ আমলে কোটালীপাড়া ছিল বনেদী হিন্দু পরিবারের বাস। বৈদিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। আবার ধনী পরিবারের অধিকাংশ লোক বসবাস করতো কলকাতায়। পূজার সময় হলেই জন্মস্থানে ফিরে আসতেন এবং পূজার কাজটি সেরে কর্মস্থলে চলে যেতেন।

তথ্যসহায়ক

১. নীরোদ মজুমদার, বয়স-৬১, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : রামদিয়া, উপজেলা : কাশিয়ানী, জেলা : গোপালগঞ্জ।

২. সুরেশ্বর বিশ্বাস, বয়স-৭১, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, গ্রাম : দেবাশুর, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ। এ জাফর আহমদ, গ্রাম : সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া। মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, গ্রাম : শীঙ্গলবাড়ি, কোটালীপাড়া।

৩. যতীন্দ্রনাথ মন্ডল, বয়স : ৯২ বছর, গ্রাম : বারখান্দিয়া, গোপালগঞ্জ।

৪. বিমল বিশ্বাস, পেশা : শিক্ষক, খান্দারপাড়, ইন্দুহাটি ইউনিয়ন হলধর উচ্চ বিদ্যালয়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।

৫. জগদীশ, গ্রাম : পূর্বপাড়া, কোটালীপাড়া।

৬. হায়দার আহম্মেদ, গ্রাম : পূর্ণবতী, কোটালীপাড়া।

৭. বেলা ভাবুক, স্বামী : অমূল্য ভাবুক,পূর্বপাড়া, কোটালীপাড়া (কালিমন্দিরের পূজারিণী)। রামানন্দ বালা, পূর্বপাড়া, কোটালীপাড়া।

www.pathagar.com

লোকাচার

১. বাল্য শিক্ষায় পৌরাণিক পদ্ধতি

গ্রাম্য পাঠশালায় পৌরাণিক শিক্ষা পদ্ধতি মুছে যাওয়ার এই ক্রান্তিলগ্নে কোথাও কোথাও একটু নিদর্শন মাত্র আছে। সেই পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি হলো তালপাতায় লেখা। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় আড়ুয়াকংশুর গ্রামে সুনীল মহাশয়ের পাঠশালায় তার কিছু নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। তালপাতায় লেখা সমাপন করে প্রথম শ্রেণিতে পদার্পণে যে ব্যবস্থা আছে তা বেশ চমৎকার। আগে সব পাঠশালাতেই ওই ব্যবস্থা চালু ছিল। শিক্ষক মহাশয়কে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বেশ সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝালেন–"বাল্যকালে শিক্ষার্থীদের বর্ণ পরিচয়ের শুরু হয় তালপাতায় কঞ্চির কলমের আচড়ের মাধ্যমে। এতে আবার ব্যবহার হয় কড়াইয়ের কালি। ছোট শিশুরা ওই উন্মুক্ত কালি দ্বারা লিখতে লিখতে তালপাতা ডিঙ্গিয়ে অনেক সময় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছাপ লাগিয়ে দেয়। ছুটির পরে মায়ের কোলে তারা যখন ফিরে যায় তখন মা বলে, বাঃ বাঃ বেশ লিখেছ, একেবারে হনুমান হয়ে ফিরেছ। মা আদর করে গতরের কালি মুছে দেয়। বাহবা দেয় প্রশংসা করে । মনে হয় এই প্রতিটি কাজের মধ্যে গভীর সংস্কৃতি লুকানো আছে। সে যাই হোক, এবার আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করি। তালপাতায় লেখা শেষে প্রথম শ্রেণিতে পদার্পণ করতে গ্রাম বাংলায় আগে বিশেষ এক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হতো। আমার এই পাঠশালায় তার কিছু নিয়ম মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আছে। ছাত্রটি সেদিন এক গামলা মুড়ি, কিছু মিষ্টি, কাগজ, কলম, একটি কাঁচা টাকা ও একটু সিঁদুর নিয়ে আসবে। সাথে অভিভাবকও থাকবেন। কাগজে লিখে দেওয়া হয় :

মন দিয়ে কর সবে বিদ্যা উপার্জন
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন
এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

সকল ধন চুরি হওয়ার ভয় থাকে, কিন্তু বিদ্যাধন কেউ চুরি করতে পারে না। এইজন্য বিদ্যাকে মহাধন বলা হয়ে থাকে। ওই লেখা দেখে দেখে ছাত্র/ছাত্রীরা কাগজে লিখতে শুরু করবে। এ থেকে শুরু হলো তাদের কাগজে লেখা। এটাই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম লেখা। লেখা পর্বটি শেষ হলে কাঁচা টাকায় সিঁদুর ভরায়ে লেখায় ছাপ দিবে। শিক্ষা জীবন শেষে কর্ম জীবনে সৎভাবে অর্থ উপার্জনের এ এক প্রতীকী ব্যবস্থা। পাঠশালার সকলে তার ঐ মুড়ি মিষ্টি আনন্দ করে খাবে এবং তার শুভ কামনা করবে। এটি একটি সুন্দর পদ্ধতি বলে আমার মনে হয়। আধুনিকতার চাপে গ্রামাঞ্চলে এখন আর তালপাতায় লেখার প্রচলন তেমন একটা দেখা যায় না। তালপাতায় লেখার আরও একটি গুণ হলো এতে হাতের লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট হয়। এতে সাধারণত শিক্ষার্থীরা মাটিতে ছালার চট বিছায়ে লেখালেখি করে থাকে। তালপাতায় নতুন ছাত্রদেরকে

www.pathagar.com

শিক্ষক মহোদয় জিনারী বা পেরেক দিয়ে অক্ষর উৎকীর্ণ করে দেন। একে খাড়া পাতা বলে। ছাত্ররা ঐ লেখার উপরে কলম ঘুরাতে ঘুরাতে অক্ষর লেখা শেখে।

২. কাঁসার পাত্রের ব্যবহার

গোপালগঞ্জ জেলার প্রায় প্রতিটি পরিবারে কাঁসার বাসনাদির ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ করে হিন্দু পরিবারগুলোতে। সংসারের সৌন্দর্য বর্ধনে এই ধাবত পাত্রের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে বলে এলাকাবাসীর বিশ্বাস। অতিথি আপ্যায়নে কাঁসার থালার ব্যবহার আভিজাত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। এই ধাতব পাত্রে খাবার খাওয়া বা পরিবেশন অত্র এলাকার একটি প্রাচীন প্রথা হিসেবে গণ্য। অবশ্য এর যথেষ্ট গুণাবলিও আছে। কাঁসা হচ্ছে তামা ও রাং এর একটি উপধাতু। তামা, পাণ্ডু, অর্শ্ব, জ্বর, কুষ্ঠ, অম্ল, পিত্ত ও শুল প্রশমক। রাং-এর গুণাবলি হলো প্রমেহ, কফ ও ক্রিমি নাশক। এসব রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে প্রাচীনেরা এই ধাতব পদার্থটি ব্যবহারের বিধান রেখেছেন। এসব গুণাগুণের উপস্থিতিতে প্রত্যেক পরিবারে কাঁসার বাসনাদি ব্যবহার করা দরকার। বিভিন্ন ধরনের কাজেও এই ধাতব পাত্রটি ব্যবহার হতে দেখা যায়। চৈত্র বৈশাখ মাসে কারুর গরম লাগলে পায়ে কাঁসার পাত্র ঘষতে দেখা যায়। এতে তারা সুস্থ বোধ করে। কাউকে পোকা-মাকড় বা কুকুরে কামড়ালে চিকিৎসা হিসেবে এই ধাতব পাত্রের ব্যবহার দেখা যায়। কবিরাজ কাঁসার থালায় তন্ত্র-মন্ত্রের তদবির করে রুগির পিঠে লাগিয়ে দেয়। এতে রুগি ভালো হয় বলে এলাকাবাসী মত প্রকাশ করেন।

৩. পিঁড়িতে বসে খাবার খাওয়া

গ্রাম্য এলাকায় এখনও অনেক পরিবারের ভোজন শালায় ডাইনিং টেবিল ঢোকেনি। তারপরেও দেখা যায় অনেকে ভদ্রতার খাতিরে পিঁড়িতে বসে ভাত খেতে সংশয় বোধ করেন। কৃষক পরিবারের শোভা হিসেবে কাঠের পিঁড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। আগে বড় পরিবারগুলোতে দেখা যেত সকল সদস্য বৃত্তাকারে পিঁড়িতে বসে ভাত খাচ্ছে। গৃহিণী ঘুরে ঘুরে খাবার পরিবেশন করছে। এ দৃশ্য দেখতে কার না মন চায়। অনেকে কাঠের পিঁড়িতে বসে খাবার খাওয়ার গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত নয়। এভাবে ভাত খেলে পরিপাক যন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যেভাবে পিড়িতে বসে ভাত খাওয়া হয় তাতে মাটি থেকে একটু উঁচুতে বসতে হচ্ছে। থালা থেকে ভাত তুলে মুখে দিতে কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে। আবার হাতে ভাত তুলে মুখে দিতে সোজা হতে হচ্ছে। যতক্ষণ খাওয়া না হবে ততক্ষণ সামনের দিকে ঝুঁকতে ও সোজা হতে হচ্ছে। এতে মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়। পেটের উপর মৃদু চাপ পড়াতে পেটের পেশী সবল হয়। এই প্রক্রিয়া ক্ষুদ্রান্তের ও বৃহদান্তের কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। পেটে মেদ জমতে বাঁধা সৃষ্টি করে। মেরুদণ্ড নমনীয়তার জন্য জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। মাটিতে বসতে গেলে পায়ে যাদের খিল ধরে এতে তাদেরও বেশ উপকার হয়। এসব কারণে খাবার খেতে পিঁড়ি ব্যবহার হয়েছে বলে বিজ্ঞ মহল মনে করেন। অনেক স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা আজ আমরা এড়িয়ে চলছি। হয়তো এমন একদিন আসবে ইউরোপ আমেরিকার মানুষ পিঁড়িতে খাবে আর আমরা ডাইনিং টেবিলে খাব।

www.pathagar.com

৪. ধূপের ধূনা

সকালে-বিকালে পরিবারের পরিষ্কারজনিত কাজের মধ্যে ধূপের ধূনার ব্যবহার বহু আগে থেকে বয়ে চলেছে। এমনকি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও এই ধূপের ধূনার ব্যবহার দেখা যায়। পাইন নামক গাছের আঠাই ধূপ। দেখতে ঈষৎ হলুদ বর্ণের। এই জমাট বাঁধা আঠা আগুনে পোড়ালে যে গন্ধ বের হয় তাই-ই ধূপের ধূনা। এটি জীবাণুনাশক। বায়ু বাহিত জীবাণুকে ধ্বংস করে। বর্তমান যুগের মতো আগে বায়ু বিশুদ্ধকরণ বা এয়ার ফ্রেসনার ছিল না তখন এই ধূপের ধূনার সাহায্যে বায়ু বিশুদ্ধ করা হতো। প্রত্যেক পরিবারে সকালে বিকালে এই ধূপের ধূনা দিয়ে থাকে। যে পাত্রে রেখে এই ধূপ পোড়ান হয় তার নাম ধূপতি। পূজা পার্বণে ধূপতিতে ধূপ পোড়ায়ে ভক্তরা আলতি দিয়ে থাকে। এর অর্থ হলো মঙ্গলময় কোনো অনুষ্ঠানকে জীবাণুমুক্ত রাখা। সমবেত জনতার কারুর দেহ থেকে জীবাণু সংক্রমিক হতে পারে তা প্রতিরোধ করার বিধান হিসেবে এই ব্যবস্থা।

৫. আপ্যায়ন

এ দেশের অতিথিপরায়ণতা বহির্বিশ্বে খুবই প্রশংসা কুড়িয়েছে। অতিথি সেবায় দক্ষিণ বাংলা যেমন–ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ি ও কুষ্টিয়া–এসব অঞ্চলের রয়েছে দীর্ঘ দিনের সুখ্যাতি। গোপালগঞ্জ তারমধ্যে অন্যতম। গোপালগঞ্জ, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর, কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পরিদর্শন করলে তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। একজন গৃহস্বামী জিতেন্দ্রনাথ সরকার (৬৮) এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান–'হ কথাটা সত্যি। যহন দেহি বাড়ি কুটুম্বু আইছে তহন ভাল্লাগে। মনে হয় নিজি না খাইয়্যা তাগো খাওয়াই। চল্লিয়্যার ভালো আনাজ, ভালো মাছ, দুধ-টুদ যা যা ভালো জিনিস আছে সব তাগো খাওয়াতে ইচ্ছা করে। তারা যহন বাড়িত্যা চোলিয়া যায় তহন পোরানডা পুড়িয়া যায়। ঘোনো ঘোনো বেড়াতি আসলি তাগে সাথে সাথে আমরাও ভালো ভালো খাতি পারি। আমরা যদি তাগে বাড়ি যাই তারাও ওরোকম করে।' অত্র অঞ্চলে তদ্বিষয়ে একটি প্রবাদও প্রচলিত আছে। তা হলো–'অতিথ রূপে নারায়ণ'। নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানো এই জনপদের একটি বৈশিষ্ট্য। নিজে কষ্ট করে অপরকে খাওয়ানোর এই সংস্কৃতির মধ্যে আত্মত্যাগের শিক্ষা আছে। আত্মত্যাগের ফলে মানুষ ভোগ বিলাস থেকে নিজেকে বিরত রাখতে অভ্যস্ত হয়। ঈদুল ফিতর, পূজা-পার্বণ, পিতামাতার শ্রদ্ধাদি, বিবাহ কিংবা অন্য কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে আলোচ্য বিষয়ে আরও গভীর ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এখানকার পরিবারগুলো পঞ্চম ব্যঞ্জনে সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করে থাকলেও গৃহকর্তা গলে বস্ত্র ধারণ করে যেভাবে দৈন্যতা প্রকাশ করে তা না দেখলে ভাষায় বুঝানো সত্যিই দূরূহ। নিশিছদ্র পরিবেশেও অশ্রু সজল চোখে শত ভুল ত্রুটি অকপটে স্বীকার করতে তারা ভুল করে না। তদুপলক্ষে অবস্থাসম্পন্ন পরিবারগুলোতে খাবার শেষে ভোজন দক্ষিণা দেওয়ার প্রচলন আছে। অন্নদান সর্বোত্তম পুণ্য কাজ বলে এলাকাবাসীর বিশ্বাস। মানুষকে অন্নদান করলে স্রষ্টা তুষ্ট হন এই বিশ্বাস প্রকট। সবেবরাতের রুটি মুসলমানের ঘর ডিঙিয়ে হিন্দুর বাড়িতে আসে, আবার পূজার প্রসাদ হিন্দুর উঠান ডিঙিয়ে মুসলমানের ঘরে স্থান পায়। এই সৌহার্দপূর্ণ সংস্কৃতি আমাদের ধরে রাখা খুবই জরুরি।

www.pathagar.com

৬. এ্যাচড়া ব্রত

জনশ্রুতি আছে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে যখন পঞ্চবটি বনে নির্বাসিত ছিলেন তখন লঙ্কাধিপতি রাবন ছায়া সীতাকে হরণ করে অশোকবনে রাখেন। সেখানে সীতা চেড়িগণ নিয়ে ফাল্গুন মাসে এক ব্রত পালন করেন। একে আশোক ব্রত বা এ্যাচড়া ব্রত বলে। এরই মধ্যে রাবনের এক চেড়ি সীতার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। সীতাকে বললেন, মা সীতা আর ভয় নেই প্রভু আর লক্ষণ ভল্লুক বানরগণ নিয়ে তোমাকে উদ্ধার করতে আসছে। সীতা চেড়ির মুখে এই অভয় বাণী শুনে আনন্দে বিহবল হয়ে পড়েন। সেই চেড়িকে তিনি একটি বর দিতে চাইলেন। চেড়ি করজোড়ে বলেছিল হে মা সীতা তুমি আমাকে এই বর দাও যেন আমি প্রভুর চরণ সেবা করতে পারি। সীতা বললেন আমি তোমাকে এই বর দিচ্ছি যে দ্বাপর যুগে কংসের রাজ সভায় প্রভুর সাথে তোমার মিলন হবে। তখন কংস তোমার নাম রাখবে কুব্জা। তখন শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে কুব্জা ষোলো বছরের অপরূপা যুবতী হলো।

চেড়ির পিঠে একটা কদাকার মাংসের পিণ্ড থাকত। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের ছোঁয়ায় ওই ঘৃণিত অর্বুদ আর থাকল না। কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের দাসী হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তাকে কুব্জা সুন্দরী বলে ডাকতেন। তাই মা সীতার বর যারা এই ব্রত পালন করবে তাদের কোনো চর্মরোগ পাঁচড়া বা কোনো প্রকার অর্বুদ হবে না। সে থেকে গ্রামাঞ্চলে কিশোরীরা একটি বেদীতে গাছের শাখা স্থাপন করে ফুল দিয়ে এ্যাচড়া বা আশোক ব্রত পালন করে থাকে। তারপর এ্যাচড়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে তারা গান করে। গানগুলো এই রকম–

১.

এ্যাচড়া মা গো লো তোর প্যাচড়াই চুল
তাইতে লাগিয়া গেলো বন্যিয়ার ফুল
বন্যিয়ার ফুলেতে ফুলেতে না লাগিল মন
আমারে আনিয়া দাও কুমড়ার ফুল ।
কুমড়ার ফুলেতে ফুলেতে না লাগিল মন
আমারে আনিয়া দাও ধুতরার ফুল
ধুতরার ফুলেতে ফুলেতে না লাগিল মন
আমারে আনিয়া দায় রক্ত জবার ফুল।

২.

ডাল ভেঙ না ডাল ভেঙ না
ডালে চড়ে যাব
এ্যাচড়া ঠাকুর চাইছে ফুল
সাজি ভরে দিব।
সাজির ভিতর এ্যাংড়া কাঁটা ব্যাংড়া কাঁটা
ঝুমুর ঝুমুর পড়ে
অযথা বন্যিয়ার ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে।

www.pathagar.com

৩.

কুমড়ার ফুল তুলতে গেলাম নায়-নায়-নায়
সে-ও ফুল উড়ায় নেলো দক্ষিণা বায়
দক্ষিণা মালী এলো জাগো হে
কাঁখে আমাক কাঁখ কলসি হাতে আমার ডালা
কেমন করে গাঁথব বসে বকুল ফুলের মালা।

৪.

আগে যায় ধনের নাও
পাছে যায় ফুলের নাও
ফুল টক টক করে
ফুলের উপর ট দিলে
জলে জুয়ড় পড়ে।

৫.

হরি ঠাকুরের বাড়ির ধারে রাঙা ঘোড়া যায়
তেউ নারে হরি ঠাকুর চ্যাতন হয়।
হরি ঠাকুরের বাড়ির ধারে সাদা ঘোড়া যায়
তেউ নারে হরি ঠাকুর চ্যাতন হয়।

৭. অন্নপ্রাশন

বাংলার এক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান এই অন্নপ্রাশন। বাঙালির এটি যেন এক গৌরবময় কৃষ্টি। বাচ্চার মুখে ভাত তুলে দেওয়ার দিন নব আনন্দে মেতে ওঠে তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব। বিভিন্ন প্রকার নাচ-গান ও বাদ্য বাজনার মধ্যে দিয়ে সূচিত হয় দিনটি। পুত্রের ষষ্ঠ মাসে কন্যার পঞ্চম, অষ্টম ও দশম মাসে পূজাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্তানের প্রথম অন্ন ভোজনের নাম অন্নপ্রাশন। অবশ্য এই অন্ন হয় মিষ্টান্ন। প্রথম মায়ের হাত দিয়ে বা বাবার হাত দিয়ে শিশুর মুখে মিষ্টান্ন তুলে দেওয়া হয়। এ সময় তার নিটকটতম আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও জ্ঞাতি গোত্রের তথা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক বাক্য উচ্চারণ করে তাকে আশীর্বাদ করা হয়। আত্মীয়-স্বজন যার-যার সাধ্য অনুসারে জিনিস দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

৮. ভাগ্যপরীক্ষা

সুন্দরভাবে বিছানা পেতে আত্মীয় স্বজনরা বৃত্তাকারে বসেন। মাঝখানে টাকা, কলম ও ধর্মগ্রন্থ রাখা হয়। পরে বাচ্চাটাকে ওই বিছানায় বসানো হয়। বাচ্চাটি যদি প্রথম টাকাটা ধরে নেয় তাহলে বাচ্চাটি ধনশালী হবে। আর যদি কলম ধরে তাহলে সে বিদ্বান হবে। সে যদি ধর্মগ্রন্থ ধরে তাহলে সে ধার্মিক হবে।

৯. নামকরণ

বাচ্চাটি কোন মাসে কোন তারিখে কত সনে, কি বারে, কোন তিথিতে, কোন রাশিতে জন্মগ্রহণ করেছে সবকিছু গৃহকর্তা ঠিক করে রাখেন। অন্নপ্রাশনের দিন হিন্দুরা একটা

www.pathagar.com

ভালো তেলের প্রদীপ বিছানায় স্থাপন করে সাতটি সলতে রাখে। সাতটি সলতের সাতটি নামও থাকে। যেমন–সন্তান যদি মিথুন রাশিতে জন্মগ্রহণ করে তাহলে ধরা যাক নামের আদ্যাক্ষর ক বা ম হবে। ক দিয়ে যেমন–কমলেশ, কানন, কপিল, কৃপা, কিশোর, কান্তি, কল্পনা ইত্যাদি। এখন সাতটি সলতেরই নাম ওইভাবে রেখে ওই প্রদীপে স্থাপন করে প্রদীপে তেল দেওয়া হয় এবং পরে ওই সলতেতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। যে সলতেটি বেশি প্রজ্বলিত হয় সেই সলতের নাম যদি কৃপা হয় তাহলে বাচ্চাটির নাম হবে কৃপা।

১০. মলং

মলং হচ্ছে গরুর মাধ্যমে ধান গাছ থেকে ধান ঝরানোর বিশেষ এক সনাতনী পদ্ধতি। উঠানের চারদিক দিয়ে বৃত্তাকারে ধানের আটি ছড়িয়ে তার উপর চার থেকে পাঁচটি গরু পরস্পর বেঁধে বৃত্তাকারে ঘুরানো হয়। এটাই মলং। প্রথম যে গরুটি বাঁধা হয় তাকে মেউয়া বলে। মেউয়া সাধারণত শান্ত স্বভাবের হয়। কিছু সময় ঘোরার পরে উপরের গুলো নীচে আর নীচেরগুলো উপরে উল্টায়ে দিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে তলা উল্টানি বলে। এই হলো মলংয়ের সর্বশেষ বিবরণ। যখনই দেখা যাবে ধান গাছ থেকে সম্পূর্ণ ধান ঝরে গেছে তখন খড় থেকে ধান সরিয়ে নেওয়া হয়। একে মলং ঝাড়া বলে।

১১. রুদ্রাক্ষের মালা

দেখা যায় রুদ্রাক্ষের মালা শুধু সন্ন্যাসের গলায় ও বাহুতে ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু শুধু সাধুরা বা সন্ন্যাসীরা রুদ্রাক্ষের মালা ব্যবহার করবে এমন নয়। এটা কোনোভাবেই সাধু ও সন্ন্যাসীর সাজ নয়। অনেকে এর গুণ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। তাই তারা মনে করে রুদ্রাক্ষ শুধু সাধুরাই ব্যবহার করবে। তাদের এ ধারণা যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে রুদ্রাক্ষ হৃদযন্ত্রকে সবল রাখে। শরীরকে কর্মক্ষম রাখার জন্য রুদ্রাক্ষের ব্যবহার হয়ে আসছে পূর্ব থেকে। তুলসীর মঞ্জুরীর সাথে রুদ্রাক্ষ ঘসে খেলে প্রাথমিক পর্যায়ে যক্ষ্মা রোগ ভালো হয় এবং বাচ্চাদের খাওয়ালে তাদের কাশি কমে যায়। রুদ্রাক্ষ কোনো সম্প্রদায় ভিত্তিক সাজ নয়।

১২. দাওয়া ওঠানো

দাওয়া এমন একটি প্রথা যা আজও বাঙালির কৃষ্টির সঙ্গে মিশে আছে। ধান কাটা মৌসুমে ঘরে ফসল তোলা শেষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলার কৃষককুল। গৃহকর্তা তার জমির পাকা ধান ঘরে তোলার জন্য পূর্বেই নির্ধারণ করে রাখেন কয়েকজন বহিরাগত কৃষাণ। তারা দাওয়াল বলেই খ্যাত। গৃহকর্তা ঘরে ধান তোলা শেষে এই দাওয়াল বিদায় করার সময় যে অনুষ্ঠান করে থাকে, তাকে দাওয়া উঠানো অনুষ্ঠান বলে।

ধান কেটে ঘরে তুলে দেয় এজন্য তাদেরকে সাধারণত দাওয়াল বা লক্ষ্মীর পুত্রও বলে। দাওয়া অনুষ্ঠানে চলে খাদ্যের প্রতিযোগিতা। এতে থাকে নানা ধরনের পিঠা, যেমন–চিতই পিঠা, ভাঁপা পুলি, পাটিসাপ্টা, কলার বড়া, চাঁন্দোসা পিঠা, তকতি পিঠা, পান পিঠা, ভাপাপিঠা ইত্যাদি। মাছ, মাংসও কিন্তু বাদ পড়ে না এই অনুষ্ঠান থেকে।

www.pathagar.com

মেতে ওঠে গ্রামবাসী নতুন আনন্দে। কৃষককুল গড়ে তোলে এক অনাবিল আনন্দঘন পরিবেশের। পরিশেষে আসে দাওয়াল বিদায় পালা। গৃহকর্তারা যে শর্তে দাওয়াল কৃষাণ ঠিক করে আনে, তা থেকে দুমুঠো ধান বেশি দিয়েই বিদায় করে দাওয়ালদের। কারুর ভিতর থাকে না কোনো ব্যথা-বেদনা। ফলে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক নতুন সম্পর্ক। এভাবে প্রতি বছরই ধান মৌসুমে আসে তারা। এই হলো দাওয়া ওঠানো।

১৩. বি–লু ছাওয়া

পল্লিবালারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় মাথা থেকে উকুন ধরে আনে। একে বি–লু ছাওয়া বলে। গাও গেরামে প্রবেশ করলে এমনটি প্রায়ই চোখে পড়ে। প্রক্রিয়াটি এমন–৪/৫ জন নারী একজনের পিছে একজন পরস্পর বসে নেয়, মাথার ঘোমটা ফেলে শুরু করে প্রত্যেকে তার সামনের জনের মাথা থেকে উকুন ধরা। একেবারে নতুন বধূরা এতে অংশ নিতে সংশয়বোধ করে। কারণ শ্বশুর বাড়িতে মাথায় ঘোমটা রাখা নারীদের একটি চিরন্তনী প্রথা। কেউ মুখ বুজে থাকতে অভ্যস্ত নয়। শুরু করে কোথায় কী ঘটনা ঘটছে তাকে এনিয়ে বেনিয়ে প্রকাশ করতে। এতে কুলবধূরা খুব আনন্দ পায়। বিভিন্ন ধরনের উকুনকে তারা বিভিন্নভাবে নামকরণ করেছে। যেমন–বড়টিকে বলে বুড়ুয়া, মাঝারি আকারের টিকে বলে ফুজোল এবং উকুনের ডিমকে নেক বলে। ঐ গুলোকে ধরে ধরে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখদ্বারা চেপে মেরে ফেলে। এতে উকুনগুলোর শরীর ফেটে টাস করে একটি শব্দ হয়। প্রতিটি উকুন মারার সময় তারা উফ করে মুখে শব্দ তোলে। বৃদ্ধাদের তুলনামূলকভাবে চোখের দৃষ্টি কম। তাই তারা মাথায় আঙ্গুল চালনা করে অনুভূতির মাধ্যমে উকুন ধরে আনে। একে আঞ্চলিক ভাষায় 'ঠ বাওয়া' বলে।

১৪. ডাক

গ্রাম বাংলায় একজন আরেকজনকে যেভাবে ডাকে তা বেশ মজার ঘটনা। 'এ' আর 'ও' এই দুটি স্বরবর্ণ তারা ব্যবহার করে অন্যকে ডাকার জন্য। কাছের কউকে ডাকতে 'এ' এবং দূরের কাউকে ডাকতে 'ও' শব্দটা ব্যবহার করে। যেমন এ-নিমাই। কিন্তু দূরের লোকজন ডাকতে অনেক্ষণ 'ও' শব্দটা উচ্চারণ করে তারপর কোনোমতে নামটা একটু উচ্চারণ করে। যেমন : ও.....নিমাই। ও.....করিম ইত্যদি।

১৫. কুড়ি

এই যন্ত্র সভ্যতার যুগে কম্পিউটারের মাধ্যমে যেমন ১ ও ০ এই দুটি অংক দিয়ে সকল গাণিতিক সম্যসার সমাধান করা হয়ে থাকে ঠিক অদ্রুপ আমাদের মা, চাচিরা ২০ সংখ্যা দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করে নিতেন। ৬৫ বোঝাতে বলতেন তিন কুড়ি পাঁচ। ৮৭ কে বলতেন চারকুড়ি সাত। ৪২ কে বলতেন দুই কুড়ি দুই ইত্যাদি। এই রকম গণনা পদ্ধতি এখনও অনেক প্রাচীন মহিলা ব্যবহার করেন।

১৬. আলাধরা ও খাদিয়া কোঁপান

রাতে আলোর মাধ্যমে মাছ শিকারকে আলাধরা বলা হয়। এই পদ্ধতিতে যেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে এ্যাড়া, ঝুপি, বল্লম, সড়কি, কোচ উল্লেখযোগ্য। গোপালগঞ্জ জেলায় যেসব এলাকায় আলাধরার মাধ্যমে মাছ শিকার করা হয় তার মধ্যে

www.pathagar.com

বিদ্যাধর, নাড়িকেলবাড়ি, রাতপাড়া, নিজামকান্দি, জ্যোতকুরা, যদুপুর, পুইশুর, ঘৃতকান্দি, রাউৎখামার, সীতারামপুর, নড়াইল উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই কয় মাস আলাধরার জন্য উপযুক্ত মৌসুম। আলাধরাতে দুই জন লোক লাগে। একজন নৌকা চালক অন্যজন শিকারি। যে নৌকা চালায় তাকে বলে কাড়ালিয়া। সে পিছন থেকে নৌকা চালাবে। যে মাছ কোঁপাবে তাকে বলে শিকারি। শিকারি থাকবে অস্ত্র হাতে সামনে দাঁড়িয়ে। নৌকার অগ্রভাগে গলইতে মশাল বা যে কোনো ধরনের আলো ভালো করে বেঁধে নেয়। যে এলাকায় ঘোলা জল সে এলাকায় এভাবে মাছ শিকার করা যায় না। ঘোলা জলে যে প্রক্রিয়ায় মাছ ধরা হয় তাকে বলে খুটনি। যা-ই হোক ওই আলোতে যেসব মাছ দেখা যাবে তা ওইসব অস্ত্র দ্বারা কোঁপায়ে নৌকায় রাখা হয়। প্রায় রাতভর চলে এভাবে মাছ শিকার। সারা বিল জুড়ে আলো জ্বলতে দেখা যাবে। অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের মাছ এই শিকারের আওতায় পড়ে না। বড় বড় মাছ যেমন–শোল, গজার, বোয়াল, বাইন, রুই, কাতলা, চিতল এগুলোই শিকার করা হয়। এই মৌসুমে মৎস্যজীবীরা অনেক অর্থ উপার্জন করে থাকে।

খাদিয়া কোঁপান প্রক্রিয়া চলে ভাদ্র মাসের গুমোট পরিবেশে। চারদিকে যখন কোনো বাতাস থাকবে না এমনতর পরিবেশকে এলাকাবাসী নিরি বলে। এই নিরি পরিবেশে বিলের বড় বড় রুই-কাতলা শেওলা খেতে খেতে উপরের দিকে ভেসে আসতে থাকে। তখন শিকারিরা সুবিধামতো জায়গায় জুতি বল্লম বসিয়ে দেয়। একে খাদিয়া কোঁপান বলে। শিকারিরা মাছগুলোকে খাবার খাওয়া অবস্থায় শিকার করে বলে একে খাদিয়া কোঁপান বলা হয়। এভাবে মাছ শিকার করতে শিকারিকে বিশেষ সতর্ক অবস্থায় থাকা দরকার। পাকা শিকারিরা পুকুর বা নদী থেকে এভাবে বড় বড় চিতল মাছ শিকার করে থাকে। অনেক শিকারি আছে যারা নদী থেকে কচ্ছপও শিকার করে। কচ্ছপ মাথা তুলে জাগলেই তারা নিরিখ করে অস্ত্র ছুড়ে মারে। যে অস্ত্র দিয়ে কচ্ছপ শিকার করা হয় তার নাম 'ঠ্যাটা'।

১৭. ঢেরা

জনগণের কাছে অনুষ্ঠানসূচি জানানোর পৌরাণিক পদ্ধতি ঢেরা নামে পরিচিত। এই পৌরাণিক পদ্ধতি এখনও মুছে যায়নি। এ যুগে মোবাইল, টেলিফোন, লিফলেট ও বিভিন্ন প্রকার প্রচার মাধ্যমের দ্বারা ঘরে ঘরে অনুষ্ঠানসূচি অতি সহজে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। আগে এরকম কোনো সহজ পদ্ধতি ছিল না। ঢেরা ছিল একমাত্র অবলম্বন। টিনের জের বা অন্য কোনো ধাতব পাত্র কিংবা ঢোল পিটায়ে বলা হতো অমুক জায়গায়, অমুক সময়ে, অমুক অনুষ্ঠান হবে। আপনারা দলে দলে যোগদান করবেন ইত্যাদি। এই ঢেরা পিটানোর উপযুক্ত স্থান হচ্ছে হাট-বাজার বা কোনো জনকীর্ণ স্থান। জনগণও কান পেতে থাকে–ঢেরাওয়ালা কী ধরনের অনুষ্ঠান জানিয়ে দিচ্ছে। নতুন অনুষ্ঠান শুরু হতে গেলে এই পদ্ধতি ছিল আগেকার দিনে বহুল প্রচলিত। আজও হাটে-বাজারে ঢেরা পিটানো সংস্কৃতি মোটামুটি বহাল আছে।

১৮. খোয়াড়

গরু-ছাগলের অত্যাচার থেকে ফসল সুরক্ষা করার এটি একটি প্রাচীন পদ্ধতি। বলতে গেলে খোয়াড় পদ্ধতি এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খোয়াড় হলো পশু পালনকারীর

www.pathagar.com

অসাবধানতাবশত উক্ত পশুতে অন্যের ফসলের ক্ষতি করলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো পশু বন্দিশালায় ক্ষতিসাধনকারী পশুকে বন্দি করে রাখা। খোয়াড়ওয়ালাকে সরকারের কাছ থেকে নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত পশু বন্দি করে রখার জন্য অনুমতিপত্র আনতে হতো। তা না হলে প্রভাবশালীদের পশু বন্দি করার সাহস তার হতো না। উক্ত খোয়াড় থেকে পশুপালনকারীকে পশুকে মুক্ত করে আনতে আর্থিক দণ্ড গুণতে হতো। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলে পশুর মালিককে অধিক হারে টাকা জরিমানা দিতে হতো। আগের দিনে কৃষকেরা এই প্রক্রিয়ায় ফসল রক্ষা করত। তবে দুর্বলেরা সবলদের গরু খোয়াড়ে দিতে ইতস্ততবোধ করত।

১৯. পাত্র হিসেবে কলার পাতা ও সুপারি গাছের ডোঙা

অতিথি আপ্যায়নে আধুনিক যুগের মতো আগে ডেকরেশন পদ্ধতি ছিল না। মহোৎসব বা যেকোনো ভূরিভোজ অনুষ্ঠানে অতীতে বৃক্ষের পত্রাদি বা গাছের বাকল ব্যবহার করা হতো। তারমধ্যে কলার পাতা ও সুপারি গছের ডোঙা উল্লেখযোগ্য। পত্রযুক্ত কলার ডগা প্রায় একহাত পরিমাণ দৈর্ঘ করে কেটে চিরে দ্বিখণ্ডিত করতে হতো। একটি ভালো ও একটি ছিন্নপত্র জোড়ে জোড়ে পরস্পর তারা সাজিয়ে নিত। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে ঐ রকম একজোড়া পাতা পেয়ে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমাণ ভাঁজ করে একটার পর একটা সাজিয়ে থালা সদৃশ করে তাতে খাবার খাওয়ার উপযোগী করে নিত। এই কলার পাতায় খাবার খাওয়া নিয়ে এলাকায় একটি প্রবাদও চালু আছে। তাহলো 'পাতা বড় করে ভাঁজালে কী হবে দেওইয়ার বরাদ্দ আছে'। ঐরকম অন্য আরেকটি পদ্ধতি হলো সুপারি গাছের ডোঙা যা মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারে। বিশেষ করে খাবার কাজে ওই ডোঙা আগে ব্যবহৃত হতো। আজকের এই আধুনিক যুগের মানুষ অমনতর পাত্রে খাবার খেতে লজ্জাবোধ করলেও সে যুগের মানুষ গর্ববোধ করত। তবে এই পদ্ধতি আর্থিক সাশ্রয়ের দিক থেকে ভালো পদ্ধতি।

২০. ভারা ভানা

ঢেঁকির মাধ্যমে ধান থেকে চাল বের করে আনার পৌরাণিক পদ্ধতি হচ্ছে ভারা ভানা। কাতলা, মোনাই, শাইল্যা ও প্রায় চার হাত লম্বা কাঠের যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে ঢেঁকি তৈরি হয়। ঢেঁকির মোনাই যে গর্তটিতে আঘাত হানে তার নাম নোট। ঢেঁকির পিছন অংশে দাঁড়ায়ে যারা ভারা ভানবে তারা পরিমাণ মতো লম্বা একটি দণ্ড দ্বারা ধানগুলো বার বার নোটে ঠেলে দেয়। সেই দণ্ডটির নাম আলই। স্বল্প সময়ে মেশিনে ধান ভাঙানোর কারণে অনেক এলাকা থেকে ঢেঁকি বিদায় নিয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু এলাকায় এর ব্যবহার চোখে পড়ে। ঢেঁকি ব্যবহারকারীণী ছবি পাণ্ডের (৪৪) কাছ থেকে ভারা ভানা সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে তিনি যা বলেন–'ঢেহিতি ধান ভানতে মেলা সময় লাগে। কষ্টও হয়। তারপরেও ইচ্ছা অয় এট্টু ভারা ভানি। ভারা ভানার সাথে সাথে চাল অইয়া আসে না। ফেত্তম অল্প কিছু চাল বারয়। এরে কয় ফান্টা। তারপরে প্রায় সবচাল বারয়। তারে কয় দোফান্টা। সব চাল বারনোর পরে চালের রোং থায়ে লাল। এভাবে কিছু সময় ফারাতে হয়, এগরে কয় শাইল্যা। এহেবারে শ্যাষে চালের গা থেকে কুড়য়া বাইর করাকে কাড়া বলে। সেই চাল রান্না করে খাতি অয়। এই ঢেহির ভানা চাল খাতি খুব

www.pathagar.com

স্বাদ। এই চাল ধোয়া জল খালি মাথা ঠাণ্ডা থায়ে। সব চাইয়্যা ঢেহিতে চাল কুটতি আরাম বেশি। ভাদ্দোর মাসে, পোষ মাসে, ঢেহিআলা বাড়িতে চাল কোটার সাড়া পড়িয়া যায়।' ঢেঁকিতে ভারা ভানার সংস্কৃতি হারিয়ে গেলেও বর্তমানে কোনো কোনো পরিবার সখের বসে হোক বা প্রয়োজনের তাগিদে হোক ঢেঁকি বানাতে শুরু করেছে। পাকঘরে ঢেঁকি, গোয়ালে গরু, গোলায় ধান. পুকুরে মাছ এগুলো বাঙালি পরিবারের একটি আদর্শিক দিক।

২১. জন্ম থেকে মৃত্যু

লোকাচার, পৌরাণিক কৃত্য, পার্বণ, ব্রত, নৃত্য-গীত, অভিনয়, বেদনার অভিব্যক্তি ও আনন্দোচ্ছ্বাস এরকম অসংখ্য লোকজসংস্কৃতি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে সামাজিক জীবন প্রবাহ। পাশাপাশি ব্যক্তি কেন্দ্রিক জীবনকৃত্য এতে অসামান্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। জীব মানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনটি পর্ব; তারমধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে : (১) জন্মদিন ও শিশু কৃত্য, (২) বিবাহ, (৩) ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বাগাড়ম্বরে হোক আর অল্প-স্বল্প করেই হোক প্রায় প্রত্যেকের জীবনে এই তিনটি জীবনকৃত্য উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়।

২২. আকিকা

এটি একটি মুসলমানি পর্ব। আকিকা অনুষ্ঠান করতে বাঁধা-ধরা কোনো দিনক্ষণের বিধান নেই। তবে জাতকের শৈশবকালে আকিকা অনুষ্ঠান করতে বেশি দেখা যায়। এতে কিছুটা ধর্মীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কোরবানির ভাবাদর্শের মতো এই আকিকা অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। কন্যা সন্তানের জন্য একটি খাসি ও ছেলে সন্তানের জন্য দুটি খাসি জবাই করার রেওয়াজ আছে। গোস্তকে তিন অংশে ভাগ করে এক ভাগ গরীবদের জন্য, একভাগ আত্মীয়দের, বাকি অংশ নিজেদের জন্য নেওয়া হয়। জাতকের নামে উৎসর্গকৃত সেই পশুর মাংস স্বজনদের সাথে ভোজন করে আকিকা অনুষ্ঠান পালন করা হয়। মূলত পারিবারিক মিলাদই আকিকা অনুষ্ঠানে আশীষ পর্ব।

২৩. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

জন্মদিন, সাটুরিয়া বা ছয়ছিটা, অন্নপ্রাশন ও আকিকা ডিঙায়ে এলো বিবাহ পর্ব। জীবনে সেটিও শেষ হয়ে গেলো। যে জীবন এত অভিনয় করে চলেছে সেই জীবন অভিনেতা জীবনযুদ্ধে অনড়, অচল, অচেতন হয়ে পড়ে রবে। মনে হয় যা কিছু করেছি এইতো সেদিন, তাই বাউল কবির ভাষায় বলতে হয়–

ও তোর দন্ত পড়িবে চুল পাকিবে
যৈবনে লাইগা যাবে ভাটি
ও তোর দিনার দিনে খসিয়া পড়িবে
রঙিলা দালানের মাটি।

প্রাণাধিক পুত্র সে দিবে মুখে আগুন ধরিয়ে। প্রাণ-প্রেয়সী পিছে পিছে ছিটাবে গোবর ছড়া। চিতায় দাউদাউ করে জ্বলবে আগুন। দেখতে দেখতে আতর মাখা সোনার অঙ্গ হবে ভস্মিভূত। মুসলমানরা মৃতকে গোসল করিয়ে, আতর মাখিয়ে মাটির নীচে

www.pathagar.com

চিরনিদ্রায় শায়িত করে রেখে দিবে। এইতো জীবন। বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করে যেসব করণ-ক্রিয়া আছে তাকে বলে জিয়াফত, হিন্দু মতে গুরুদশা। মৃত্যুর তিন দিন পর মুসলিম পরিবারে মিলাদের ব্যবস্থা করা হয়। আবার চল্লিশ দিনের দিন পাড়া প্রতিবেশী ও দূর-দূরন্তের মেহমানদেরকে দাওয়াত করে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করতে দেখা যায়। একে চল্লিশা বলে। হিন্দুমতে বিদেহী আত্মার মঙ্গল কামনার্থে দশদিন গুরুদশা পালন করার বিধান আছে, মাছ-মাংস খাওয়া নিষেধ। এমনকি ভাতও না। ফলমূল মিষ্টি খেয়ে দশ দিন কাটাতে হবে। স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। থাকতে হবে থান কাপড় পরিধান করে। স্নান করেও ওই কাপড়ে থাকতে হবে। গলায় ঝুলানো থাকে ধড়া। লোহার যেকোনো বস্তু তাতে থাকা আবশ্যক। এভাবে দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পুত্র সন্তানেরা মস্তক মুণ্ডন করে শ্রাদ্ধ তর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ দায় থেকে মুক্ত হয়।

বারো দিন অতিক্রম না করে ভূরিভোজের ব্যবস্থা করা বিধেয় নয়। তাই তের দিন থেকে শুরু করে যে যার সুবিধা মতো সময়ে পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজের ব্যবস্থা করে থাকে। একে খরচ বলে।

২৪. জন্মদিন ও শিশু কৃত্য

যেদিন একজন নবাগত অতিথি এই ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করল সেদিন থেকে তার জীবনকৃত্যের অভিষেক সূচিত হয়। মা-বাবা পরিবার-পরিজনদের অন্তরে বয়ে যায় আনন্দধারা। মুখ ভরে যায় মিষ্টি মণ্ডায়। শুরু হয় মেয়েলি গীত। পান-সুপারি চিবায় আর রসের কথার ফুলঝুরি ছড়ায় দাদা দাদিরা। হিন্দু পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তিন ঝাঁক উলুধ্বনি আর পুত্র সন্তান জন্ম নিলে সাত ঝাঁক উলুধ্বনি দিয়ে বরণ করে নেয় নবজাতককে। সধবা মহিলারা কাদামাটি করেও আনন্দ ফূর্তি করে থাকে। নবজাতকের জন্য এই দিনটি সারা জীবনের জন্য সবচেয়ে আনন্দঘন মুর্হূত। বছরান্তে শুরু হয় সেই জন্ম দিন পালনের পারিবারিক উৎসব। রকমারি সুস্বাদু খাবারের তালিকায় থাকে ক্ষীর, পায়েস, পিঠা, মিষ্টি ইত্যদি। আহূতরা কেউ মিষ্টি, কেউ পোশাক, কেউবা সোনা-রূপার অলংকারাদি নিয়ে যোগদান করে এই জন্ম দিনের অনুষ্ঠানে। নৃত্যগীতও চলতে থাকে এই অনুষ্ঠানমালায়। শুভাকাঙ্ক্ষী ও আহূত মেহমানরা জাতকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে ও আশীর্বাদ জানায়। অনুষ্ঠানে আগত সকলে জাতকের মুখে মিষ্টি তুলে দেয়। এভাবে শেষ হয় জন্ম দিন পালন অনুষ্ঠান।

২৫. সাটুরিয়া বা ছয়ছিটা

ভূমিষ্ঠ হওয়ার ষষ্ঠ দিনে নামকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে যে অনুষ্ঠান হয় তা সাটুরিয়া বা ছয়ছিটা নামে পরিচিত। অশৌচ থেকে শুচি হয়ে আয়োজন করতে হয় এই অনুষ্ঠানের করণ ক্রিয়া। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার, ঘর-দরজা পরিষ্কার, নবজাতকের মস্তক মুণ্ডনকরণ এগুলো সাটুরিয়া অনুষ্ঠানের প্রাথমিক কাজ। অতপর শিশুটিকে পশ্চিম দিকে মাথা রেখে শোয়াতে দেখা যায়। শিয়রে রাখা হয় ধর্মীয় গ্রন্থাদি। কাগজ কলম রাখতেও দেখা যায়। ধর্মপ্রাণ কোনো ব্যক্তিত্ব ও সধবারা এই সাটুরিয়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। আয়োজন করা হয় পারিবারিক মিলাদের। দাদা, দাদি কিংবা

www.pathagar.com

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্বকে অর্থবহ সুন্দর নাম নির্ধারণের অনুরোধ জানানো হয়। তারা পছন্দ মতো ভালো নাম নির্ধারণ করে দেন। ওই নামেই শিশুটি নামাঙ্কিত হয়। তবে হিন্দুদের ক্ষেত্রে মস্তক মুণ্ডন করার ধরা-বাঁধা কোনো রীতিনীতি নেই। তারা সাধারণত দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে মাথা রেখে শিশুদের শোয়ায়ে নেয়। শিয়রে রাখে ধর্মীয় গ্রন্থ, কলম-খাতা ইত্যাদি। অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিছানে রাখতে দেখা যায় আশকলি গাছের ডাল, মুড়ো পিছা, লোহা, পশুচর্ম কিংবা পশুচর্ম নির্মিত জুতা। ধূপ-দীপ জ্বেলে তার পাশে বসে ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করার বিধান আছে। কলার পাতায় এক একজনে এক একটি নাম লিখে দেয়। তারমধ্যে যে নামটি পিতার নামের আদ্যক্ষরের সাথে বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায় সেই নামেই তাকে নামকরণ করা হয়। এ হলো ছয়ছিটার তাৎপর্য।

২৬. বৃষ্টি নামানোর ব্রত

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন আঙ্গিকে রূপলাভ করেছে। কোনো দেশ নগরকেন্দ্রিক, কোনো দেশ সওদাগরী ভিত্তিক, আবার কোনো দেশ স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে কৃষিকর্মকে ধারণ করে। গ্রাম্য প্রধান আমাদের এই জনপদের জীবনালেখ্য রচিত হয়েছে কৃষিকে নির্ভর করে। কৃষি প্রধান দেশের কৃষিকর্ম মূলত সেচ প্রকল্পের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশের কৃষিকর্ম যন্ত্রগত না হওয়ায় অতীত থেকেই বৃষ্টির উপযোগিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টিই ছিল এই জনপদের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। ফসল ফলানোর মৌসুমে যথাসময়ে বৃষ্টি না হলে কৃষকদের সরল অবয়বে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠত। সবুজ-শ্যামল ফসলের ডালি ভরে দিতে আজও তারা আয়োজন করে থাকে বৃষ্টি নামানোর ব্রত। সাধারণত গ্রাম্য নারী ও কিশোরীরা এই ব্রতে অংশগ্রহণ করে থাকে। ৪-৫ জন নারী দলবেঁধে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে তোলে এই ব্রতের মাহাত্ম্য। একজনের মাথায় থাকে নতুন কুলা। কুলায় দেখতে পাওয়া যাবে তিল, তুলসী, দূর্বা, ধান ও একটি কুনো ব্যাঙ। অন্য আরেক জনের হাতে থাকে জল পাত্র। বাকিরা হয় তাদের সহযাত্রী। প্রতিটি ঘরের আঙিনায় যেয়ে ঘরের চালে জল ঢেলে দেয়। মস্তকে কুলা ধারণকারিণী নারী ও অন্যান্যরা সেই জলে ভিজে ভিজে এক ধরনের গীত গেয়ে থাকে। গীতগুলো নিম্নরূপ :

১.

কলা বাগানে গলা জল
কচু বাগানে হাঁটু জল
কলা বাগানে গলা জল
ও-লো ম্যাগারানী
শাক ধুইয়া ফেলা পানি
নোন্দে জামাই ভগবান
গাব গুবইয়া বৃষ্টি আন।

২.

আইলাম্বর আইলাম্বর
চাউল করি বাইর কর

www.pathagar.com

চাউল দিবে দিবে করি
বড় বৌ গো তাড়াতাড়ি
ছোট বৌ গো তাড়াতাড়ি
আমি তো মাগিয়া খাই
বাড়ি বাড়ি বয়াৎ গাই।

৩.

কালো মেঘা নামো
ফুল তোলা মেঘ নামো
ধূলট মেঘা তুলট মেঘা
তোমরা সবাই নামো
কালো মেঘা টলমল
বারো মেঘার ভাই
আরও ফুটিক পানি দিলে
চিনার ভাত খাই।
কালো মেঘা নামো নামো
চোখের কাজল দিয়া
তোমার কপালে টিপ দিব
মোদের হলে বিয়া।
আড়িয়া মেঘা হাড়িয়া মেঘা
কুড়িয়া মেঘার নাতি
নাকের নোলক বেচ্যা দিবাম
তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিন্দুর দিবাম
সিন্দুর মেঘার গায়
আইজ যেন রে দেয়ার ডাকে
মাঠ ডুবিয়া যায়।

এই ব্রত পালন করার পর সন্ধ্যার আঁধারে নারীরা ত্রি-পথের সঙ্গম স্থলে একত্রিত হয়ে সমস্বরে সুর সেধে নিম্নবর্ণিত গানটি গেয়ে থাকে :

হলদি কুটি মরিচ কুটি
জয় পুতুলের বিয়া
ওই যে আইছে নাতি জামাই
গামছা মুড়ি দিয়া।
গামছা নেলো সোতে
জামাই বসে কোঁতে
কোঁতরে জামাই কোঁত
নিল্যার মার ঠিলা ভরে মোত।

এই ব্রতপালনকারিণী একজন কুলবধূ শিবানী রায় (২৮)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয় আপনারা কোন ঋতুতে এই বৃষ্টি নামানোর ব্রত পালন করেন। তথ্যদাত্রী বললেন–'যহন

www.pathagar.com

বিষ্টি হয় না তহন আমরা এই ব্রত করে থায়ি। চোত্তির বোশ্যাক মাসে বিষ্টির দরকার হলে ৫-৬ জন বিটির‍্যা পাড়ায় পাড়ায় গীত গাইয়া মাঙন কুড়াই। তারপর তেমাথার আলি সোন্দিয়া রাত্তিরি ভোগ দিই। এতে দেহা যায় বিষ্টি অয়। কিষাণরা জমিতি যায়, ফসল বোনায়।'

২৭. ধানকাটার শেষ খাওন

গোপালগঞ্জ জেলা বিল-বাওড়ে বেষ্টিত। উপজেলা সদর, জেলা সদর এবং পাড়বাঁধা গ্রামগুলো ছাড়া সবটুকু এলাকাই জলে ভরা বিল। একসময় এই বিলে মাত্র দুটি ফসল হতো– আউশ ও আমন ধান। কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলায় কার্তিকমাসে কার্তিক শাইল বা দীঘা ধানের চাষ হতো। ধান কাটতো পরবাসীরা অর্থাৎ অন্য জেলা বা উপজেলার কৃষাণেরা। তারা ধানকাটার সময় হলেই মালিকের বাড়ি এসে বাসা তৈরি করে থাকতো এবং একমাসব্যাপী বা এক মাসের অধিক সময় ধরে ধান কেটে গেরস্তের বাড়িতে এনে দিতো। বিনিময়ে পেতো ভাগাধান বা ব্যরণ।

আমন মৌসুমের কৃষাণেরা আসতো দল বেঁধে। তারা নিজেরাই রান্নাবান্না করতো। তবে কখনও জমির মালিক তাদের নতুন ধানের চিতই পিঠে ভেজে খাওয়াতো। মহাসমারোহে চলতো ধানকাটা, ধান মলন ও ঘরে তোলা। তবে ধানকাটার শেষদিন প্রতিটি ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। ধানের মালিক ওইদিন কৃষাণদের শেষ খাওনের ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতেন। ধানকাটা দলে গায়েন থাকলে গান শোনাতেন। বাড়ির সবাই তা শুনতেন। তবে খাবারের আয়োজনটি হতো জাঁকজমকপূর্ণ। কৃষাণরা পেট ভরে যা যা খেতে চায়, তা আনতেন জমির মালিক। মিষ্টিদ্রব্য ছাড়া ধানকাটার খাওন কোনোভাবেই সম্পন্ন হতো না। সময় বসে নেই। পুরোনো ঐতিহ্য এখনও টিকে আছে ধানী জমির মালিকদের ঘরে। এখনও বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর ও মাদারীপুরের কৃষাণেরা ধান কাটার মৌসুমে গোপালগঞ্জে আমন ধান কাটতে আসে।

২৮. বলন সংস্কৃতি

বলন একটি আঞ্চলিক শব্দ। গোপালগঞ্জ জেলার বাইরে বরিশালের উত্তরাঞ্চল বিশেষকরে গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর এবং মাদারীপুরের পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষভাবে শব্দটি পরিচিত। বলন শব্দটির অর্থ যাই হোক না কেন, এটি উচ্চারণের সাথে সাথে জিহ্বায় জল আসে অর্থাৎ এটি যে একটি সুস্বাদু খাদ্যবস্তু, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় লৌকিক আচরণ মেনে এটি তৈরি করা হয়। এই খাদ্যবস্তুটি তৈরি করতে সরষে, হলুদ ও তেঁতুলের প্রয়োজন হয়।

তবে যে কেউ বলন তৈরি করতে পারেন না। এজন্য আইরো অধিকারভুক্ত কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের লোকই বলন তৈরি করতে পারে। তবে খাবার হিসেবে যে কেউ খেতে পারেন। আইরো লৌকিক শব্দ। শব্দটির অর্থ যাই বোঝাক না কেন, এখানে আইরো বলতে বোঝায় কোনোকিছু করার একক উত্তরাধিকারী। বংশানুক্রমে বিশেষ কাজ গ্রাম বা এলাকায় ঐ আইরোধারী ব্যক্তিরাই সম্পন্ন করতে পারবেন পূজার পুরোহিতদের মতো।

www.pathagar.com

বলন তৈরির জন্য আইরো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের লোকেরাই স্বীকৃত। এই বিশ্বাসটি অন্য কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের লোকেরাও যুগ যুগ ধরে মানছে। এভাবে বলন তৈরির লৌকিক আচরণ টিকে আছে গোপালগঞ্জে সাধারণ পরিবারে।

বলন তৈরির প্রক্রিয়া খুবই কঠিন। প্রথমে একটি নতুন গামছায় প্রয়োজন মতো সরিষা ও আস্ত হলুদ ভাটি ও জোয়ার-ভাটা লাগা খালের নির্মল জলে ধুয়ে নিতে হবে। আর ধোয়ার কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে মাসিক রক্তস্রাব হয়নি এমন আইরো কুমারীরা। সরষে-হলুদ ধোয়ার পরে ভালোমতো পরিষ্কার করে নতুন পাত্রে শুকাতে হবে। শুকানোর পরে এগুলো আলাদা আলাদাভাবে ঢেঁকিতে কুটে নিতে হবে। কোটার কাজে কুমারী মেয়েরাই অংশ নিতে পারবে। এরপর পরিবারের যেকোনো পুরুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে একটি নতুন পাত্রে হলুদ ও সরিষা ভালোমতো মেশাবেন। প্রয়োজনমতো তেঁতুল দিয়ে পুনরায় মাখাবেন। মাখানো শেষ হলে পাত্রটি লেপামোছা একটি রৌদ্রস্নাত পরিষ্কার জায়গায় রেখে খাবার উপযোগী করার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবেন। রৌদ্রে রাখার কাজটি সাবধানে করতে হবে। এসময় কেউই পাত্রের ভেতর থেকে বলন সংগ্রহ বা খেতে পারবেন না। প্রস্তুত প্রক্রিয়া শেষ হলে পরিষ্কার ও নতুন চামচ বা চামচ জাতীয় হাতল দিয়ে তোলা যাবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বলন তৈরির মূল পাত্রটি হবে মাটির এবং তা হতে হবে সম্পূর্ণ নতুন।

বলন যেকোনো খাবারের সাথে বেশ মানানসই। মুখরোচক এই খাবারটি যত্ন করে রাখলে প্রায় এক বছর ধরে খাওয়া যায়। তবে মাঝে-মাঝে রোদে রেখে খাবারটিকে সতেজ রাখতে হবে।

অনেকে বলনকে কাসুন্দি বলে ভুল করেন। আসলে কাসুন্দি আর বলন এক জিনিস নয়। কাসুন্দি তৈরি করতে হলুদ ও সরষে প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও ঝাল হিসেবে মরিচ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বলনের প্রধান উপকরণ তেঁতুল, কিন্তু কাসুন্দিতে তেঁতুল আদৌ ব্যবহার করা হয় না। কাসুন্দি ক্ষণস্থায়ী। বলন দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায় এবং স্বাদও আলাদা।

২৯. বেগারখাটা

বেগার হলো উপাদেয় খ্যাদের বিনিময়ে বৃহৎ কাজ উদ্ধার করা। এখানে শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে অর্থের কোনো যোগান থাকে না। গ্রাম অঞ্চলে এর বহুল প্রচলন দেখা যায়। যদি কোনো গৃহকর্তা ঘরে পাকা ধান তুলতে পারছে না, জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে পারছে না কিংবা পাকা ধান মাঠে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন সব জায়গায়ই বেগার ক্রিয়া সম্পাদন হতে দেখা যায়।

৩০. মতুয়া দলপতির হাতে থাকা ছোটা তত্ত্ব

মতুয়াদের দলপতির হাতে গাছের তৈরি একখানা দণ্ড থাকে, যাকে মতুয়ারা ছোটা বলে। এর দৈর্ঘ্য সোয়া হাত পরিমাণ। ছোটাটি বৃত্তে অন্তত ৩ ইঞ্চি পরিমাণ। শাস্ত্রে প্রমাণ নিতাই যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন তিনি সবকিছু ত্যাগ করে গ্রহণ করেন একখানা দণ্ড, নারকেলের আঁচিয়া দিয়া তৈরি কমন্ডুলী এবং কৌপিন। প্রভুর সন্ন্যাস বেশ দেখে ভক্ত

www.pathagar.com

চুড়ামনি নিত্যানন্দ সহ্য করতে না পেরে দণ্ডকে পাষণ্ড বলে গালি দিয়ে বললেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু শুলীন্দ্র যাঁর আজ্ঞাবাহী, সে আবার কোনো দণ্ড বহন করবে। তাই গৌরাঙ্গের হাতের দণ্ড ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বাহ্যে ক্রধান্বিত হলেন। কিন্তু নিগূঢ় ভক্ত প্রেমে গৌরাঙ্গের হৃদয় বিগলিত হয়। যে ভাবের জন্য প্রভু দণ্ড হাতে নিয়েছিলেন তা বাকি থেকে গেলো। একারণে পুণ্য অবগাহনের প্রয়োজন হলো। তাই তো গৌরাঙ্গ প্রভুই এলেন হরিলীলায়। হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর লীলায় ভক্তদের মাঝে সোয়া হাত করে তিনখণ্ড ছোটা তুলে দিলেন। পূর্বের অপ্রকাশিত ভাব প্রকাশিতে একখণ্ড ভক্ত হৃদয়ে, একখণ্ড ভক্তের হাতে, আরেক খণ্ড ঠাকুর বাড়িতে রাখার নির্দেশ দিলেন তিনি। সেইখান থেকে মতুয়া দলপতির হাতে সোয়া হাত করে থাকে দণ্ড বা ছোটা।

৩১. মতুয়া ভক্তের গলে আঁচিয়ার মালা

মহাপ্রভুর মনে প্রশ্ন জাগল নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গল, কিন্তু আঁচিয়ার কমন্ডুল কেন ভাঙ্গল না? যে নিগূঢ়ভাব জেগে নিত্যানন্দ কমন্ডুল ভাঙ্গেনি সে ভাবও জাগল মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের হৃদয়ে। গুরু-শিষ্যের ভাবের আদান-প্রদান হলো অন্তরালে। প্রেম বন্যা বয়ে গেলো হৃদয়ে হৃদয়ে। গৌরাঙ্গদেব মনে ভাবলেন, যে আঁচিয়ার কমন্ডুলী বেশে আমি সন্ন্যাস নিলাম আমার শেষ লীলায় ঐ আঁচিয়ার কমন্ডুলী ভেঙ্গে হবে ভক্তের গলার মালা। আর ঐ মালাই ভক্তদের হরিবোল বলাবে। আরও বললেন, লক্ষ্মীকে ত্যাগ করে কমন্ডুলী সঙ্গে নিয়েছিলাম। শেষ লীলায় লক্ষ্মী নিজেই কমন্ডুলী ভেঙ্গে মালা তৈরি করবে। আর সেই মালা দুলতে থাকবে আমার ভক্তদের গলায়। হরিচাঁদ লীলার সময়ও ব্যবহার হতো নারিকেলের খোল দ্বারা তৈরি কমন্ডুলী। সে সময় পিতলের ব্যবহার ছিল। কমন্ডুলী ভেঙ্গে ভেঙ্গে শান্তি মাতা ঘরে বসে মালা বানাতেন। আর ঐ মালা ভক্তের গলে পরিয়ে দিয়ে ভক্ত সাজাতেন শান্তি মাতা (হরিচাঁদ ঠাকুরের স্ত্রী)।

আঁচিয়ার মালা ব্যবহার করলে ত্বক মসৃন হয় এবং ত্বকের লাবণ্যতা ফিরে আসে। সাধুদের যেমন হয়ে থাকে। প্রকাশ পেতে থাকে সাধুত্ব।

তথ্যসহায়ক

১. নরেন্দ্রনাথ রায়, পেশা : শিক্ষক, বয়স : ৫৫, গ্রাম : দেবাশুর, থানা : কাশিয়ানী।
২. বিভূতি ব্যানার্জি, বয়স- ৫৫, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।
৩. সুপ্রিয়া বিশ্বাস (৪০), পেশা-চাকুরিজীবী, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।
৪. মনোরঞ্জন মজুমদার, পেশা : চাকুরিজীবী, থানা : কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

এদেশ নদীমাতৃক, এই যুক্তিযুক্ত কথাটির সাথে মাছে-ভাতে বাঙালি এই প্রবাদটিও বেশ মানিয়ে গেছে। মাছ-ভাত আমাদের প্রিয় খাবার। তারপরও বলতে হয় রসনা বিলাসী মানুষ রসনার তৃপ্তি মিটাতে খাদ্যে ভিন্নতা ও নতুনত্ব আনতে সর্বদা প্রয়াসী। এখানকার খাদ্য তালিকায় এমন কিছু উপকরণ আছে যাকে খাদ্যের বিশেষত্ব বলা যেতে পারে।

চৈত্র মাসের খরতাপে মানুষ জীর্ন শীর্ণ হয়ে পড়ে। শরীর ঠাণ্ডা রাখতে তারা প্রথাগত কিছু খাবার খেয়ে থাকে। জলাভাত এই গরম মৌসুমের একটি হিতকর খাবার। উত্তেজক খাবার এড়িয়ে তারা শরীর ঠাণ্ডা রাখতে এই ঠাণ্ডা খাবারটি খায় বেশি। মাটির সাথে মিশানো এক প্রকার চিকন পাতা বিশিষ্ট উদ্ভিদ জন্ম নেয়। এটি সাধারণত চৈত্র বৈশাখ মাসে বাড়ির আশপাশে জন্মে। আঞ্চলিক ভাষায় এটিকে বলে 'মাটিয়া আম্বলিয়া শাক'। গরম লাগলে এই টক শাকের অম্বল খুব উপকারী। প্রায় প্রতিটি পরিবার খাদ্য তালিকায় এটি রেখে থাকেন। পাকা দয়াকলা ও কচি আম গরম ঋতুর একটি হিতকরী ফল। গরম নিবারণের জন্য এও তারা খায়।

বৈশাখ মাসে পাড়ায় পাড়ায় কাসুন্দি বানানোর ধুম পড়ে যায়। গাছে গাছে যখন হলদে পাখিতে ডেকে ওঠে-'ও বৌ সর্ষে কোট' তখন কুলবধূরা পূত পবিত্র হয়ে কাসুন্দি বানানো শুরু করে। সরিষা রৌদ্রে শুকায়ে ঢেঁকিতে কুটে গরম জলে ভিজিয়ে তৈরি করে কাসুন্দি। তরকারির সাথে এটি খেতে খুবই মজা। গরমের দিনে এটি খুব উপকার বলে এলাকাবাসী বিশ্বাস করে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে কিশোর-কিশোরীরা আম ঝালানো খেতে খুব পছন্দ করে। অপেক্ষাকৃত টক জাতীয় আম এই প্রক্রিয়ায় বেশি করে খেতে দেখা যায়। তা ছাড়া আম-দুধ এলাকাবাসীর একটি ঐতিহ্য খাবার। এই সময় পথেঘাটে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যাবে এক আত্মীয় আরেক আত্মীয়ের বাড়ি আম-দুধ নিয়ে ছুটছে। এমনও অনেকে আছেন মা-বাবা বা গুরুজনদের আম-দুধ না খাওয়ায়ে নিজে কখনও খায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসে নব বিবাহিত দম্পতিদের নেওয়া-আনার হিড়িক পড়ে যায়। নতুন আত্মীয়দের আম-দুধ না খাওয়ালে অতিথি আপ্যায়নে ক্রটি থেকে গেলো বলে এলাকায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। তাই জ্যৈষ্ঠ মাসের বড় সম্মান হলো আম-দুধ।

আষাঢ় মাসে আমাবতী'র (অম্বুবাচী) জাউ এলাকার একটি পার্বণী খাবার। আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত এই তিন দিন আমাবতী পালন করে থাকে। বিশেষ করে কৃষক পরিবারগুলোতে তখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। এই তিনদিন কৃষকরা জমিনের কাজ করে না। এই সময় জমিনে কাজ করলে বসুমাতা ব্যথা পায় বলে কৃষকদের বিশ্বাস। এসময় লৌহ নির্মিত অস্ত্র তারা ব্যবহার করে না। এটি হচ্ছে আমাবতীর তাৎপর্য। এই তিনদিন চলে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল খাওয়ার মহড়া। নানাবিধ ফল দিয়ে তৈরি করা হয় সুস্বাদু জাউ যা আমাবতীর জাউ বলে পরিচিত। এ

www.pathagar.com

সময় সবরি কলা ও দুধ খাওয়ার রীতিও আছে। আমাবতীর মধ্যে দুধ-কলা খেলে সাপে দংশন করে না বলে জনগণ বিশ্বাস করে। এ ছাড়া এই ঝরো ঝরো বৃষ্টির দিনে মহিলারা বিভিন্ন ধরনের ফল ও শস্যের বীচি ভেজে কড়মড় কড়মড় করে চিবায়। বর্ষার দিনে এটি একটি চমৎকার খাবার। শ্রাবণ মাসে আগে অনেক পরিবার শখ করে বেলে টাকির ঝুরঝুরি রান্না করে খেত। কড়াইতে ভেঙে ঝুরঝুরে করে ভাজাকে ঝুরঝুরি বলে। কাটাযুক্ত থাকার জন্য তা খাওয়া তত সহজ না, তবে খুব সুস্বাদু। বেলে টাকির মূল্য বৃদ্ধির জন্য এই খাবারটি আগের থেকে অনেক কমে গেছে।

ভাদ্রমাসে তাল ও তাল পিঠা একটি উল্লেখযোগ্য খাদ্য। প্রথমে এক তাল এক দরে কিনে খাওয়ার প্রচলন একেবারে মুছে যায়নি। একটি তাল সকলে মিলেমিশে খেলে সংসারে কোনো কাজে বেতাল বাঁধে না। সবাই এক তালে চলতে পারবে। এরকম একটা জনশ্রুতি আছে বলে এক দরে এক তাল খাওয়ার আয়োজন দেখতে পাওয়া যায়। ভাদ্র মাসের সবচেয়ে মজার খাবার হলো তাল পিঠা ও বড়া পিঠা। তবে তাল পিঠা যেকোনো দিন বানানোর নিয়মনীতি এখানে নেই। বিশেষ একটি দিন তাল পিঠা বানাতে হয়। তা হলো শনি বা মঙ্গলবার। কলার পাতায় তাল পিঠা ভাজা হয়। একে পাতা পোড়ানো বলে।

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে তালের আঠির শাঁস একটি জনপ্রিয় খাদ্যবস্তু। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে এটি খেয়ে থাকে। আশ্বিন সংক্রান্তির এটি প্রধান খাদ্যবস্তু। সকলে ভোর বেলায় গায়ে নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ মেখে স্নান করে তাল শাঁসের আঠি দিয়ে শুরু করে আশ্বিন সংক্রান্তির খাবার খাওয়া। পান্তা ভাতের সাথে শাকের ঘণ্ট বাধ্যতামূলক থাকতে হবে। আশ্বিন মাসের শেষের দিনে সাত পদের শাক কুড়ায়ে ঘণ্ট রাধার প্রচলন এখনও অটুট আছে। পান্তা ভাতের সাথে ঐ ঘণ্ট আশ্বিন সংক্রান্তির শ্রেষ্ঠ উপহার। পাশাপাশি অন্যান্য খাবারেরও আয়োজন থাকে।

পৌষ মাস বা শীতের দিনের জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত খাবার হচ্ছে কৈ মাছ ভাতে। লাউ শাকের সাথে মসলা মিশ্রিত কৈ মাছ ভাতের মধ্যে সিদ্ধ করে এটি প্রস্তুত করা হয়। শীতের দিনে গরম গরম এই খাবারটি আজও মানুষ খুব মজা করে খেয়ে থাকে। তারপর শোলমাছের সাথে লাউয়ের তরকারি একটি চমৎকার খাবার। অনেককে দেখা যায় হাতে একটা শোলমাছ ঝুলায়ে আত্মীয়ের বাড়ির দিক ছুটছে। আম-দুধের মতো কুটুম বাড়িতে শোলমাছ নেওয়ায় প্রচলনে এখনও ভাটা পড়েনি। শীতের দিনে আরেকটি মজার খাবার হলো কলই শাকের সাথে টাকি মাছের মুড়িঘণ্ট। এটিও গ্রাম্য এলাকায় ভালো জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

পৌষ সংক্রান্তির খাবারতো আরও বেশি নাম করা। এই খাবারে থাকে না কোনো জাতি ভেদাভেদ। এ ঘর থেকে ওঘরে, এবাড়ি থেকে ওবাড়িতে চলে চিড়া-মুড়ি খাওয়ার মহড়া। মুড়ি, চিড়া, দই, দোলি, পায়েস, ছাতু হরেক রকমের আয়োজন থাকে পৌষ সংক্রান্তির খাদ্য তালিকায়। এই পার্বণে কিছুটা ভাটি লেগেছে বলে এলাকাবাসী মনে করে।

মাঘ মাসে ছাত্র-ছাত্রীরা কুল/বরই খায় না। এই ব্রত চলে শ্রীপঞ্চমী পর্যন্ত। এই তিথির আগে বরই খেলে বিদ্যাদায়িনী মা সরস্বতী বিদ্যাদানে কৃপণতা করে বলে বুড়া-বুড়িদের কাছ থেকে জানতে পারা যায়। এই ভয়ে ছাত্র/ছাত্রীরা সরস্বতী পূজার আগে

www.pathagar.com

কুল খায় না। তবে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ইলিশ খাওয়ার ধুমধাম দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে যার সাধ্যমতো করে ইলিশ জোগাড় করে একমুঠো ভাত খাবার জন্য। ঋতুগত এসব খাবার ছাড়াও আরও কিছু খাবারের বেশ কদর রয়েছে। যেমন–

ক. **টাকি পোড়া :** সংসারে দুর্গতি দেখা দিলে বা ভবিষ্যতে দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ পাবার উপলক্ষে এই খাবারটি এলাকাবাসী প্রায়ই খেয়ে থাকে। টাকি মাছ পোড়ায়ে ভালোমতো পরিষ্কার করে সরিষা ও অন্যান্য মসলা দিয়ে বেটে এটি তৈরি করতে হয়। সবদিন নয়, কেবলমাত্র শনিবারে এটি খাওয়ার বিধান। শনির দোষ এড়িয়ে চলতে শনিবারে এটি খাওয়া প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করে।

খ. **সরিষা বাটা :** সরিষা বাটা একটি জনপ্রিয় খাদ্যবস্তু। এই সরিষা বাটা দিয়ে এলাকায় একটি রীতি চালু আছে। যেসব মহিলারা রাগি ও বদমেজাজি সাধারণত তাদেরকে দিয়ে এই খাবারটি প্রস্তুত করা হয়। এতে এই খাবারটি বেশ ঝাঁঝালো ও মুখরোচক হয়ে থাকে। কাজেই ওইসকল মহিলাদের ডাক পড়ে সরিষা বাটার সময়। আর যাদের রাগ নেই ও শান্ত স্বভাবের সেসব মহিলা সরিষা বাটলে তা তিতা ও বে-স্বাদের হয়ে থাকে বলে এলাকায় মত প্রচলিত আছে।

গ. **ডালপাক :** গোপালগঞ্জ এলাকার ডালপাকের একটি বিশেষত্ব আছে তা বলে রাখা ভালো। বিশেষ করে হিন্দু বাড়িগুলোর ডাল রান্না অতি চমৎকার। প্রশংসা না করলে বড় একটি সত্যকে অস্বীকার করা হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দ্বিধাহীনভাবে এই সুস্বাদু ডালের গুণগান গায়। বেশ গাঢ় করে ইলিশ মাছ বা রুই মাছের মাথা দিয়ে তা পাক করতে দেখা যায়। খেসারি, মুগ, ছোলা ও ডাবরি তারমধ্যে উল্লেযোগ্য।

ঘ. **থোড় :** কলাগাছের অভ্যন্তরে লম্বা যে মোটা দণ্ড তা-ই থোড় নামে পরিচিত। কোনো এক সময় এই থোড় তরকারির খুব কদর ছিল। মুড়িঘন্ট ও ভাজিতে এর তুলনা হয় না। আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেকে এই হিতকরী তরকারিটি এড়িয়ে চলেন। তাই বলে একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি।

ঙ. **মরিচ পোড়া :** খাবারের রুচি আনতে অনেকে মরিচ পোড়া খেয়ে থাকেন। এর ঘ্রাণ যদিও ঝাঁঝালো তবুও রসনা বিলাসী। পান্তা ভাতের সাথে পোড়া মরিচ গ্রাম্য এলাকায় একেবারে কম জনপ্রিয় নয়। খুদ সিদ্ধের সাথে মরিচ পোড়া খুবই মানানসই।

চ. **লাবড়া :** লাবড়া এই এলাকায় খাদ্য তালিকায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। হরেক রকমের তরকারি সিদ্ধর পরে জল নিষ্কাশন করে নিতে হয়। পরে এটি ঘুঁটে মণ্ডা করে সরিষা বাটাসহ বিভিন্ন প্রকার মসলা দিয়ে খাবারের উপযুক্ত করে তোলা হয়। মহোৎসবে এর কদর আগের মতোই আছে। আবার বাড়িতে অনেকে শখ করে খেয়ে থাকেন। শহরে খাবারের নতুনত্বে কৃত্রিমতা থাকতে পারে কিন্তু গ্রাম বাংলার রসনা বিলাসী বা যেকোনো খাবারে কোনো ভেজাল থাকে না। সবকিছু টাটকা ও সতেজ। পেটে দিলে পিঠে সয় এই প্রবাদকে তারা সার করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রচলিত খাবরের পাশাপাশি এলাকাবাসী বিভিন্ন পার্বণে, ঋতুতে কিংবা রসনার দাবিতে খাবারে নতুনত্ব নিয়ে আসে।

www.pathagar.com

খাদ্যাখাদ্যে নারী : খাদ্যাখাদ্যে-বাছবিচার নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। যেমন–যমজ কলা বা যমজ কোনোকিছু তারা খায় না। এগুলো খেলে তাদের গর্ভে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে এমন একটা জনশ্রুতি আছে। তারপর গজানো নারকেলের মধ্যে যে গোলাকৃতি বস্তু জন্ম নেয় তার নাম 'ফোল'। এই ফোল কোনো নারী খেতে রাজি নয়। এতে নারীঘঠিত অনেক রোগ হতে পারে বলে তাদের ধারণা। গর্ভাবস্থায় চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় তারা কিছু ভক্ষণ করে না। অবশ্য এই সময় কোনো নারী-পুরুষ কেউ কিছু খায় না। সাত মাসের গর্ভাবস্থায় সাধ ভক্ষণের রীতি প্রচলিত আছে। পিতৃগৃহে এই সময় অন্তঃসত্ত্বাকে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার খাওয়ানো হয়। টক জাতীয় খাবার নারীরা বেশি খায়। এটা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। নতুন নতুন খাবার নারীরা উদ্ভাবন করে থাকে। ক্ষীর, দোলি, কাসুন্দি বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রস্তুত করতে নারীরা খুবই পারদর্শী।

www.pathagar.com

লোকনৃত্য

সন্তুষ্টি বিধানের প্রয়াস হতেই মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ শুরু হয়েছে। সেই সন্তুষ্টি নিজের হোক বা অপরের হোক। প্রাচীনকালে অসহায় অরণ্যচারী, বৃক্ষচারী ও গুহাবসী মানুষের অসহায়ত্ব হতে ধর্ম বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা ইতিহাসবিদরাও বলে থাকেন। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন–ঝড়, বৃষ্টি, প্লাবন, অগ্নুৎপাত, দাবানল, তাছাড়াও রোগব্যাধি, হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ প্রভৃতি যখন মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল, তখন একদিন হয়তো আদিম মানুষের মনে ধারণা হয়েছিল ঐ সমস্ত ঘটনার পিছনে কোনো না কোনো অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। আর সেই শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে পারলে বিভিন্ন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সেই চিন্তা থেকেই আদিম মানুষ তার কল্পনার অদৃশ্য শক্তিকে বিভিন্ন রূপে রূপায়িত করতে থাকে। বাংলায় কৃষ্টি শব্দটির মধ্যে এর তাৎপর্য পাওয়া যায়। কৃষ্টি শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা Culture। যার অর্থ সংস্কৃতি, কর্ষণ, চাষ বা চর্চা প্রভৃতি।

Culture শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে Latin Coleve শব্দ থেকে। Coleve শব্দের অর্থ হলো Worship বা আরাধনা বা অর্চনা করা। কাজেই পূজা/অর্চনা হতে জ্ঞান বিকাশের সূচনা হয়েছে তা বলা যায়। দেব-দেবীকে ভালো খাবার দিলে তারা সন্তুষ্ট হতে পারে। তাই ভালো খাবার প্রস্তুতের প্রচেষ্টা হতে ধীরে ধীরে খাবারের মান উন্নত হতে থাকল। তাদের ভালো জায়গায় রাখলে' তারা সন্তুষ্ট হতে পারে। তাই ভালো স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। তাদের সামনে নাচলে গাইলে তারা সন্তুষ্ট হতে পারে। সেই চিন্তা থেকে সংগীত ও নৃত্য শৈলীর বিকাশ ঘটতে থাকে। তাদেরকে বিভিন্ন সজ্জায় সাজালে তারা সন্তুষ্ট হতে পারে। তাই কারু শিল্পের উন্নতি ঘটতে থাকে। তাদেরকে ভালো কথায় বা ভাষায় স্তুতি করলে তারা তুষ্ট হতে পারে। সেই থেকে ভালো শব্দ চয়ন ও ছন্দময় সাহিত্য রচনা হয়েছে। এ পর্যায়ে নৃত্য একটি অন্যতম বিষয়।

লোকসংস্কৃতির যত ধারা বা শ্রেণি বিন্যাস আছে প্রত্যেকটির উৎসের পিছনে ঐ রকম কোনো না কোনো কারণ নিহিত রয়েছে। বংশ পরম্পরায় সমাজ জীবনে তা শক্ত ভীত করে নিয়েছে। নৃত্য হলো বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়মের অধীনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা। এই অঙ্গ সঞ্চালনের আজকের দিনের রূপ অতীত রূপের রূপান্তর মাত্র। বিভিন্ন বদ্যযন্ত্র সংযোজন হয়ে এমনই একটা জায়গা করে নিয়েছে যা আজ বাণিজ্যিকভাবে রূপলাভ করেছে। দেখা যায় বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন নৃত্য বয়ে চলেছে। যেমন–কথক নৃত্য, ভরত নৃত্য, নাট্যম নৃত্য, লোকনৃত্য ইত্যাদি। এসব নৃত্য খ্যাত সম্পন্ন হলেও গোপালগঞ্জ জেলাটি আঞ্চলিক নৃত্যে মোটেই পিছিয়ে নেই। শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে যথেষ্ট অগ্রসর। যুগ যুগ ধরে অঙ্গনে অঙ্গনে সমাদৃত হয়ে আসছে এখানকার আঞ্চলিক নৃত্যগুলো। তার মধ্যে অষ্টক নৃত্য, বরণ নৃত্য, বেহারা নৃত্য ও নীল নৃত্য উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি নৃত্যের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। লোকসংস্কৃতিতে নৃত্য একটি বিশেষ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত।

www.pathagar.com

১. বেহারা নৃত্য

দক্ষিণ গোপালগঞ্জে এই নৃত্যের প্রভাব বেশি ঘটেছে। বিশেষ করে ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারে বিয়ে অনুষ্ঠানে নব দম্পতিকে পালকিতে আরোহনপূর্বক এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে। যারা কাহার (শিবিকা বা পালকি বাহক) তারা ভাঙা ভাঙা সুরে গান গেয়ে এই নৃত্য করে থাকেন। তাই কাহাররা যে সুরে গান গায় তাকে বলে কাহারবা রাগ। পালকির বেহারারা একহাতে পালকির বর্ধিত কাষ্ঠখণ্ড ধরে অন্যহাত সবাই একসাথে তালে তালে ঝুলাতে থাকে। সামনে থাকে নৃত্যকারেরা। রূপশয্যা করে তারা নয়নাভিরাম নৃত্য করে থাকে। ভাঙা ভাঙা গান ভিন্ন তারা এ নৃত্য পরিবেশন করতে পারে না। এই নৃত্যে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। ভাঙা ভাঙা সুরই তাদেরকে নৃত্য করতে সহায়তা করে থাকে। একটি গান এ রকম–

হুমনা রে হুমনা, হুমনা রে হুমনা
ওহো – ওহো – ওয়ো – ওয়ো – ওয়ো – হো
আজ মারব তোরে রে মোরোগা
কাল মারব তোরে।
ওহো – ওহো – ওয়ো – ওয়ো – ওয়ো – হো
নিশীথে জাগিয়া ওঠ রে মন ডাকিয়া
মনতো রয় না ঘরে রে মোরোগা
আজ মারব তোরে রে মোরোগা
কাল মারব তোরে।
ওহো – ওহো – ওয়ো – ওয়ো – ওয়ো – হো
বাড়ির কাছে আগড়ার বগান রে
জড়িয়া ধরিছে আমার চুল রে মোরোগা
আজ মারব তোরে রে মোরোগা
কাল মারব তোরে।

২. বরণ নৃত্য

বরণ নৃত্য এই অঞ্চলে সর্বাধিক প্রচলিত। সাধারণত পূজা–অর্চনা, দেবালয়ে কিংবা স্মরণীয়-বরণীয় অনুষ্ঠানগুলোতে এই নৃত্য পরিবেশন হতে দেখা যায়। এই নৃত্যে বাদ্যযন্ত্রের আবশ্যকতা আছে। বসে সম্মুখপানে সমান্তরাল ভাবে হস্তদ্বয় প্রসারিত করে বদ্যযন্ত্রের তালে তালে সুন্দর করে দোলাতে থাকে। ধীরে ধীরে নৃত্যরত অবস্থায় দাঁড়াতে শুরু করে। নৃত্যমঞ্চ ঘুরে ঘুরে নৃত্যকারেরা নৃত্য করে দর্শকদের মনে আনন্দ দান করে। বরণ নৃত্যের মধ্যে আরেকটি নৃত্য আছে, আঞ্চলিক ভাষায় একে আলতি বলে।

আলতি নৃত্যের সময় হাতে বিশেষ কিছু ধারণ করার বিধান আছে। যেমন–ধূপতি, থালা, পাখা, রুমাল ইত্যাদি। এই আলতি নৃত্যের মধ্যে বিস্ময়কর কিছু আয়োজন নৃত্যকারেরা করে থাকে। মাথায় কল্কি রেখে তার উপর জলপূর্ণ একটি কলসি স্থাপন করে তারা নৃত্য করতে অভ্যস্ত। এই নৃত্য নারী পুরুষ উভয়েই পরিবেশন করে থাকে। এতে কোনো গানের প্রয়োজন হয় না। গোপালগঞ্জ জেলার সব উপজেলায় এই বরণ

www.pathagar.com

নৃত্য বেশি পরিবেশন হতে দেখা যায়। অনেকে বাণিজ্যিকভাবেও এই নৃত্যকে বেছে নিয়েছে।

৩. অষ্টক নৃত্য

এই অষ্টক নৃত্য গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রচলন বেশি। সাধারণত চৈত্র বৈশাখ মাসে এই নৃত্য করতে দেখা যায়। সম্ভবত আটজন নৃত্যকার মিলে এই নৃত্য করে বলে এর নামকরণ করা হয়েছে অষ্টক নৃত্য। তবে আটজন মিলেই এ নৃত্য পরিবেশন কারতে হবে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা এখানে নেই। দলে ছোট ছোট দুজন কিশোর-কিশোরী থাকে। তাদেরকে হর–পার্বতী কিংবা রাধা–কৃষ্ণ সাজিয়ে নিতে হয়। তারা নৃত্য করার পরপরই অন্যরা তাদেরকে ঘিরে স্বতন্ত্র সুরে এক প্রকার গান পরিবেশন করে। প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে যেয়ে নৃত্য করে চাল বা অর্থ তোলে। এভাবে ৭-৮ দিন নৃত্য করার পর এক প্রকার ব্রত পালন করে থাকে। একে বৈশাখি ব্রত বলা হয়। এই নৃত্যের কয়েকটি গান নিম্নে দেওয়া হলো :

এলো সুখ বসন্ত প্রাণকান্ত এলো না ফিরে
কী দিয়া বুঝায়ে রাখি একাকিনী গৃহে থাকি
সহে না আর এ যৌবন জ্বালা।
আমি নারী অভাগিনী বন্ধু হারা হয়ে
কথা আছে মনে প্রাণে খুলিয়া কইব কারে
কেমন করে ধৈর্য ধরে থাকি।
শুনলো সই তোমারে কই মনের দুঃখের কথা
সারা নিশি জেগে থাকি
বন্ধুর জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরি।
অধম হরেণ কেঁদে ভাসে নয়ন জলে
অন্তিম কালে দিও দেখা
বৃন্দাবনের কোলে সোনা
তোমায় হেরে পাপ প্রাণ জুড়াব।

●

ধন্য পূর্ববঙ্গ ধন্য, ধন্য সোনার বাংলাদেশ
ধন্য বঙ্গবন্ধু ধন্য বাংলাদেশ পাই যাহার জন্য
জন্মভূমি ছেড়ে যাব ক্যান।
পায়ে ধরি বিনয় করি ঐ বঙ্গে যেও না
যাও যদি কেউ বাস্তু ছাড়ি
সত্তর যাবা যমের বাড়ি
জীবন গেলে জীবন আর পাবা না।
খালে বিলে নৌকা চলে দেখলাম খুলনার বাড়ি

www.pathagar.com

পুত্র পেলে চড়ে গাড়ি মা বাপে যায় বনগাঁর বাড়ি
মা–মা বলে ধূলায় যায় গড়াগড়ি।
পুত্র হারা হয়ে তারা কাঁদে দিবারাতি
পুত্র শোকে তনু জ্বারা আন্দামানে গেলো তারা
ননীতালে তাদেরও বসতি,
আলসে কুঁড়ে গেলো ছেড়ে পরের টাকার আশে
যেমন কর্ম তেমন ফল ফলে তাহার কর্মফল
জ্বলে পুড়ে মরে হা হুতাশে।
এ মিনতি করি স্তুতি দশের শ্রীচরণে
অধম ক্ষেত্র বলে আমার ওই অন্তিম কালে
দাস বলিয়া রেখ চরণ তলে।

বারখাদিয়ার ক্ষেত্র মহাশয় ছিলেন এই অষ্টক গান রচনায় খুব পারদর্শী। তার রচিত এই গানগুলো আজও অষ্টক দলেরা গেয়ে থাকেন।

৪. নীলনৃত্য

নীলনৃত্য বা শিবাসন নৃত্য সারা গোপালগঞ্জ জেলার একটি পুরোনো ঐতিহ্য। এখানকার আঞ্চলিক নৃত্যের মধ্যে এটি একটি বিস্ময়কর নৃত্য। এই নৃত্য সবাই পরিবেশন করতে পারে না। যারা পারে তাদের মধ্যে কাশিয়ানী উপজেলার নিজামকান্দির গোসাই মল্লিক ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার রাতপাড়া নিবাসী মন্টু মণ্ডল উল্লেখযোগ্য। নিম্ব ও বিল্ব কাষ্ঠগাত্রে হর–পার্বতীর পবিত্র আসনকে পাটবান বা শিবাসন বলে। দৈর্ঘে প্রায় ৬-৭ ফুট, ওজন প্রায় এক মন। এই পাটবান বা শিবাসনকে মাথায় নিয়ে হাত দ্বারা স্পর্শ না করে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নৃত্য করতে থাকে। কোনো এক সময় দেখতে পাওয়া যাবে ভীষণভাবে ঘুরছে। তবুও ঐ শিবাসনকে নৃত্যকারেরা হাত দ্বারা স্পর্শ করে না।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

১. পুতুল খেলা

এমন নারীর সংখ্যা খুবই কম যারা শৈশবে পতুল খেলা খেলেনি। শৈশব থেকে কৈশোর সময়টা পুতুল খেলার বয়স। পুতুলের মধ্যে থাকে বৎস পুতুল, কৈশোর পুতুল, যুবক-যুবতী পুতুল, দম্পতি পুতুল, মা-বাবা পুতুল ও শ্বশুর-শাশুড়ি পুতুল।

পুতুলগুলো অধিকাংশই মাটির নির্মিত। কাপড়ের পুতুলও দেখা যায়। পুতুল খেলায় স্থান পেয়েছে পুতুলের জন্মদিন, পুতুলের বিয়া, পুতুলের মেলানি, পুতুলের সাধ-ভক্ষণ প্রভৃতি। তবে পুতুলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এই খেলায় স্থান পেতে দেখা যায় না। অচেতন পুতুলগুলোর সাথে ছোট ছোট শিশুরা কথা বলে। মনে হয় সত্যিই যেন পুতুলগুলো তাদের সাথে কথা বলছে। সমাজে পুতুল খেলাটাকে অভিভাবকরাও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রায় সব শিশু মেলায় গিয়ে হাজারও আকর্ষণীয় দ্রব্যের মধ্যে পুতুল কিনে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি দাবি জানায়। না দিলে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটিয়ে দেয়। এই শিশুতোষ সংস্কৃতি গ্রাম বাংলায় জোরেসোরে বয়ে চলেছে। রাজা যেমন রাজ্য জয় করে আনন্দ লাভ করে শিশুরাও হাতে একটি পুতুল পেয়ে তেমন আনন্দ পেয়ে থাকে। তাই পুতুল খেলার গুরুত্বকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

২. আচিয়া খুটি খেলা

এটিও একটি শিশুতোষ ক্রীড়া। আচিয়া খুটি খেলার মধ্যে শিশুরা যে আনন্দ উপভোগ করে তা পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ জড়ো করলে তৎসম হবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। মা বাবা শিশুকে ডাকতে ডাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও শিশুরা তাদের ক্রীড়ার ধ্যান ভাঙায় না। তবে ক্ষুধায় যখন কচি শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে ধূলিমাখা গায়ে ছুটে যায় মায়ের কোলে। এই খেলার উপকরণ হলো চোখ মেলে দেখা সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে তৈরি করে নেয় হাড়ি-পাতিল-থালা-ঘটি-বাটি ইত্যাদি। কেউ ঘোমটা মাথায় বউ সাজে, কেউ বাটনা বাটে, কেউ উনুনে ভাত চড়ায়, কেউ মিথ্যা ধোয়ায় চোখ ডলে, কেউ অভিমান করে বসে থাকে, আবার কাউকে দেখা যায় বাজার সদায় করে ফিরছে। সব মিলেয়ে এ এক চমৎকার দৃশ্য। তাদের এই আয়োজন মিথ্যা হলেও হৃদয়ে যে আনন্দ বয়ে যায় সেটা মিথ্যা নয়। কার্টুনিস্ট, কবি ও ছড়াকারেরা শিশুদের মন জয় করতে কত না কার্টুন, হাসির গল্প, মজার মজার ছড়া রচনা করে যাচ্ছেন, তবুও শিশুতোষ সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গতা এনে দেওয়া সম্ভব হয় না।

শিশুরা কেন এই রকম খেলায় মেতে থাকে তা পর্যালোচনা করলে হয়তো দেখা যাবে প্রকৃতিই তাকে এভাবে সাজিয়ে দিয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে বয়সে যে

www.pathagar.com

জিনিসটা প্রয়োজন প্রকৃতি তা সরবরাহ করতে ভুল করে না। শৈশবে এটা না করলে হয়তো জীবনে বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। তাই শিশুদের কচি দেহের কচিমনে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা অবশ্যই প্রয়োজন।

৩. নোল নোল খেলা

এই খেলাটি জলের মধ্য খেলতে হয়। পরিষ্কার জলে এ খেলা সম্ভব নয়। ঘোলাজল খেলাটির জন্য উপযোগী। এতে খেলোয়াড় ডুব দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। অন্যান্য খেলোয়াড়রা তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা চালায়। যারা স্পর্শ করতে চেষ্টা চালায় তারা ডুব দিয়ে কিংবা জেগে বা ভাসমান থেকে যেকোনোভাবে তাকে তল্লাস করতে পারবে। যে স্পর্শ করতে পারবে সে আবার ডুব দিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে। অন্যান্য খেলোয়াড় আগের মতো তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এভাবে এ খেলা চলে। আঞ্চলিক ভাষায় একে নোল নোল খেলা বলে। খেলতে খেলতে যে হেরে যাবে তার একটি সাজা হয়। সাজাটি হলো–গালে জল ভরে কুলে এসে গোবরের উপর সেই জল ঢেলে দিয়ে দায়মুক্ত হতে হবে।

৪. লাঠিখেলা

সেকালে এবং একালে কোটালীপাড়ার লাঠিখেলা গোপালগঞ্জ জেলা ও জেলার বাইরে দারুণভাবে জনপ্রিয়। কোটালীপাড়ায় লাঠিখেলার স্থানীয় নাম পাইটখেলা।

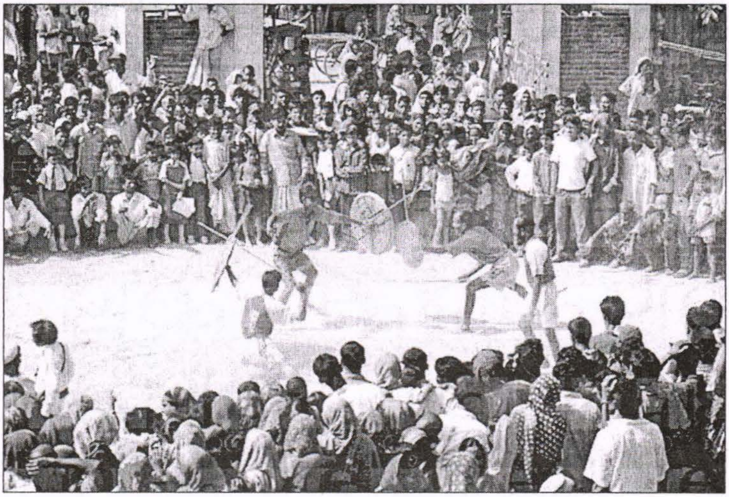

লাঠিখেলা

এই খেলার প্রধান উপকরণ শুধু বাঁশের লাঠি নয়, ঝাঁঝর বাদ্যি বাজিয়ে তাল সৃষ্টি করা হয় এবং লাঠির মাধ্যমে নানা ধরনের খেলা দেখানো হয়। লাঠি খেলায় কখনও কখনও ঢাল-সড়কির ব্যবস্থা করা হয়। দুইপক্ষ দুদিকে অবস্থান নিয়ে বাদ্যির সাথে অপর পক্ষকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করে, একসময় পরাজিত হয় এক পক্ষ।

www.pathagar.com

হাতে লাঠি ধারণ করে লেঠেল যখন শরীর উল্টিয়ে কসরৎ দেখান, তখন লাঠিতে জাদু সৃষ্টি হয়। লাঠিখেলার কলাকৌশল না জানলে খেলায় কেউ অংশ নিতে পারে না, এবং যে কেউ লেঠেল হতে পারে না। ঐতিহ্যবাহী এই লাঠিখেলা শক্তি প্রদর্শন এবং শক্তিশালী হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়।

কোটালীপাড়ায় সেকালে লেঠেলবাহিনী গড়ে উঠেছিল। তারা মারামারি নয়, লাঠিখেলা প্রদর্শন করে মানুষের মনোরঞ্জন করতো। তবে ঝগড়া বিবাদে যে লেঠেল বাহিনী ভাড়া খাটেনি, তা কিন্তু বলা যাবে না।

কোটালীপাড়ার মধ্যে সোনাটিয়া, কাগডাঙ্গা, গোপালপুর, কোনেরবাড়ি, কুরপালা, চিত্রাপাড়া, পূর্ণবর্তী ও উত্তরপাড়ার লেঠেল বাহিনীর সুনাম এখনও সুবিদিত। এদের মধ্যে সোনাটিয়ার বাঙালি মোল্লা, আফসারউদ্দীন শাহ, জালাল উদদীন, বাগডাঙ্গা গোপালপুরের ধলা মিয়া, সাদেকুর রহমান, কচুয়ালির খলিল, কাদের, ফয়জর হালদার, পূর্ণবর্তীর মুসা সরকার, মোসলেম সরদার, ইশা হাওলাদার এবং চিত্রাপাড়ার লেহাজউদ্দীন ও মেনাজউদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এরা ছিলেন দলপতি বা দলের সরদার। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী এই লাঠিখেলা বা পাইটখেলা আগের মতো প্রদর্শিত হয় না। বিলুপ্ত না হলেও কোনো রকমে টিকে আছে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে।

৫. পোলাপুলি খেলা

পোলাপুলি খেলাটি মাঘ-ফাল্গুন মাসে অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা খেলে থাকে। বিশেষ করে বাড়িতে যখন রবিশস্য উত্তোলন করা হয়। ৪-৫ জনে মিলে শুরু করে এই পোলাপুলি খেলা। একজন পালিয়ে থাকবে সুবিধা মতো স্থানে। অন্যরা তাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে। তাকে খুঁজে বের না করতে পারলে পলাতক খেলোয়াড়ের পক্ষের একজন তাকে একটু সংকেত দিতে বলে। তখন সে বলে উঠে কুল্লুক ভক্কা। বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা ওই শব্দের উৎপত্তিস্থল বের করতে চেষ্টা চালায়। তারপরও খুঁজে বের করতে না পারলে অনুসন্ধানকারী দল হেরে যাবে।

৬. কুৎ কুৎ খেলা

এই খেলাটি কিশোরীরা খেলে থাকে। কখনও গোলাকৃতি, কখনও আয়তক্ষেত্রের মতো, আবার কখনও বর্গক্ষেত্রের মতো মাটিতে খোট অংকন করে নেয়। ওই খোটগুলোকে ৫-৬টি, খণ্ডে বিভক্ত করতে হয়। তারপর এক-পা পিছন দিকে ভাঁজ করে এক টুকরা চাড়া খোটে ছুড়ে মেরে কুৎ কুৎ বলতে বলতে এক পা দিয়ে লাফাতে লাফাতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। খেলাটি বেশ কঠিন। নিশ্বাস বন্ধ করে কুৎ কুৎ বলতে হবে। নিশ্বাস গ্রহণ করলে আর হলো না। এক-পা দিয়ে চাড়া খণ্ডটিকে ধাক্কা মেরে সামনে দিকে নিয়ে যেতে হয়।

৭. বাগুন ঢ্যাবঢেবি খেলা

এই বাগুন ঢ্যাবঢেবি খেলাটি কিশোর বালকেরা খেলে থাকে। ৭-৮ জন মিলে এ খেলা খেলতে দেখা যায়। গামছা ভালো করে পাকিয়ে একধারে গিট করে নিতে হয়। এক

www.pathagar.com

জনের হাতে থাকে সেই গিটওয়ালা গামছা। বাকিরা গোল হয়ে গায়ে গায়ে মিশে বসে থাকে। যার হাতে গামছা সে তাদেরকে ঘিরে দ্রুত বেগে হাঁটতে থাকে। তবে গামছা সে খুব সাবধানে রাখে। হাঁটার ভিতর দিয়ে কোনো একজনের পিছনে রেখে যাবে। যার পিছনে গামছাটা রেখেছে সে যদি টের না পায় তবে তারা কপালে থাকে দুর্গতি । যে ঘুরছিল সে ঘুরে এসে ওই গামছা ধরে তাকে বেদমভাবে পিটাতে শুরু করে। দৌড়ে ঘুরে এসে আবার সেই স্থানে না বসা পর্যন্ত সে শুধু মারই খেতে থাকবে। আর যদি কেউ দেখতে বা বুঝতে পারে যে আমার পিছে গামছা আছে তবে সে দ্রুত উঠে ওই গামছা ধরে যার হাতে গামছা ছিল তাকে পিটাতে শুরু করে। যতক্ষণ সেও ঘুরে দৌড়ে এসে না বসবে ততক্ষণ চলবে বাগুন ঢ্যাবঢেবির পিটানি। এই হচ্ছে এই খেলাটির বৈশিষ্ট্য।

৮. পুথিবাড়ি খেলা

এই খেলাটি রাখাল বালকদের। ৪-৫ জন রাখাল বালক মিলে এই খেলা খেলে থাকে। যে লাঠি দ্বারা গরু পিটায় তাকে বলে নড়ি। নড়ি হচ্ছে এই খেলার প্রধান উপকরণ। ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা একটি কাটের বা বাঁশের খণ্ডও লাগে এতে। নির্দিষ্ট স্থানে একটি নড়ি তারা পুতে রাখে। সেখানে দাঁড়িয়ে একজন ঐ কাঠের বা বাঁশের খণ্ডটিকে উপরে ছুড়ে মেরে নড়ি দ্বারা সজোরে বাড়ি দেয়। বাড়ি লাগালে খণ্ডটি ভোম ভোম করে বহুদূরে গিয়ে পড়ে। সেখান থেকে বিপক্ষের একজন তা ধরে ঐ পুতে রাখা নড়িকে তাক করে ছুড়ে মারবে। নড়ি স্পর্শ করলে সে বাদ পড়বে। আর যদি খণ্ডটিকে বাড়ি মেরে ফিরাতে পারে তবে যেখান গিয়ে খণ্ডটি পড়েছে সেখান থেকে নড়ি মেপে মেপে কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসবে। এই ভাবে খেলতে যে বা যারা বেশি দূরত্ব আদায় করতে পারবে তারা জয়ী হবে। এ খেলাটি অনেকটা ক্রিকেট খেলার মতো।

৯. গোবর্ধন খেলা

এই খেলাটিও রাখাল বালকদের। এ খেলায় মাঠ লাগে না। রাস্তার পাশে, নদীর পাড়ে বা কোনো সুবিধামতো জায়গায় গরু রাখার অবসরে রাখাল বালকেরা সুবিধামতো কিছু খেলা তারা নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে। তাই এই খেলাগুলোকে রাখালি খেলা বলা হয়। খেলার নামকরণ অবশ্য তাদেরই নির্ধারণ করা। এককালে গ্রাম বাংলায় এসব খেলার খুব চাহিদা ছিল। রাখাল বালক ছাড়াও সবাই এ খেলাগুলো খেলতো। সাধারণত তিনটি খেলাই রাখালি খেলা নামে পরিচিত : পুথিবাড়ি, গোবর্ধন ও লাটি সম্বড়ি। তারা গাছের পাতা দিয়ে টস ধরে। টসে যে হেরে যায় তাকে সবাই ধাওয়া করে। তার হাতে থাকে একটি নড়ি। দৌড়ানো অবস্থায় যদি কোথাও এক টুকরা গোবর পায় তবে সাথে সাথে নড়ি দ্বারা ওই গোবর স্পর্শ করে। তখন আর কারোর অধিকার থাকে না তাকে ধাওয়া করার বা স্পর্শ করার। কিন্তু গোবর স্পর্শ করা অবস্থায় ভুলক্রমে যদি কেউ তাকে স্পর্শ করে তবে তাকেই দৌড়াতে হয়। গোবরকে নিয়ে এই খেলা, সম্ভবত এই কারণে এর নাম হয়েছে গোবর্ধন খেলা। এটি কদাচিৎ চোখে পড়ে।

www.pathagar.com

১০. লাটি সম্বড়ি বা রাখল রাজা

এই খেলাটি খেলতেও নড়ি লাগে। ৭-৮ জন পরস্পর মিলে একটি চুক্তিতে অবদ্ধ হয়– এই খেলায় যে জিতবে সে কি পুরস্কার পাবে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিজয়ী বালক রাখাল রাজার মর্যাদা পাবে। নির্দিষ্ট একটি সীমা থেকে আনুমানিক দশ হাত দূরে একটি নড়ি আড়াআড়িভাবে বিছায়ে রাখা হয়। তারপর একে একে নড়ি মাটি ঘেষে সামনের দিকে ছুড়ে মারবে। তবে নড়িটিকে অবশ্যই স্পর্শ করে যেতে হবে। যার লাটি সবথেকে বেশিদূরে যাবে সেই জিতবে এ খেলায়। তারপর অন্যরা সবাই একত্রিত হয়ে সকল লাঠি বা নড়ি জড়ো করে ধরে রাখবে। বিজয়ী বালককে তাতে বসায়ে রাখাল রাজা সাজে চারিদিক বয়ে নিয়ে বেড়াবে। এ হলো লাঠি সম্বড়ি বা রাখাল রাজা খেলার তাৎপর্য।

১১. নৌকা বাইচ

বাইগ্যার বিলের নৌকা বাইচ : গোপালগঞ্জ জেলার বাইগ্যার বিল সকলের কাছে সুপরিচিত। চলন বিলের পরই এর স্থান। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপড়া, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর এবং মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলায় এ বিলের অবস্থান। তবে অধিকাংশ বিল কোটালীপাড়া উপজেলায় অবস্থিত। এই বিলের দক্ষিণে কোটালীপাড়া, উত্তরে মুকসুদপুর, পশ্চিমে কাশিয়ানী ও পূর্বে রাজৈর। সেকালে বাইগ্যার বিলের দৈর্ঘ ছিল ৬০ কিলোমিটারের বেশি। কালের আবর্তে বিলের মাঝে মাঝে বসতি গড়ে ওঠায় দৈর্ঘ প্রস্থ কমেছে। কিন্তু এখনও বিলটির অবকাঠামো ঠিকই রয়েছে। অর্ধশতাধিক বছর

নৌকা বাইচ

আগে এই বিলে কোনো চাষাবাদ হতো না। কারণ বিলের জমি পানিতে ডুবে থাকতো। কখনও জমি শুকাতো না। বিলে সারা বছর পানি থাকাতে মাছ চাষের জন্য বিখ্যাত ছিলো। ঐতিহ্যবাহী এই বিলটি লোক সংস্কৃতির অঙ্গনেও নানা কারণে বিখ্যাত। এই বিলে অনুষ্ঠিত হয় শত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ। বাইগ্যার বিলের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একটি বিরাট নদী। এই নদীটি আড়িয়াল খার শাখা নদী।

www.pathagar.com

কোটালীপাড়া সীমানায় প্রবেশকালে অর্থাৎ কদমবাড়ি এলে এর নাম হয়েছে কালিঞ্জিরী। কালিঞ্জিরী দক্ষিণে ঘাঘোর নামে পরিচিত। পুরো নদীটি বাইগ্যার বিলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। প্রতিবছর ১লা কার্তিক এই বিলের রামনগর থেকে কালিঞ্জিরী পর্যন্ত বয়ে যাওয়া নদীতে নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষাধিক লোক নদীর দুইকূলে ভাসমান নৌকায় চড়ে বাইচ প্রদর্শন করে। দুপুরের পর থেকেই বাইচ শুরু হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই বাইচ দেখতে আসে। শুধু গোপালগঞ্জ জেলার লোকই নয়, মাদারীপুর ও বরিশাল জেলার অনেক লোক এই বাইচ প্রদর্শন করেন। বাইচের নৌকাগুলো হয় নানা রঙের। সাজিয়ে গুছিয়ে ঐদিন আনা হয়। বাদ্য বাজনা এবং সারিগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। সে কি অভূতপূর্ব দৃশ্য। এর শুরুটা কবে তা কেউই বলতে পারে না। বর্তমানে পানির স্রোত নেই, ক্ষীণগতি, কোথাও মরা মরা ভাব এই নদীটির। তবুও পুরোনো ঐতিহ্য এখনও টিকে আছে। পহেলা কার্তিক নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয়।

বৌলতলী, সাতপাড় ও সানপুকুরিয়ার নৌকা বাইচ : লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে সম্প্রতি বৌলতলীর মেলাটি এলাকাবাসীর দৃষ্টি নন্দনে এসেছে। অবশ্য জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি সুদৃঢ় স্থান করে নিয়েছে এখানকার শারদীয়া দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে। এই জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র না করে লক্ষ্মীপূজায় কেন এই মেলার আয়োজন? সম্ভবত প্রাচীনকালে এই জনপদটি ছিল লক্ষ্মীপূজার জন্য অধিকতর আকর্ষণীয়। সঙ্গত কারণে মেলাটি লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেলাটির বিশেষ আকর্ষণ নৌকা বাইচ। বিভিন্ন আকৃতির বাচাড়ি নৌকা এসে বাইচের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তদুপলক্ষে বিজয়ীদের জন্য পূজা উদ্যাপন পর্ষদও ভালো ভালো পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করে থাকেন। নদীর দুই পাড়ের জায়গা ভরাট হয়ে যায় রঙ-বেরঙের দোকান, পসরা ও আপামর জনসাধারণের ভিড়ে। বাণিজ্যিক এই বৌলতলী বাজারের উত্তরপাশের কেকানিয়া থেকে নৌকা বাইচের পাল্লা শুরু হয়ে দক্ষিণের পদ্মবিলা পর্যন্ত যেয়ে শেষ হয়।

যতদূর জানা যায় ২০১১ সালে প্রথম সংস্কৃতিসেবী নারীরা মেলাটিতে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। মাদারীপুর বিলরুট ক্যানালের তীরে এই জনসভ্যতায় বিশেষ ৪টি স্থানে সাড়ম্বরে আজঅবধি নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে : জলির পাড়ের দুর্গাপূজার নৌকা বাইচ, সাতপাড়ে দুর্গাপূজার ও কালীপূজার নৌকা বাইচ ও সানপুকুরিয়ায় কার্তিক পূজার নৌকা বাইচ। প্রতিটি মেলায়ই কর্তৃপক্ষ নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করে থাকেন। এলাকাবাসী পরম উৎসাহে অপেক্ষা করতে থাকে বর্ষ পরিক্রমায় কবে অনুষ্ঠিত হবে তাদের এই প্রাণের মেলা, মিলন মেলা।

ঘাঘর নদীর নৌকা বাইচ : পদ্মা নদীর অনেক স্রোতধারা শাখা নদীতে পরিণত হয়েছে এবং ফরিদপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ হয়ে দক্ষিণে বয়ে চলেছে। এদের মধ্যে মধুমতী, ঘাঘর ও আড়িয়াল খাঁ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

ঘাঘর ৫০০ বছর আগের পুরোনো নদী। কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য পদ্মাপুরাণে এই নদীটির বর্ণনা রয়েছে। ঘাগর নদীর স্রোতধারা সরাসরি মাদারীপুর জেলার রাজৈর হয়ে কোটালীপাড়া উপজেলায় প্রবেশ করেছে। রাজৈরে এর নাম কালিঞ্জিরী। কালিঞ্জিরী থেকে এই স্রোতধারা বিভিন্ন জনপদের ওপর দিয়ে বয়ে দক্ষিণে টুঙ্গীপাড়ার পাটগাতীর মধুমতীর মোহনায় মিশেছে। রাজৈর থেকে পাটগাতী পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ কিলোমিটার।

কোটালীপাড়ার ঘাঘর নামক স্থানে এটি ঘাগর নদী নামে পরিচিত। এই নদীর পাড়েই গড়ে উঠেছে ৫০০ বছরের ঘাগর বন্দর। কোটালীপাড়া বিল বাওড়ের এলাকা। দু-তিনশো বছর আগে এখানে জাহাজ ভিড়তো। নীহাররঞ্জন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, নির্মল সেন প্রমুখের লেখায় এসব তথ্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। কোটালীপাড়া হিন্দু প্রধান এলাকা। এখনও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেকালে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা দুর্গাপূজা মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করতো। কলকাতা থেকে হিন্দুরা আসতো গ্রামের বাড়িতে পূজা উদ্‌যাপনের জন্য। দুর্গাপূজা উপলক্ষেই ঘাগর নদীতে অনুষ্ঠিত হতো নৌকা বাইচ। সাজানো শত নৌকা এতে অংশ নিতো। দুপুর থেকে নদীতে নৌকা আসা শুরু হতো। আবার কোনো কোনো নৌকায় থাকতো বিসর্জনের দেবী দুর্গা। নৌকা বাইচের পর চোখের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হতো মা 'দুর্গা' এবং তাদের সন্তানদের। আনন্দের মাঝে বিসর্জনের বেদনা একাকার হয়ে যেত। ঘাগর নদীর নৌকা বাইচ এখনও অনুষ্ঠিত হয়। জোয়ার-ভাটার গতি কমে গেলেও নদীটি এখনও মরে যায়নি। তবে নৌকার সংখ্যা কমেছে। সেকালের লম্বা নৌকাগুলো আর নেই। এখন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাইচ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

১২. ষাঁড়ের লড়াই

গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের কাছে আড়ং শব্দটি এখনও পরিচিত। বাংলার আদি লোক সংস্কৃতিতে আড়ং-এর ভূমিকা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। সেকালে এই আড়ং উপলক্ষেই ষাঁড়ের লড়াইয়ের আয়োজন করা হতো। পুরো গোপালগঞ্জ জেলা ছিল কৃষি প্রধান। বছরে মাত্র দুটি ফসল উৎপাদন করতো কৃষকরা। আষাঢ়-শ্রাবণে আউশ ধান আর অগ্রহায়ণ-পৌষে আমন ধান।

আমন ধান কাটার পরে জেলার নির্ধারিত স্থানসমূহে বসতো আড়ং। অভিধানে আড়ংয়ের অর্থ গোলা, গঞ্জ ও হাট করা হলেও লোকায়ত সংস্কৃতিতে বিশেষ করে জেলার সাধারণ মানুষের কাছে এর অর্থ ষাঁড়ের লড়াইয়ের একটি দিন। এদিন সাজানো হতো মাঠ। মাঠের চারপাশে বসতো ছোট খাটো দোকান। ষাঁড়ের লড়াই দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন ছুটে আসতো। লড়াই শুরু হতো অপরাহ্নে। যেকোনো ষাঁড়ের মালিক এতে অংশ নিতেন। এ ছিল এক মহা আনন্দের ব্যাপার। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই আনন্দের ভাগীদার হতেন। সর্বজনীন এই আনন্দ লোকজীবনের ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ যেন কৃষিজীবী সমাজের ঐক্য-একাত্মতার লোকাচার। যা বছরের একটি দিনে সবার জন্য অপেক্ষা করে।

www.pathagar.com

ষাঁড়ের লড়াই

সেকালে চাষাবাদের প্রধান উপকরণ ছিল গরু। গরুর মধ্যে গাভী ও ষাঁড় ভিন্ন ধরনের। গাভী বা গাই স্ত্রী জাতীয়; আর যে গরু বয়স্ক হবার আগে অন্ডকোষ ফেলে দিয়ে বড় করা হয়, সেগুলো পুরুষ জাতীয় গরু। যে সকল গরুর অন্ডকোষ ফেলে দেওয়া হয় না, সেগুলোই ষাঁড় নামে পরিচিত। তাই ষাঁড়ের লড়াইয়ে ষাঁড়-গরুই অংশ নেয়। কোষ ফেলে দেওয়া কোনো গরু এতে অংশ নিতে পারে না শারীরিক অসমর্থতার কারণে। বলদ গরু কমশক্তিশালী থাকে। লড়াইয়ে শক্তিশালী বলবান ষাঁড়ই প্রয়োজন হয় এবং অংশ নিয়ে থাকে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, লড়াইয়ে যেকোনো ষাঁড়-গরু অংশ নেবার উপযুক্ত হয় না। এজন্য একটি ষাঁড়কে আলাদা করে আলাদাভাবে দুইতিন মাস লালন পালন করতে হয়। কখনও অন্ধকার ঘরে ষাঁড় রাখা হয় এবং উপযুক্ত ঘাস বিচুলি নিয়মিত দিতে হয় এবং যে আড়ং-এর লড়াইয়ে অংশ নেবে, সেই আড়ং-এর দিন তাকে ঘর থেকে বের করে গোসল করিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে শক্ত দড়িতে বেঁধে লড়াইয়ের মাঠে নেওয়া হয়।

কোটালীপাড়ার কুরপালা কাজীবাড়ির সামনের মাঠে এক সময় বসতো আড়ং। এই আড়ং উপলক্ষে জমজমাট ষাঁড়ের লড়াই হতো। শত শত সাজানো ষাঁড় আসতো উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে। লড়াই শেষে পুরস্কার প্রদান করা হতো ষাঁড়ের মালিককে। হাজার হাজার মানুষ ষাঁড়ের লড়াই দেখতে গিয়ে মেলার আনন্দ উপভোগ করতো। আধুনিক চাষাবাদ শুরু হবার কারণে গরুর লালন-পালন কমেছে। শক্তিশালী ষাঁড় গরুর দেখা মেলা ভার। তাই ষাঁড়ের লড়াই এখন আর আগের মতো অনুষ্ঠিত হয় না।

১৩. ঘোড়াদৌড়, গরুদৌড়

ঘোড়াদৌড় ও গরুদৌড়ের জন্য এককালে গোপালগঞ্জের হাটবাড়িয়া, পিঠাবাড়ি, টুঠামান্দ্রা, কুমরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ছিল খুব সুনাম। লোকসংস্কৃতির অনুরাগী এমন

www.pathagar.com

একজন ব্যক্তিত্ব শুকদেব বিশ্বাস (৬২) জানালেন বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ, বাড়িঘর বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে এই লোকজসংস্কৃতির এখন খুব দৈন্য দশা। তবে অনিয়মিতভাবে অত্র অঞ্চলে ঘোড়াদৌড় হয়ে থাকে। নির্ধারিত কোনো স্থান বা পার্বণকে ঘিরে এই প্রতিযোগিতা হয় না। বিশেষ করে পিঠাবাড়ি গ্রামটির নাম এখনও মানুষ স্মরণ করে ঘোড়াদৌড় ও গরুদৌড়ের জন্য। তিনি আরও জানালেন সাতপাড় সূর্য তরুণ ক্লাবের উদ্যোগে শীতের মৌসুমে সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দূর-দূরান্ত থেকে দক্ষ সাইকেল চালকগণ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

১৪. ঘুড়ি উড়ান

ঘুড়ি উড়ান সংস্কৃতি নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল কিংবা দেশে সীমাবদ্ধ নেই। বিভিন্ন দেশে এই সংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যায়। চীন জাপানের ছেলেমেয়েরা খুব সখ করে ঘুড়ি উড়ায়। আমাদের দেশে ঘুড়ি উড়ানোর মৌসুম হলো চৈত্র বৈশাখ মাস। এখানে দেখা যায় উন্মুক্ত ধান ক্ষেতে যখন কঁচি ধানগাছ হেলে-দুলে নাচে তখন তারমধ্যে ছেলেরা ঘুড়ি উড়ায়। যেসকল ঘুড়ি এই নীল আকাশে দেখা যায় তারমধ্যে ত্যালপতেঙ্গা ঘুড়ি, জের ঘুড়ি ও ঢ্যাপস ঘুড়ি উল্লেখযোগ্য। ঘুড়ির মাথায় এক ধরনের যন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। একে ভেরি বলে। তাতে বাতাস লেগে রি....রি....একটা শব্দ হয়। সুতার কাছে কান রাখলে তা সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। আড়ুয়াকংশুরের সুধন্য চৌধুরী ছিলেন এই ঘুড়ি নির্মাণের একজন দক্ষ কারিগর।

১৫. মাথায় কাদামাটির ব্যবহার

চুলের জড়তা খুলতে আগের দিনের মানুষ প্রায়ই লাল মাটি গুলিয়ে মাথায় লেপ দিয়ে রাখত। এখনও মানুষ অল্প-স্বল্প হলেও তা ব্যবহার করে থাকে। তবে সব মৌসুমে এটির ব্যবহার প্রচলিত নয়। বিশেষ করে চৈত্র বৈশাখ মাসে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে মাথায় লাল মাটির লেপ দিয়ে রাখে। চুলের জটলা খুলতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে এই পদ্ধতিটা খুবই উপকারী। এরসাথে তারা তিলের পাতা মিশায়ে নিত। তিলের পাতা মিশালে চুল খুব ঝুরঝুরে হয়। ডিটারজেন্ট বা সাবানের পরিবর্তে মাটির ব্যবহার গ্রাম্য লোকেরা অধিকতর নিরাপদ মনে করত। পূর্বে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করতে অনেকে ছাই ব্যবহার করতো। তবে সব ধরনের জ্বালানির ছাই থেকে নয়। বিশেষ করে তিল গাছের ছাই ও বাদাম গাছের ছাই, এতে খারের গুণাগুণ বেশি। তাই তারা এগুলোর ছাই সংরক্ষণ করে রাখত।

তথ্যসহায়ক

১. মো. লিয়াকত আলী মোল্লা, গ্রাম-সোনাটিয়া, কোটালীপাড়া।
২. অ্যাডভোকেট আবদুল হালিম ফকির, সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া।
৩. শেখ বুলবুল এ জাফর, গ্রাম : সিতাইকুণ্ড, উপজেলা : কোটালীপাড়া।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

এ জেলার জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা সর্বাধিক। আছে খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরাও। তবে বৌদ্ধদের সংখ্যা খুবই কম। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন গোত্রে বর্ণে বিভক্ত হয়ে রয়েছে এখানকার জনগণ। বলা যেতে পারে এই বিভক্ত ধর্ম ও পেশার কারণে।

১. পাল সম্প্রদায় : অভিধানে পাল শব্দের অর্থ যাই থাক না কেন, মূর্তি যারা তৈরি করেন, তারা পাল নামে পরিচিত। শত শত বছর আগে কোটালীপাড়ার মদনপাড়, পশ্চিমপাড় এবং তারাশিতে পাল সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিলো। বারো মাসে তেরো পূজার কারণে তারা সারা বছরই নানা মূর্তি তৈরি করত। সাতচল্লিশের পর হিন্দুরা ভারতে চলে যাবার কারণে পূজোর সংখ্যা কমে যাওয়ায় মূর্তি কারিগরদের সংখ্যাও কমে যায়। অনেকে পাড়ি জমান কলকাতায়।

হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা হওয়ার কারণে এখনও সমগ্র কোটালীপাড়ায় হাজার হাজার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ কারণে এখনও কোটালীপাড়ায় এই সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা কম নয়। তবে তারা শুধু মূর্তি তৈরি করেই জীবিকা নির্বাহ করে না, পূজা না থাকলে কৃষিকাজসহ অন্যকাজে দিন কাটায়। উল্লেখিত গ্রামগুলোর এখন আর পালপাড়া কথাটি শোনা যায় না। তবে তাদের পাশাপাশি বসবাসরত কুমার পাড়া কথাটি এখনও শোনা যায়। দুর্গাপূজার সময় তারা ব্যস্ত থাকেন মূর্তি তৈরির কাজে। এখন যারা অধিক সংখ্যায় মূর্তি তৈরি করেন তারা রত্নবাড়ি, মদনপাড়া ও মঠবাড়িতে বসবাস করেন। তাদের মধ্যে আদিপাল হলেন রত্নবাড়ির রতনপালের পরিবার। এই পরিবার ছাড়া কোটালীপাড়ার বিভিন্ন গ্রামের বেশকজন কারিগর মূর্তি তৈরি করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে গাছিয়াশুরের ধীরেন পাল, মদনপাড়ার মহাদেব সাহা, হিরনের তপনপাল, আমবাড়ির শ্রীবাস, তারাকানের মানিকপাল, রতালের পঞ্চানন্দ, রত্নবাড়ির রঞ্জিতপাল ও ঘাঘরের কামাল পাল উল্লেখযোগ্য।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য কামাল মূর্তি গড়ার কাজটি শিখেছেন এদের কারো কাছে। তার হাতের কাজ শিল্পমণ্ডিত। তবে ভাস্কর্য নির্মাণে তিনি পারদর্শী।[১]

২. মৎস্যজীবী : মৎস্যজীবীদের বসতি গড়ে উঠেছে নদীর তীরে ও জলাশয় স্থানে। তেঁতুলিয়া ও গোলাবাড়িয়া গ্রামে এই পেশাজীবীদের সংখ্যা মোটামুটি চোখে পড়ে। বানিয়ারচরে মৎস্যজীবীদের বেশ কয়েকটি মৎস্য গুদাম আছে।

৩. নরসুন্দর : পরামানিক বা নরসুন্দরদের বসতি জেলার সব জায়গায় পরিলক্ষিত হয়।

৪. ব্রাহ্মণ : কোটালীপাড়ায় একদা ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল সবচেয়ে বেশি। তবে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় উলপুর গ্রামে বেশকিছু ব্রাহ্মণের বসতি দেখতে পাওয়া গেছে।

www.pathagar.com

৫. দাই : উলপুর গ্রামে দু'এক ঘর দাইও বসবাস করে আসছে। পাটনীও এই গ্রামে বসতি স্থাপন গড়ে তুলেছে।

৬. তাঁত শিল্প : কংশুর গ্রামে তাঁত শিল্পীদের বসত অনেক আছে। তবে এখন ওই পেশা আর তাদেরকে অবলম্বন করতে দেখা যায় না।

৭. কামার : কামাররা সংঘবদ্ধভাবে কোথাও নেই। জেলার সবখানেই তারা বসবাস করছে।

৮. মিস্ত্রি ও সুতার মিস্ত্রি : মিস্ত্রি ও ছুতাররা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কুলু বা তৈল ব্যবসায়ীরা এখন আর কুলু পেশায় নিয়োজিত নেই। বিভিন্ন পেশায় তারা ঢুকে পড়েছে।

৯. গায়েন : গোপালগঞ্জ জেলায় গায়েনরা সাম্প্রতিক বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। সাতপাড়, শেওড়াবাড়ি, গান্ধিয়াশুর, শাফলীডাঙ্গা, কৃষ্ণপুর এসব অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের গানের দল সৃষ্টি হয়েছে।

১০. গাছি : গাছিরা এই এলাকার হারানো ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। খেজুর গাছের গাত্র ছেঁচে শীতের দিনে রস বের করা গাছিদের চমৎকার একটি শিল্পকর্ম। তাল গাছ, খেজুর গাছ ও নারিকেল গাছের প্রাচুর্যের জন্য এই পেশাজীবীরাও এখনও বেশ সচল আছে। সব ধরনের পেশাজীবীরা গোপালগঞ্জ জেলায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে।

১১. লাঠিয়াল : কাজিয়া সাধারণত পূর্বে সৃষ্ট জমিদার কর্তৃক গঠিত একটি বাহিনীর লাঠিয়াল কর্ম। তাদের নামকরণ করা হয়েছিল লাঠিয়াল। এদের কাজ ছিল প্রতিপক্ষের সঙ্গে মারামারি করা। জমিদার তার জমিদারি ঠিক রাখবার জন্য জমিদারভুক্ত গ্রামগুলি থেকে এমনকি বাইরে থেকেও সাহসী ও গোয়ার শ্রেণির লোক নিয়ে এই লাঠিয়াল দল সৃষ্টি করত। এতে স্বভাবত গরীব শ্রণির লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হতো। হিন্দু, মুসলিম, সাঁওতাল ও বাগদিরাও থাকতো এই দলে। জমিদাররা তাদের বিপদজনক করে গড়ে তুলতো। যাতে যেকোনো সময়ে জমিদারের হুকুমমতো প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মানুষ খুন করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। এদের মধ্যে সাহসী কাজিয়া করার জন্য কৌশল দেখে তাকে উপাধি দিতেন সর্দার বা বাঘা। এই সর্দার বা বাঘার কৌশল মতো হতো কাজিয়া। এরা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করত বেতের তৈরি ঢাল। যা এখনও গ্রাম অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। লাঠিয়ালরা প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার সময় ব্যবহার করত লোহার তৈরি বল্লম, ভেলা, রামদা, তীর ধনুক, কাতরা বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক মারাত্মক অস্ত্র।

১৭৫৭ সালে ২৩শে জুন তারিখে নেমে এলো বাংলার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ছায়া। ডুবে গেলো বাংলার স্বাধীনতা সূর্য, উদয় হলো দানববেশী ব্রিটিশ শাসন। ছড়িয়ে পড়ল তারা সারা পাক ভারত উপমহাদেশে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কর আদায়ের জন্য আবিষ্কার করল এক অভিনব কৌশল। প্রথম তারা কর আদায় করত নবাবী আমলের হিসেব দৃষ্টে। কিন্তু সমস্ত বন্দোবস্তই ব্যর্থ হয়। পরে লর্ড কর্নওয়ালিশ ইংরেজ ঘেষা অভিজাত শ্রেণির হিন্দু ও মুসলমানদের ডেকে নিয়ে পরগণা বা জায়গীরদার করেন। তাদের মধ্যে লিজ দিয়ে দেয় এবং পরে তা পত্তনে রূপ নেয়, যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

www.pathagar.com

নামে পরিচিত। আর এদের নাম দেওয়া হয় জমিদার বা/ও তালুকদার। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিল হিন্দুরাই। যেমন–উলপুরের কামদেব রায় চৌধুরী সাড়ে তিন আনি অংশ, রাম জীবন রায় চৌধুরী তিন আনি, কৃষ্ণ রাম রায় চৌধুরী সোয়া তিন আনি, রূপরাম রায় চৌধুরী তিন আনি, তারক চন্দ্র রায় তিন আনি, হরচরণ রায় তিন আনি অংশ। এই পরগণা বা জেলা বিভাগ সমস্তই রাজশক্তির প্রভাবে ছোট বা বড় হতো। প্রথমে পরগণা বা জেলার সীমা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তনও দেখা দেয়। এর বড় কারণ ছিল ১৮৫৭ হতে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ক্যাপ্টেন জে ই গেস্ট্রেল ও এনটি ভেলি সার্ভেয়ারের অদক্ষতায় যে সার্ভে হয় তা সীমানা নির্ধারণে বিবাদ থেকে যায়। ফলে জমিদার-জমিদারদের মধ্যে সীমানা নির্ধারণে বিবাদ হতে থাকে। যার কারণে প্রয়োজন হয় লাঠিয়াল দলের। এই জমিদাররাই সীমানা অতিক্রমণে পক্ষ প্রতিপক্ষ মেতে উঠতো তুমুল দাঙ্গায়। শত শত জীবননাশও হতো এই লাঠিয়ালদের হাতে। এভাবে পক্ষ-প্রতিপক্ষ দ্বারা সংঘঠিত হয় কাজিয়া। অবশ্য ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্ট দেশ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয় এবং ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটে এবং জমি প্রজাস্বত্বে পরিণত হয়।

এখনও এই কাজিয়া প্রথার প্রচলন দেখা যায় গ্রাম বাংলায়। জমিদার কর্তৃক সৃষ্ট এই লাঠিয়ালদের কারণে অনেক সময় সৃষ্টি হতো সাম্প্রদায়িক রেষারেষি।[২]

১২. অন্যান্য পেশাজীবী : কাটালীপাড়া হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। এলাকার সিংহভাগ মানুষ কর্মজীবী হলেও এখানে পূর্বকালে ছিল স্বর্ণকার, জেলে, কুমোর, কামার, বাদ্যকার, ব্যবসায়িক, ঘরামি, বাড়ৈ, নাপিত, ধোপা, কর্মকার, তাঁতী, কাঠমিস্ত্রী, দাই, কাপদার (খতনাকারী) সম্প্রদায়। বর্তমানে এসব সম্প্রদায়ের কোনো লোকই স্ব-স্ব-পেশায় নিয়োজিত নেই।

কোটালীপাড়ায় তাঁতী সম্প্রদায়ের এখন আর কেউ কাপড় তৈরি করে না। বাড়ৈ ও বাদ্যকার সম্প্রদায়ও বিলুপ্তির পথে। এসব পেশায় একমাত্র তাঁতী ও বাদ্যকার ছাড়া অন্যরা সবাই হিন্দুধর্মাবলম্বী। তবে যুগের চাহিদা এবং আধুনিক ধ্যান-ধারণার কারণে কোনো লোকই একক পেশায় নিয়োজিত থাকতে চান না। কোনো পেশাই কারও একক নয়। যে কাজে যে দক্ষ, সে কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করে। কাজের ক্ষেত্রে জাত ও সম্প্রদায়ের কোনো ভেদাভেদ নেই। তবে যাদের জমি আছে এবং চাষাবাদের অভিজ্ঞতা প্রচুর, তারা এখনও কৃষিকাজ করে জীবীকা চালায়।[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. ডা. রসময় বিশ্বাস, গ্রাম : বাগান উত্তর পাড়া, কোটালীপাড়।
২. সুধাংশু ভৌমিক (৫৫), গ্রাম : বিদ্যাধর, গোপালগঞ্জ সদর।
৩. নীলুফার ইয়াসমিন রেশমা, বান্ধাবাড়ি কোটালীপাড়া।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

১. গাছ-গাছড়া ও আয়ুর্বেদ ভিত্তিক চিকিৎসা

লোকচিকিৎসা বলতে মূলত ভক্তি, বিশ্বাস, তন্ত্র-মন্ত্র ও গাছ-গাছড়ার চিকিৎসাকে বুঝিয়ে থাকে। প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস হলো লোকচিকিৎসার আরোগ্যের উপায়। যা অসুস্থ দেহকে সুস্থ করে তাই ওষুধ। যদি আপনার উপদেশে কারোর ব্যাধি সেরে যায় তবে উপদেশকে ওষুধ বলা যেতে পারে। হাসলে যদি কোনো রোগের উপশম হয় তবে হাসিকে কেন ওষুধ বলা যাবে না। গান শুনলে যদি ব্যাধিগ্রস্ত দেহে সুস্থতা এনে দেয়, তবে গান কি ওষুধ নয়? হাঁটলে যদি বড় একটি ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তবে হাঁটা কেন ওষুধ হবে না। সাঁতার কাটলে দেহ যদি সুস্থ ও সবল থাকে তবে সাঁতারকে ওষুধ বলতে আপত্তি কোথায়? লোকচিকিৎসা এমন একটা বিষয় যা মন থেকে রোগ দূরীভূত করতে সাহায্য করে। আর মন থেকে যে রোগ সারাতে পারে তার আর দৈহিক রোগ বলে কিছু থাকে না। একজন অসুস্থ ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, অমুক পাড়ার অমুক কবিরাজের কাছে গেলে আমি নিশ্চয় ভালো হবে। তার এই যে আত্মবিশ্বাস এটাই তাকে রোগমুক্ত করে দেয়। এই চিকিৎসায় মানসিক বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই অঞ্চলে অনুসন্ধান করে দেখা দেছে লোকচিকিৎসা বেশ কয়েকটা পদ্ধতির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন :

এক. গাছ-গাছড়া ও আয়ুর্বেদ ভিত্তিক চিকিৎসা।
দুই. তন্ত্রমন্ত্র ও ওঝার চিকিৎসা।
তিন. সিদ্ধ পুরুষের বাক্যদান চিকিৎসা।

সার্বিকভাবে গবেষণা করে দেখা গেছে লোকচিকিৎসা অনেকটা আয়ুর্বেদ ভিত্তিক এবং এখানে এই চিকিৎসার প্রচলন বেশি। আয়ুর্বেদ মতে বাত, পিত্ত ও কফ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই তিনের সমতা শরীরে সুস্থতা আনে। আর এগুলোর পারস্পরিক ভারসাম্য হারিয়ে গেলে শরীরে বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি ঘটায়। তবে এই আয়ুর্বেদ জিনিসটা কি? সে বিষয়ে সম্যক ধারণা নেওয়া যেতে পারে। মহর্ষি সুশ্রুত লিখেছেন, 'আয়ুরস্মির বিদ্যতে অনেন বা আয়ুর্বিন্দত্যায়ুর্ব্বে।' অর্থাৎ যা দ্বারা আয়ু লাভ করা যায় বা আয়ুকে জানা যায় তাকে আয়ুর্বেদ বলে। ব্রহ্মা প্রথমে হাজার অধ্যায় লক্ষ শ্লোক নিয়ে আয়ুর্বেদ প্রকাশ করেন। তাঁর নিকট থেকে প্রজাপতি; প্রজাপতির নিকট থেকে অশ্বিনী কুমারদ্বয়, তাদের নিকট থেকে ইন্দ্র, ইন্দ্রের নিকট থেকে ধন্বন্তরী আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শেখেন। তারপর সুশ্রুত এই আয়ুর্বেদ শিক্ষা লাভ করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

(১) শল্যতন্ত্র, (২) শালক্যতন্ত্র, (৩) কায়াচিকিৎসাতন্ত্র, (৪) ভূতবিদ্যাতন্ত্র, (৫) কৌমার ভূত্যতন্ত্র, (৬) অগদতন্ত্র, (৭) রসায়নতন্ত্র, (৮) বাজীকরণতন্ত্র।

শল্যতন্ত্র : শল্যচিকিৎসা বা অস্ত্রপ্রয়োগ করার প্রণালি এতে বিধৃত আছে।

www.pathagar.com

শালক্যতন্ত্র : স্কন্ধের উপরে যেমন- চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিকা, জিহ্বা, ওষ্ঠ, অধর ও গণ্ডতালু প্রভৃতি স্থানের ব্যাধি এতে লিখিত আছে।

কায়াচিকিৎসাতন্ত্র : এতে জ্বর, অতিসার, রক্ত, পিত্ত, কুষ্ঠ ও মেহ প্রভৃতি সর্বাঙ্গব্যাপী চিকিৎসার বিধান আছে।

ভূতবিদ্যাতন্ত্র : এতে দৈত্য, ভূত, পেত্নী, নাগ, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ ও গ্রহাদির দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের আরোগ্যের উপায়স্বরূপ শান্তিকর্ম ও বলিদানাদির বিষয় লিখিত আছে।

কৌমার ভৃত্যতন্ত্র : এতে শিশু পালন, দুগ্ধের দোষ সংশোধন, স্তনদোষ ও গ্রহদোষ হতে উৎপন্ন ব্যাধির চিকিৎসার বর্ণনা আছে।

অগদতন্ত্র : এই চিকিৎসায় সর্প, কীট, বৃশ্চিক, মুষিকদিগের দংশনজনিত বিষ ও অন্যান্য বিষের লক্ষণ প্রতিবিধানের উপায় লিখিত আছে।

রসায়নতন্ত্র : এতে নিরোগ ও বলিষ্ঠ হওয়ার উপায়, পরমায়ু, মেধা ও বল ইত্যাদি বৃদ্ধি এবং দেহ রোগমুক্ত করার উপায় আছে।

বাজীকরণতন্ত্র : এতে অল্প অথবা শুষ্ক শুক্রের বৃদ্ধি করার নিয়ম, বিকৃত শক্রকে স্বাভাবিককরণ, ক্ষয়প্রাপ্ত শুক্রের উৎপত্তি, ক্ষীণ শরীরের বল বৃদ্ধি এবং মনকে প্রফুল্ল করার বিধান লিখিত আছে।

আয়ুর্বেদের এই যে পদ্ধতিসমূহ তার অনেক বিধানই লোকচিকিৎসার মধ্যে বিদ্যমান। কেবলমাত্র শল্যতন্ত্র ও বলিদান পদ্ধতির যথাযথ ব্যবহার দেখা যায় না। লোকচিকিৎসা একটি পুরাতন চিকিৎসা পদ্ধতি। তাই গাছ-গাছড়া ও নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবহার এই চিকিৎসায় দেখা যায়। কবিরাজদের পাশাপাশি সাধারণ লোকও তদ্বিষয়ে টুকিটাকি ধারণা রাখে। কোনো দ্রব্যের কি গুণ ও কোনো তিথিতে শরীরের কি তারতম্য হয় এ বিষয়টিও বেশ স্থান পেয়েছে। কবিরাজ গোপাল বিশ্বাস (৪৮), গ্রাম-রঘুনাথপুর, তিনি জানান, 'কচি কলাপাতায় দগ্ধ ক্ষত ভালো হয়। এর মূলের রস কৃমিনাশক। কাঁচাকলা সিদ্ধ করে মলম করে লাগালে বংশগত সিফিলিসজনিত চুলকানি ভালো হয় এবং কলার শিকড় মুত্রযন্ত্র হতে নির্গত রক্ত রোধ করে। মানকচু অর্শ্ব ও কোষ্ঠবদ্ধতায় বেশ ফলপ্রদ। মানকচুর ডাটা আগুনে ছেকে নিংড়ে সেই রস কানে দিলে পূঁজপড়া বন্ধ হয়। গরুর গলাফোলা রোগ চিকিৎসার জন্য পঁচা মানকচুর ডাটা বেশ অল্প গরম করে গলায় লাগালে গলাফোলা ভালো হয়।'

এলাকা ঘুরে অনুসন্ধান করে জানা গেছে ধান গাছ আয়ুর্বেদে বহুল ব্যবহৃত। ১০-১৫ গ্রাম আতপ চাল রাত্রে এককাপ জলে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে ভালোভাবে চটকে খালিপেটে খেলে শ্বেতপ্রদর ভালো হয়। ২৫ গ্রাম শালিধান ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে খেলে মুত্রকৃচ্ছতা কমে। আশুধানকে অন্তর্ধুমে পুড়িয়ে ছাই করে পিষে অল্পজলে মিশিয়ে সকাল-বিকাল সেবন করলে অজীর্ণ ভালো হয়।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পদ্মবিলার ব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্র (৫৫) বলেন–'হলুদ আমাদের রন্ধনাদিতে মসলা হিসেবে ব্যবহার হয়। এর ভেষজগুণের কারণে হয়তো এটিকে প্রতিদিন ব্যবহারের বিধান করা হয়েছে মসলা হিসেবে। প্রতিদিন তরিতরকারির সহিত

www.pathagar.com

সেবনে আমরা বহুবিধ রোগ হতে মুক্তি পাই। হলুদের সবচাইতে বড়গুণ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন রোধ করা। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের কারণে চুলকানি, খোস-পাচড়া হয়ে থাকে। পূর্বে শিশুদের তেল হলুদ মাখিয়ে স্নান করানোর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তাদের পাচড়া বা চুলকানি না হয়। প্রমেহ রোগে কাঁচা হলুদের রস এক চামচ মধু বা চিনি মিশিয়ে খালি পেটে রোগীদের খেতে দিলে উপকার হয়। জন্ডিস রোগে কাঁচা হলুদের ৫-১০ ফোটা রসের সাথে চিনি মিশিয়ে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। তোতলামী রোগে কাঁচা হলুদ শুকিয়ে গুঁড়া করে তা ২/৩ গ্রামের সাথে এক চা চামচ ঘি মিশিয়ে রোজ ২/৩ বার অল্প অল্প করে বেটে খেলে তোতলামী ভালো হয়। ফাইলেরিয়া রোগে কাঁচা হলুদের এক চামচ রসে অল্প গুড় ও এক চামচ গো-মূত্র মিশিয়ে খেতে দেওয়ার বিধান আছে। কাঁচা হলুদ শুকিয়ে গুঁড়া করে তার সাথে উচ্ছে পাতার রস ও অল্প মধু মিশিয়ে খেলে হামজ্বর ভালো হয়। নিমপাতার গুঁড়ার সাথে শুকনা হলুদের গুঁড়া এবং শুষ্ক আমলকির গুঁড়া মিশিয়ে সকালে খালিপেটে সেবন করলে এলার্জির উপকার পাওয়া যায়। কার্বঙ্কল জাতীয় ফোড়ায় কাঁচা হলুদ বেটে তার সাথে গো-মুত্র মিশিয়ে অল্প গরম করে দিনি রাতে লাগালে পূঁজপড়া বন্ধ হয়।'

নারিকেল বাড়ির বিখ্যাত ধীরেন কবিরাজ বলতেন–যাদের গা থেকে দুর্গন্ধ বের হয় তাদেরকে বেলপাতার রস জলে মিশিয়ে গা মুছে দিলে দুর্গন্ধ দূর হয়। যৌবনের উদ্দীপনা রোধে বেলের কচিপাতা খাওয়ার প্রয়োজন আছে। বেলের মূলের ছাল চূর্ণ ৬-১২ গ্রেন মাত্রায় দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে হৃদয় দৌর্বল্য দূর হয়। বিল্বমূলের ছাল ১২-১৪ গ্রেন ও জিরা ৬ গ্রেন মাত্রায় একসাথে বেটে গাওয়া ঘি'য়ের সাথে মিশিয়ে খেলে শুক্র তারল্য ভালো হয়।

কবিরাজ ও বালা ক্ষীরোদ পোদ্দারের মতে–ডালিমের খোসার চূর্ণ, ছাগলের দুধের সাথে খেলে অতিসার, রক্তাতিসার ও অজীর্ণ রোগ ভালো হয়। ডালিম গাছের ছাল সিদ্ধ করে খেলে আমাশয় ভালো হয়। এর পাতা ভেজে খেলেও আমাশয় থেকে আরোগ্য পাওয়া যায়। ডালিমের ফুল বেটে মধুসহ খেলে রক্তপ্রদর ভালো হয়। যাদের নাক দিয়ে রক্ত পড়ে তারা যদি ডালিমের ফুলের রস নাক দিয়ে টানে তাতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। সর্দির চাপে যাদের নাক বন্ধ হয়ে মাথা ভারি থাকে তাদেরকে সকালে জয়ন্তী পাতার রস খেতে দিলে তাড়াতাড়ি উপশম হয়। বোলতা বিছে বা ভিমরুলে কামড়ালে জয়ন্তীর বীজ বেটে ক্ষতস্থানে দিলে বেদনা উপশম হয়। কালাজ্বরে জয়ন্তীর শিকড় মাথায় বাঁধলে উপকার হয়। নারী ঋতুবতী হলে প্রথম তিনদিন জয়ন্তী পাতা বেটে পুরোনো গুড়ের সাথে সকালে খেলে গর্ভ নিরোধ হয়। মুর্ছা রোগে আক্রান্ত হলে অপরাজিতার মূল, গাছ ও পাতা থেতো করে ছেঁকে এক চা চামচ আন্দাজ রস রাগীকে খাইয়ে দিলে মুর্ছারোগ ভালো হয়। ভূতোন্মাদ এটা মেয়েদেরই হয়। মূলত কামজ উন্মাদনা হেতু এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই রোগে অপরাজিতার মূলের ছাল ৩-৬ গ্রাম পরিমাণে ঘিয়ের সাথে পিষে দিনে দুইবার আতপচাল ধোয়া জল দিয়ে রোগীকে খেতে দিলে ঐ কামজ উন্মাদনা ভালো হয়।

যে সমস্ত মেয়েরা মৃত সন্তান প্রসব করে বা যারা গর্ভ ধারণ করতে পারে না তারা ১৪/১৫ গ্রাম অশোক ছাল ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ২৬/২৭

www.pathagar.com

দিন খেলে উপকার পাওয়া যায়। অশোক বীজ বেটে হলুদের সাথে গায়ে মাখলে চর্মের রুক্ষতা কমে যায়। বিষাক্ত কীটের দংশনে অশোক ছালের ক্বাথ লাগালে দ্রুত উপশম হয়।

কংশুরের বিখ্যাত জণ্ডিস চিকিৎসক হরসিৎ কবিরাজ (৫৮) ইতোমধ্যে লোকচিকিৎসক হিসেবে দেশ-বিদেশে খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন। অসংখ্য জণ্ডিস রোগী তার হাতে আরোগ্য লাভ করে যাচ্ছে। তার চিকিৎসার ধরণই আঁচড়ার শিকড় ও কাঁচা হলুদ পিষে সামান্য আখের গুড় মিশিয়ে বাসি পেটে সেবন করা। এটাই তার শ্রেষ্ঠ পথ্য। তিন দিন পর্যন্ত চলে এসব ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহার। উক্ত গ্রামের অখিল বালা (৪০) অর্শ্ব চিকিৎসায় তেলাকুচ পাতার সাথে দূর্বার আগা বেটে এক কাপ পরিমাণ রস সাতদিন বাসি পেটে খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। এতে রক্তপড়া দ্রুত বন্ধ হয়।

কবিরাজ জঙ্গল ফকির (৫০) জানালেন–'কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে নারিকেলি শাকের পাতা বেটে গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করালে সঙ্গে সঙ্গে পায়খানা হয়ে যায়। বাত-ব্যথায় ধুতরা বা বিষকাঠালি বা বিশল্যকরণীর পাতা খুবই উপকারী। নদীর পাড়ে বা রাস্তাঘাটে এক ধরনের লতা দেখতে পাওয়া যায়, যাকে কৈয়াড়া বলে। ঐ কৈয়াড়ার লতা ব্যথা কমাতে আজও গ্রাম-বাংলায় প্রচুর ব্যবহার হয়। ভাঙ-সিদ্ধির পাতা বেটে প্রলেপ লাগিয়ে ব্যাথা দূর করতে এটা আমরা ব্যবহার করি।'এসব কবিরাজী চিকিৎসা ছাড়াও বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধের নিমিত্তে প্রায় প্রত্যেক পরিবারে খাদ্যাদি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখা যায়।

কবিরাজী চিকিৎসায় তাবিজের স্থানও কম না। রকমারি গাছের মূল, জীব-জন্তুর হাড় ও অন্যান্য দ্রব্য তাবিজে ভরে গলায় বা ডান হাতের বাহুতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর শিশুদের গলায় হরকাঠি রূপার ঠুলিতে লাগিয়ে ঝুলানো হয়। এতে তাদের উপর কোনো কু-দৃষ্টি পড়ে না বলে জনগণের বিশ্বাস।

২. তন্ত্র মন্ত্র ও ওঝার চিকিৎসা

তন্ত্রমন্ত্রের চিকিৎসা লোকচিকিৎসার অন্য আরেকটি পদ্ধতি। এতে কোনো ভেষজ দ্রব্য বা কোনো গাছ-গাছড়া ব্যবহার হতে দেখা যায় না। ঝাড়-ফুঁকুর দিয়ে অসুস্থ্য মানুষকে সুস্থ্য করে তুলতে দেখা যায়। অনিল বালা একজন তান্ত্রিক চিকিৎসক। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় যেসব মন্ত্র ব্যবহার করেন সেগুলোর মধ্যে ব্যথা পাওয়ার মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

নুন থুইয়া লবণ পড়ি
ক্ষীর শব্দ পানি
(অমুকের) বিষ বেদনা কর ক্ষয়।

ভয় পেলে নিম্ন মন্ত্রটি তিনি ব্যবহার করে থাকেন–

কালা কালা ছত্রিশ অন্তে কালা
(অমুকের) জ্বরজ্বারি নিয়ে যাও
দোহাই কালা (৩ বার)।

স্তনের দুধ পড়তে থাকলে দুধ পড়া প্রতিরোধের মন্ত্রটি এরকম–

www.pathagar.com

থুম্বা থুম্বা রসের ঝি
পথে পেয়ে করলে কি
আট আঙুল বেগুনের ডাল কেটে
থুম্বার কপালে মারলেম লাথি।

ছোট শিশুরা হঠাৎ শিউরে উঠলে যে মন্ত্রটি কবিরাজরা ব্যবহার করে সেটি নিম্নরূপ–

আল্লাহ গদাধর
মোহাম্মদের নাম সরা
শঙ্খ চক্র করিয়া সার
(অমুকের) শরীরে নাই কোনো ভয় ডর জ্বর।

এই মন্ত্রটি সুতা হাতে নিয়ে পড়তে দেখা যায়। মন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে ফুঁ দিয়ে সুতায় গিট দিতে থাকে। সেই সুতা রোগীর গলায় পরিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়। রঘুনাথপুর নিবাসী গোপাল কবিরাজ তিনি তান্ত্রিক চিকিৎসা মতে যেসব তন্ত্র-মন্ত্র ব্যবহার করেন সেগুলো নিম্নরূপ :

ধাতুর ব্যথায় ব্যবহৃত মন্ত্রটি তিনি যেভাবে বললেন–

অষ্ট ধাতু অষ্ট পানি
হাড়ের শরীর রোগীর বাতি
(অমুকের) অষ্টধাতু করলাম পানি।

চোখে জল পড়লে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি তিনি ব্যবহার করে থাকেন–

নদীর কূলে আল্লাহপাক
চোখের কণা মা শীতলা
সকল কর পানি
দোহাই মা শীতলা (৩ বার)।

তার ভয় পাওয়া ঝাড়াটি বা মন্ত্রটি নিম্নরূপ–

আল্লাহ সরোয়ার
আজরাইল বরখাস্ত কর
আল্লাহ (অমুকের) অসুখ বরখাস্ত কর (৩ বার)।

লোকচিকিৎসার মধ্যে ওঝাদের সাপে দংশন রোগীর চিকিৎসা এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা বলে পরিচিত। এলাকাটির পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য সাপ জাতীয় সরীসৃপ প্রাণীর জন্য বাসযোগ্য। সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসায় এখানে যে পদ্ধতি বয়ে চলেছে তাতে দেখা গেছে ওঝারা কোনো তন্ত্রমন্ত্র বা গাছ-গাছড়া ব্যবহার করে না। যে স্থানে সাপে দংশন করে সেখানে পান চিবায়ে মুখ দিয়ে বিষ চুষে রোগীদের ভালো করে তোলে। বৃহত্তর ফরিদপুরের বিখ্যাত ওঝা ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলার নিজামকান্দি নিবাসী সুরধনী দেবী। রাধার বরে তিনি এই চিকিৎসায় রত হন বলে তাকে সকলে রাধিকা বলে ডাকতেন। তাকে নিয়ে এমনও কিংবদন্তি শোনা যায় কাউকে সাপে দংশন করলে রাধিকার নাম নিয়ে ডোর দিলে বিষ আর উপরে ওঠে না। এছাড়া এলাকায় আরও অনেক ওঝা আছেন তাদের মধ্যে শানপুকুরিয়ার রবীন বাগচী (৪২), খাটিয়াগড়ের বিবেক বালা (৪৩) উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

হাড়ভাঙা চিকিৎসায় এখানকার কবিরাজরা অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছেন। হাড়ভাঙা কবিরাজদের মধ্যে যারা বিখ্যাত তারা হলেন–কামাল শেখ (৪৫), তিলছড়া কাশিয়ানী, ঠাকুর সিকদার (৫৫), তিলছড়া কাশিয়ানী, জহুর সরদার (৬২), করপাড়া গোপালগঞ্জ। ভাঙা হাড় জোড়া লাগার চিকিৎসার ধরণ এরকম–প্রথমে তারা আড়োসের গাছ, কালা ধূতরার শিকড়, ইলসা গাছের পাতা, খেলানো ঝালের গাছ, বর্নির পাতা, আলাচালের গুঁড়া, কৈ মাছের মাথা লবণ দিয়ে মিশিয়ে মণ্ডা তৈরি করে নেয়। তারপর ঐ মণ্ডা নিয়ে হাড়ভাঙা স্থানে লাগায়। অতপর ন্যাকড়া দিয়ে পেচিয়ে চটার বানা দ্বারা ভালো করে বেঁধে রাখে। ২৪ ঘণ্টা পরে ঐ বাঁধন খুলে দেয়। এতে হাড় জোড়া লাগে। বেশ কয়েকদিন ঐ স্থানে তেল মালিশ করতে বলেন কবিরাজরা। সব ধরনের তেল ব্যবহার করার বিধান দেন না চিকিৎসকেরা। কবিরাজরা সরিষার তেল, এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, পিপল গাছের ফল, তারপিন একত্রে জ্বেলে যে তেল তৈরি করেন কেবলমাত্র সেই তেল ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

অন্য আরেক পদ্ধতিতেও অন্যান্য হাড় ভাঙার কবিরাজরা এর চিকিৎসা করে থাকেন। তা হলো–সদ্য দোহানো দুধের সাথে সড়া গাছের ছাল বা পাতার গুঁড়ি মিশিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে দই তৈরি করে নেয়। ঐ দই হাড় ভাঙা স্থানে লাগিয়ে দেয়। ভেন্নার পাতা বা বটের পাতা দ্বারা ঢেকে চটার তৈরি বানা দিয়ে ভালো করে বেঁধে রাখে। এই ডোরও ২৪ ঘণ্টা পর খুলতে হয়। তারপর ঐ তেল মালিশ করতে দেওয়া হয়। এতেই হাড়ভাঙা রোগী ভালো হয়ে যায়। কোটালীপাড়ার সিতাইকুণ্ড গ্রামনিবাসী সিরাজুল ইসলাম সিপাহী ছিলেন এলাকার খ্যাতনামা চিকিৎসক। তিনি হাড়ভাঙা জোড়া দিতেন তেলপড়া দিয়ে। অন্যদিকে পূর্বপাড়ার ভাগ্যধর বিশ্বাস (শিক্ষক) ও চিত্রাপাড়ার তাসেম ফকির লোক চিকিৎসায় খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁরা গাছ-গাছড়া ব্যবহার করতেন। ফুঁ-ফাঁ দিতেন না।

৩. সিদ্ধপুরুষের বাক্যদান চিকিৎসা

গাছ-গাছড়া, তন্ত্রমন্ত্র চিকিৎসার বাইরে আরোগ্য লাভের আরও একটি পদ্ধতি এখানে বয়ে চলেছে, তা হলো–ফকির, দরবেশ, সাধু-গুরু-বৈষ্ণব বা মহাপুরুষদের বাক্যদান চিকিৎসা। এরা কোনো গাছ-গাছড়া বা তন্ত্রমন্ত্র ব্যবহার করেন না। তাদের মুখের কথায় অনেক রোগী ভালো হয়ে গেছে বলে এলাকায় জনশ্রুতি আছে। হরিচাঁদ ঠাকুর, গনেশ পাগল, পরশউল্লাহ ফকির ও হাজার চাঁদ ফকিরকে নিয়ে এ ধরনের লোকচিকিৎসার অসংখ্য কিংবদন্তি আছে। বর্তমানে সানপুকুরিয়ার মরু ঠাকুর (৮২) ও আন্ধারকোঠার হরি ঠাকুর (৫০) এই ধরনের বাক্যদান চিকিৎসা করে থাকেন।

তাই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধারার লোকচিকিৎসা গ্রাম বাংলায় বয়ে চলেছে। আধুনিক যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভাবনীয় সফলতা বয়ে আনার পরও লোকচিকিৎসা বিলিন হয়ে যায়নি। এই চিকিৎসায় কোনো না কোনোভাবে সফলতা বয়ে আনে বিধায় সেই আদিকাল থেকে শুরু করে আজও সমাজে শক্ত ভীত আঁকড়ে আছে।

www.pathagar.com

ধাঁধা

গুঢ় রহস্যাবৃত বিবৃতি হচ্ছে ধাঁধা। এর জটিল প্যাচ ভাঙতে অনেকের হিমশিম খেতে হয়। গৎ, ধাঁধা, প্রবাদ এগুলোর ব্যবহারের জন্য কোনো অনুষ্ঠানসূচির প্রয়োজন হয় না। পরিস্থিতিই বলে দেয় কখন কোন বাক্য প্রয়োগ করতে হবে। তার মধ্যে ধাঁধাকে একটু ভিন্নভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। একজন আরেকজনকে ঠকানোর প্রতিযোগিতায় ধাঁধা একটি অসাধারণ লোকগাথা। গোপালগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত তেমন কিছু আঞ্চলিক ধাঁধা উল্লেখ করা হলো :

১। কাসুন্দের সুন্দ বাদে
পাঠার বাদে পাঁ
বঙ্গের বঙ্গ বাদে
কিনে আনবে তা।
উওর : কাঁঠাল

২। আছড়ালে ভাঙে না
টপির ভর সয় না।
উত্তর : ভাত।

৩। পিছনে বেটি সামনে বেটা
বল দেখি কিগো সেটা।
উত্তর : দাঁড়িওয়ালা ছাগল।

৪। এক ফোটা মিঠে
ঘরে ভরে ছিটে।
উত্তর : আগুন।

৫। হাটে আর চাটে।
উত্তর : শামুক

৬। উনি জুনি তারা তিন বুনি
মাতায় বোঝা গুদি খোচা।
উত্তর : উনুন।

৭। বমি করে রেখে যায় বল দেখি কারা
সেই বমি পান করে সব মানুষেরা।
উত্তর : মৌমাছি ও মধু।

৮। হিজল গাছে বিলৈ নাচে

www.pathagar.com

আরো ক'লি আরো নাচে।
উত্তর : জিহ্বা দ্বারা ভ্যাঙান।

৯। ফকির উপর ফাঁকি
চড় থেকে খেমচু গেলে
কত থাকে বাকি।
উত্তর : ৫-২ = ৩।

১০। উতরেত্তিয়া আলো মাগী দুই সারির তার মাই
বছরে বছরে বিয় মাগী দুধের পত্তেশ নাই।
উত্তর : মাদী কুকুর।

১১। চামড়ার তলে হাড়
হাড়ের তলে মাংস
কওতো মামা কংস।
উত্তর : নারিকেল।

১২। লম্বা বেটা ভুরি ভুরি
মাথায় তাদের ফুলের ঝুড়ি।
উত্তর : শাপলা।

১৩। ভূই ধলা বেছন কালা
মুখ থা'য়ে তো ক'য়ে ফেলা।
উত্তর : বই।

১৪। সব দেশে কাঠের নাও
চিৎ করে বায়
আমার দেশে মাটির নাও
উপুর করে বায়।
উত্তর : হাড়ি সওয়ার।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবৃতি নিয়ে গঠিত। অল্প কথায় বেশি তাৎপর্য জড়িয়ে থাকে এক একটি প্রবাদ প্রবচনে। অভিজ্ঞতার আলোকে ও বাস্তবতার নিরিখে সহসা মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে একটি চমৎকার ক্ষুদ্র বর্ণনা। অনেক সাধারণ লোকের মুখ থেকে এভাবে অনেক অসাধারণ উক্তি বিভিন্ন কারণে বেরিয়ে পড়ে। যাকে প্রবাদ প্রবচন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তেমন কিছু প্রবাদ প্রবচন উল্লেখ করা হলো যেগুলো একজন আরেকজনকে তিরস্কারে, উপহাসে, প্রশংসায়, উপমায় ব্যবহার করে থাকে।

১. হরি নাম যে বড় মধুর রে
গাড় মারছে ঐ বোতিয়াল ছ্যাদাড়ে।

২. যার বিয়া তার খবর নাই
পাড়া পড়শির ঘুম নাই।

৩. কিবা জ্যেষ্ঠ কিবা কনিষ্ঠ
যে বোঝে সেই তো শ্রেষ্ঠ।

৪. পানের স্বাদ চুনে
ভাতের স্বাদ নুনে।

৫. গাছের শোভা ফুলে
মানুষের শোভা চুলে।

৬. দেশ দেইহ্যা ব্যাশ (বেশ)
পাথার দেইহ্যা চাষ।

৭. কালা ধলার একই গুণ
গেলো আমার সোয়া সের নুন।

৮. বড় বড় মহারথি
তারা পায় না এক রতি
বাঙ্গারাম আইছে
আচিয়া ঘুরোতি ঘুরোতি।

৯. খালি প্যাটে পেয়ারা ভরা প্যাটে আখ
যার যত মনে লয় সে তত খাক।

১০. ধান পালায়
তিল ছালায়।

১১. পান খাইয়া না খায় চুন
তাতে হয় শালসার গুণ।

www.pathagar.com

১২. দুই দিনের বোরোগী
ভাতরে কয় অন্ন।
১৩. কচি পাঁঠা বুড়ো মেষ
দুধের অগ্র ঘোলের শেষ।
১৪. বাওনের ষোলো মন্তোর
পাঁঠার এক কান ঝাড়া।
১৫. যারে দেহি না ধ্যানে
তারে দেহি ক্যান বেহানে।
১৬. যে মুলটা বাড়ে ক্ষ্যাতে
বোঝা যায় তা দু-এক পাতে।
১৭. বৌ হলে বোঝে
কচু হলে সেঝে।
১৮. মানুষ মরে ম্যালে
শুয়র মরে ত্যালে।
১৯. হাগিয়া খায় খাইয়া মোতে
তারে নিতে যমে কোঁতে।
২০. নতুন নতুন দিন দুই
চিতই পিঠা খান দুই।
২১. মরব বলে করব না
বাঁচালি খাব কি?
২২. বোরোগী মাছ খাও?
আউ ছিঃ পাই কোথা?
২৩. সবলের বাহুবল
দুর্বলের হরিবল।
২৪. হাতের ছিলুম হাতে রলো
তামাক খাইয়া কোন জন গেলো।
২৫. নিজে যেমনি ঢেমনি
পাড়ার লোকও তেমনি।
২৬. নাও কেনবা ডালি দেইহ্যা
বিয়া করবা শালি দেইহ্যা।
২৭. খাইয়া টাইয়া কামাই
মাইয়া বাঁচলি জামাই।
২৮. ভিজা মাটি যেহানে
কেঁচুয়া ওঠে সেহানে।
২৯. ক্ষুধ কুড়ুয়া দিয়া ভল্লাম প্যাট

www.pathagar.com

ভরুক আমার নাইয়্যারের ক্ষ্যাত।

৩০. তিন বার চিটা ছয় বার ছিটা
তাতে হয় তামাক মিঠা।

৩১. সর্ষে ভালো ফুলে
মেয়ে ভালো-শুলে।

৩২. যদি থায়ে কপালে
বইয়া আনে গোপালে।

৩৩. আমার প্যাটের ছাও
আমারে খাবার চাও।

৩৪. উনো ভাতে দুনো বল
ভরা প্যাটে রসাতল।

৩৫. চোরা না বাঁধিয়া আচোরা বাঁধে
চোরা নাচে সবার মাঝে।

৩৬. যার মা'র ঘরে নাই কাঁথা
তার বড় বড় কথা।

৩৭. কাজেতে ওড়া মোড়া ভোজনেতে গাড়ি
যদি কিছু না কও থায়ি তোমার বাড়ি।

৩৮. যদি থায়ে আগে পাছে
কি করবে শাকে ভাতে।

৩৯. ভাদ্দোরের কুড়ি
জল হয় বুড়ি।

৪০. ধীরে রান্দে সুস্থ্যে খায়
জুড়লে তার আস্বাদ পায়।

৪১. এক হাত বামন
বারো হাত আমন।

৪২. আপন হতে পর ভালো
পর হতে জঙ্গল ভালো।

৪৩. আমি অ'রি জাতির ভয়
মুচি বলে হারিয়া যাই।

৪৪. শনির সাত জঙ্গলের তিন
বাকি সব দিন দিন।

৪৫. মাস ফেত্তম মাসের শেষ
কেউ যায় না কেরুদ্দেশ।

৪৬. যদি আল্লাহ বাঁচায়
কদু নেব মাচায়।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

১. পুণ্যস্নান

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার একটি প্রসিদ্ধ নদীবন্দর হলো রাধাগঞ্জ। বন্দরটি ঘাঘর নদীর বাবুর খাল নামক (বর্তমান সৈন্ধ) স্থানে অবস্থিত। এর অপর পাড়ে প্রসিদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তিত্বের আশ্রম। যিনি শুক গোসাঁই নামে সুপরিচিত। তাঁর আশ্রমটি গড়ে উঠেছে নদীর পাড় ঘেঁষেই। আনুমানিক ৯০ বছর যাবৎ এখানে তাঁর স্মরণে পৌষ মাসের শেষ দিনে একটি পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়। দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা তার ভক্তবৃন্দ এই পুণ্যস্নানে জড়ো হয়। তারা এই মহান ব্রহ্মচার্য্যের সান্নিধ্যে ও আশীর্বাদ কামনার পাশাপাশি পরস্পরের মধ্যে প্রেমের সেতুবন্ধনের উপলক্ষে এদিনটিতে সমবেত হয়। এ ছাড়া চৈত্র মাসে ব্রহ্মপুত্র নদে যে সনাতন তীর্থস্থান অনুষ্ঠিত হয় সেই উপলক্ষে আশ্রমে আরও একটি পুণ্যস্নানের আয়োজন করা হয়। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্রহ্মপুত্রের তীর্থ স্থানের দূরত্বের কথা বিবেচনায় রেখে বিকল্প এই স্নানের আনুষ্ঠানিকতা। শুক গোসাঁই এই পরিকল্পনার অনুমতি দিয়েছেন। এই স্নান উপলক্ষে আশ্রমে মেলা বসে। প্রচুর জনসমাগমে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে এলাকাটি।

২. পেত্নী ছাড়ানো

গ্রাম বাংলায় এখনও পেত্নী নামক অ-শরীরী একটা কল্পিত বস্তু নর-নারীর দেহে আবিষ্ট হয় বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস। সাধারণত দশ থেকে বাইশ বছরের মেয়েরাই বেশি আক্রান্ত হয় এই রোগে। এতে সে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। কোনো শাসন-বারণ মানে না। মানুষ মনে করে কোনো পেত্নী বা অশরীরী তার শরীরে ভর করেছে। তখন লোকে বলে ওকে পেত্নীতে ধরেছে। পেত্নী সাধারণত কাঁচা মাংস খায়, তাই তাকেও ঐসব খেতে দেওয়া হয়। কবিরাজ ডেকে এনে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়। কবিরাজ এসে চালায় তার কবিরাজি। ঝাটা, পিছা, জুতা, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা করে অত্যাচার। কিন্তু তারা চিন্তা করে না যে এটা Sextual বিক্ষেপও হতে পারে। প্রসঙ্গত বলতে হবে, আমি (কৃষ্ণপদ সরকার) একবার শুনলাম যে আমার এক বন্ধুর স্ত্রীকে পেত্নীতে ধরেছে। খবর পেয়ে কর্তব্য পালনে সেখানে যাই। মেয়েটি তখন দশম শ্রেণির ছাত্রী। আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম, সেও বসে আছে। জানলাম বন্ধুটি বাড়িতে নেই। কি সমস্যা! আমি তার দিকে বার বার তাকালাম। সেও আমার দিকে তাকায়, কিন্তু কথা বলে না। আমিও বলি না। বেশকিছু সময় পরে সে আমাকে চিনল এবং বলল বস। দেখলাম তার চোখ দুটো লাল, যেন জবাফুল। রক্ত ঝরে পড়ে পড়ে। অবাক হলাম একি! ধীরে ধীরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম শারীরিক কোনো সমস্যা? সে মিষ্টি করে হেসে দিল। সে এমনভাবে হাসিটা দিল যাতে আমার বুঝতে ভুল না হয়। বুঝে নিলাম অবশ্যই Sextual বিক্ষেপ। একটু পরেই সে আবার অস্বাভাবিক হয়ে পড়ল। এখন যেন সে আমাকে আর চিনতে পারছে না।

www.pathagar.com

এরকম অবস্থা দেখলেই গ্রামবাংলার মানুষ মনে করে পেত্নী বা কোনো অশরীরীর কিছু আবিষ্ট হয়েছে। ডেকে আনে কাবিরাজ। আরম্ভ করে অমানবিক নির্যাতন। প্রথমে সে উঠানে চারকোণা বর্গাকৃতি করে একটা খোট আঁকে। খোটের পাশে কবিরাজ একটা লাঠি নিয়ে বসে। খোটের পাশে রাখা হয় ভালো তেলের প্রদীপ ও ধূপপাত্র। মাঝে মাঝে কবিরাজ বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করে আর লাঠি দিয়ে খোটের মধ্যে বাড়ি মারে। বলে আয় আয় খোটে আয়, দেখা যায় মেয়েটা ধীরে ধীরে হেঁটে আসে খোটের কাছে। কবিরাজ বলে বয়-বয়, বসেও মেয়েটি। কবিরাজ জিজ্ঞাসা করে, এ-তুই থাকিস কোথায়? কেন এলি? মেয়েটি জবাব দেয় ঐ গ্রামের শড়া গাছে। ও আমার বন্ধু তাই আমি আসি। আজ হতে চলে যাবি। যাব না। অমনি লাগায় বাড়ি। ঝাটা, পিছা, ছেড়াজুতা ইত্যাদি দিয়ে মারধর করা হয় তাকে। অনেক সময় গরুর মাথা তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কাঁচা মাংস, মাছ খেতে হয় তাকে। উপায়ান্তর না পেয়ে মেয়েটি কবিরাজের কথা মতো সবই করে। আর চোখের পানিও পড়তে দেখা গেছে। মেয়েটিকে বলে এখন ঐ গুলো নিয়ে চলে যা। মেয়েটি তাই করে। দূরে গিয়ে সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে। পরে ঐ কবিরাজ কেরামতি করে বলে পেত্নী চলে গেছে। দেও দেও পাওনা বুঝে দেও। বিদায় হই। দেখা গেছে ঐ মেয়েটি পুনঃ পুনঃ জ্ঞান হারাচ্ছে। আমার বন্ধুর স্ত্রীকে কিন্তু কোনো কবিরাজ না দেখায়েই ভালো হয়ে গেছে। এই হলো পেত্নী ছাড়ানোর ইতিকথা।

৩. ভাই ভাতের ব্রত

এই ব্রতটি কোনো ঋতুভিত্তিক নয়। নেই কোনো নির্ধারিত সময়ও। ব্রতটি শুরু হয়েছিল নব্বই দশকের প্রথম দিকে। সারা এলাকায় ব্রতটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কী সধবা কী বিধবা কিছুদিন পূর্বেও তারা যথারীতি ব্রতটি পালন করত। 'ভাই ভাত' ব্রতটি হচ্ছে ভাইয়ের বাড়ি যেয়ে ভাত খাওয়া। শুধু ভাত খেলে চলবে না। কোনো মতে সেদিন ভাইয়ের বাড়িতে রাত যাপন করা যাবে না। ভাত খেয়ে দিনের মধ্যেই স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসতে হবে। এমনকি পথে কোথাও দেরি করলে এই ব্রত পালনে বিঘ্ন ঘটবে। ব্রতটি পালন করলে ভাইয়ের সংসারের আয় উন্নতি বৃদ্ধি পায়, দুঃখ থাকে না। ভাই বোনের সম্পর্ক কোনোদিন নষ্ট হয় না। এতে স্বামীর পরিবারেও মঙ্গল হয়। এখন এই ব্রত পালন করতে দেখা যায় না।

৪. ভাগ্নে ভোজন

ভাগ্নে ভোজনের মাধ্যমে আত্মীয়দের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশনা ফুটে ওঠে। দেবতার সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে ভক্তরা যেরকম শ্রদ্ধা নিবেদন করে ঠিক তেমনি ভাবে ভাগ্নেদেরকে ভোজন করাতে দেখা যায়। এতে কোনো ঋতু বা সময় নির্ধারণ থাকে না। তবে শারদীয়া দুর্গোৎসবের মধ্যে এই অনুষ্ঠান হতে দেখা যায় বেশি। গোপালগঞ্জের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি স্থানে এই অনুষ্ঠান পালনের রেওয়াজ আছে। যেমন–শেওড়াবাড়ি, টুঠামান্দ্রা, পাটিকেলবাড়ি, বড় ডোমরাশুর তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠান পালনকারী একজন গৃহকর্তা সমীর হালদার (৫০) এ বিষয়ে যা বললেন–'ভাগ্নেদের ভক্তি সহকারে খাবার পরিবেশন করলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়।

www.pathagar.com

এলাকায় এ বিষয়ে একটি প্রবাদও আছে। তাহলো–'দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন দিলে যে পুণ্য লাভ হয় একজন ভাগ্নে ভোজন করালে সেই পুণ্য লাভ করা যায়। আমরা সাধারণত শারদীয়া দুর্গোৎসবে এই ভাগ্নে ভোজন অনুষ্ঠান পালন করে থাকি। ভাগ্নেদের স্নান করায়ে পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের সামনে নৈবেদ্য সদৃশ সুস্বাদু খাবার রেখে ধূপ-দীপ জেলে গলায় বস্ত্র নিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে প্রণাম করতে হয়। তারপর ভাগ্নেরা খেতে শুরু করবে। এমনকি জলের গ্লাস পর্যন্ত তাদেরকে ধরতে দেওয়া হয় না। জলপান করিয়ে দিই। ভোজন শেষে তাদেরকে ভোজন দক্ষিণা দিতে হয়। এ হলো ভাগ্নে ভোজন।' এলাকা পরিদর্শন করে দেখা গেছে এই ভাগ্নে ভোজন আগের মতো হয় না। স্থানীয় জনগণ বললেন গ্রামে আধুনিকতার বাতাস লাগায় অনেক পুরোনো ঐতিহ্য ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

৫. নষ্টচন্দ্র বা হরিতালিকা

গ্রামের যুবক ছেলেরা ভাদ্রমাসে নষ্টচন্দ্র বা হরিতালিকা লোকাচারটি পালন করে থাকে। মজার ঘটনা হলো যেসব যুবক ছেলেরা এটি উদ্‌যাপন করবে তা অন্য কেউ জানবে না। পাড়ায় পাড়ায় গুপ্তভাবে চলে নষ্টচন্দ্রের ক্রিয়া। মজা করে তারা অন্য পরিবারের অনিষ্ট সাধন করে উপভোগ করে এটি। একে এক ধরনের গুপ্ত বনভোজন বলা যেতে পারে। অন্য গৃহস্থের পালান থেকে যেকোনো তরকারি বা ফল গোপনে অর্ধেক কেটে এনে মজা করে পাক করে খায়। তেমন একজন ব্যক্তি রঞ্জন মজুমদার (৪৭) এ বিষয়ে বললেন–'ধুর। ছোটবেলায় তো মজা করে এ্যা খাইছি। ফল-মুল, তরি-তরকারি ছাড়াও অন্যের হাঁস, মুরগি, খাসি আনছি। একবার এক গেরস্তের খাসি আনতি যাইয়া ঘটালাম এক মজার কাণ্ড। খাসি ভেবে অন্ধকারে ধরে বসলাম কুকুরের হোল (অণ্ডকোষ)। বাপরে কি ঘেউ ঘেউ! জান নৈয়া দৌড়িয়া পলালাম। এরকম অনেক দুষ্টমী করছি এই নষ্টচন্দ্র খাতি যাইয়া। এই বয়সে তা মনে পড়লে এখনও হাসি আসে।'

৬. ল্যাংটার চিনি

জনগণের বিশ্বাস ছোট শিশুরা নিষ্পাপ ও সহজ সরল। তাদেরকে ভালোবাসলে স্রষ্টা খুশি হন। তাই তাদেরকে নিয়ে প্রচলিত আছে নানারকম অনুষ্ঠান। ল্যাংটার চিনি তারমধ্যে অন্যতম। কেউ কোনো বিপদগ্রস্ত হলে এই ল্যাংটার চিনি মানত করে থাকেন। তা ছাড়া অনেক পরিবার আছে কারণে অকারণে মাঝে মধ্যে এই ল্যাংটার চিনির আয়োজন করে থাকেন। 'এ অনুষ্ঠানের আয়োজন খুব সহজ। চিনি, ফুল, পাতা, ধূপ-দীপ ও একঘট জল। এটি সাধারণত উঠানে করতে হয়। তাও ঠিক সন্ধ্যায়। উঠানের কিছু অংশ লেপে মুছে পরিষ্কার করে নিতে হয়। সবকিছু সাজায়ে শুরু করা হয় এই ল্যাংটার চিনির অনুষ্ঠান। বাড়ির ল্যাংটা শিশুদের নিমন্ত্রণ করে জড়ো করা হয় সেখানে। তাদেরকে স্রষ্টার নামে নাচতে গাইতে অনুরোধ করা হয়। তারা যে যার মতো করে নাচ গান করে। এতে কোনো বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কিছু সময় এভাবে চলার পর 'ল্যাংটা প্রীতে হরিধ্বনি বল মন হরি বল' বলে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।' এই ল্যাংটার চিনির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্নেহ, ভালোবাসা গভীরভাবে ফুটে ওঠার শিক্ষা আছে।

www.pathagar.com

৭. ওজনের চিনি

দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দেহের ওজনের সমপরিমাণ মানতকৃত মিষ্টিদ্রব্য ধর্মীয় রীতিতে পরিশোধ করার প্রক্রিয়া হলো ওজনের চিনির বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করেন এমন একজন ব্যক্তি সুমন্ত দাস (৬১) ওজনের চিনির এরকম ব্যাখ্যা করলেন–'যারা বিপদগ্রস্ত হন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ওজনের চিনি মানত করে থাকে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়াও তার আপনজনেরা এ ধরনের মানত করতে পারেন। হরিসভা কিংবা অন্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিপদগ্রস্তরা দায়মুক্ত হয়। তবে ওজনের চিনি নামেও তা অনুষ্ঠিত হতে পারে। যত সময় অনুষ্ঠান চলবে ততক্ষণ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উপস্থিত থাকতে হবে। এমনকি তিনি অনুষ্ঠানে দাঁড়ায়ে আত্ম বিনয়ের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে যোগদানরত সকলের প্রতি বিনম্র বচনে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকেন। সভার পক্ষ থেকে একজন তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। অনুষ্ঠানে যোগদানকারী গায়করা বিভিন্ন ধরনের ভক্তিমূলক গান পরিবেশনের মাধ্যমে উক্ত মিষ্টিদ্রব্য সকলকে বণ্টন করে দেন।'

৮. শিরলি

চৈত্র-বৈশাখ মাসে বোরো ধানকে শিলাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষাকারী তান্ত্রিক ব্যক্তিত্বকে শিরলি বলে। বোরো ধান রক্ষা করার জন্য প্রায় প্রতিটি এলাকায় বিভিন্ন শর্তে একজন শিরলি নিয়োগ করতেন। শিরলিকে একধরনের গুনিন বলা যেতে পারে। শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধ করার জন্য শিরলিরা সাধারণত পশুশৃঙ্গ ব্যবহার করতেন। মহিষ শৃঙ্গ তার মধ্যে অন্যতম। শিলাবৃষ্টি শুরু হলে শিরলি তখন ঐ পশুশৃঙ্গে ফুঁ দিয়ে শিল পড়া ঠেকাতেন। এমনও কিংবদন্তি আছে শিরলিরা পশুশৃঙ্গের মাধ্যমে শিলপড়া প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলে তারা জমিনের আইলে চিৎ হয়ে শুয়ে শিল পড়া রোধ করতেন। এখন এই পদ্ধতি প্রায় দেখা যায় না। যেসব এলাকায় এই পদ্ধতিটা বেশি রকম প্রচলিত ছিল তারমধ্যে হাটবাড়িয়া, মোল্লাকান্দি, নিজামকান্দি উল্লেখযোগ্য। তবে এই শিল পড়া ঠেকানোর জন্য আজও কোনো কোনো অঞ্চলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা মহোৎসব করার রীতি নীতি আছে। এই শিলাবৃষ্টি রোধ করা নিয়ে নিজড়া গ্রামের একজন গৃহস্বামী সন্তোষ মণ্ডল (৬৪) যা ব্যাখ্যা করলেন–'প্রতিবছর আষাঢ় মাসের প্রথম বুধবার নিজড়া বালা বাড়িতে কবি রসরাজ শ্রীমৎ তারক চন্দ্র সরকারের স্মৃতিচারণে জাঁকজমক সহকারে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মূলত শিলাবৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। যেদিন থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে সেদিন থেকে এতদঞ্চলে আর বোরো ফসল মৌসুমে শিলাবৃষ্টি হয় না।' এই অনুষ্ঠানের ধরন জানতে চাইলে গ্রামের আরেক ব্যক্তি অবতীর্ণ বালা এভাবে ব্যাখ্যা দিলেন–'আমাদের পূর্ব পুরুষেরা শিলাবৃষ্টির হাত থেকে বোর-ইরি ধানকে রক্ষা করার জন্য এই মহোৎসবের সূত্রপাত করেন। শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত গ্রন্থের রচয়িতা কবি রসরাজ শ্রীমৎ তারেকচন্দ্র সরকারের স্মরণে একটি ত্রিভুজাকৃতির লাল নিশান পুতে রাখা হয়। সেই থেকে ওই প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা এলাকাবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।'

www.pathagar.com

৯. পাঁঠাবলি

পাঁঠাবলি হচ্ছে শাক্ত ভক্তদের কালীপূজাতে পাশবিক প্রবৃত্তি নিবৃতি করার একটা প্রতীকী ব্যবস্থা। পাঁঠাকে কামুক পশু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কালীপূজায় উক্ত পশুকে বধ করলে কাম রিপু দমন হয় বলে মূর্তি পূজায় বিশ্বাসভাজনদের বিশ্বাস। মূর্তি পূজার অনুষ্ঠানে হাড়িকাঠার মধ্যে পাঁঠার মস্তক ঢুকায়ে বড় রাম দা দ্বারা এক কোঁপে শিরশ্ছেদ করে বলিদান করতে দেখা যায়। অবশ্য কালীপূজা ছাড়াও দুর্গাপূজায়, চণ্ডীপূজায় এই বলি দান পদ্ধতি থাকলেও আগের তুলনায় অনেক কম। পূজার সময় মূর্তির সামনে যেসব পশু বলি দেওয়া হয় তার করুণ আওয়াজ ও রুধির ধারা দেখে চারণ কবি রাজেন্দ্রনাথ সরকার ব্যথিত হয়ে নিম্নবর্ণিত গানটি রচনা করেন :

'বৃথা শক্তি পূজায় পশু বলি আমাদের দেশে
যদি মহিষ বলি (মা) কালী খায়
গরু খায় না কোন কথায়?
ভাব একবার একতায় বসে'
যদি মুসলমানের কাছে
হিন্দুরা গরু বেচে
কোরবানিতে করলে খুন
মহাপাপ হয় সেই দরুণ
স্মৃতি শাস্ত্রে লেখা তার দোষ গুণ।
তাইতো হিন্দুগণকে ডেকে বলি
পূজায় দিতে গরু বলি
বেঁচে থাকুক মহিষগুলি
তাতে কাজ কর্মে (মহিষ) পাবে দ্বিগুণ।

সুর-সুধাকর রাজেন্দ্রনাথ সরকারের গানে কৌলিন্যরাও মোহিত হতেন। তবে লৌকিকতায় তারা রাজেন্দ্রনাথকে সৌজন্য দেখাতো না। পূজায় পশু বলির মতো অন্যান্য সামাজিক বৈষম্যেরও প্রতিবাদ করতেন। সেই প্রতিবাদ কথা দিয়ে নয়, সুর ও ছন্দের মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।
যেমন–

মদের নেশায় বদের আশায়
ব্রাহ্মণে খায় বেশ্যাবাড়ির ভাত;
তাতে হয় না জাতি পাত
বেশ্যালয় কি ঠাকুর জগন্নাথ?
নটির হুক্কায় তামাক খেলে
হুক্কার জল মরে নমঃ ছুলে
এসব ব্রাহ্মণে না প্রণাম দিয়ে
নটির পদে কোটি প্রনিপাত।
মদের নেশায় বদের আশায়
ব্রাহ্মণে খায় বেশ্যাবাড়ির ভাত।

www.pathagar.com

১০. ব্যবারী বুড়ি

যে বুড়িকে ব্যবহার করা হয় তাকে ব্যবারী বুড়ি বলে। বিয়ের পরে নব বধূ যখন শ্বশুর বাড়ি যায় তখন শ্বশুর বাড়ির পরিবেশ সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লাগে। নতুন বৌ কাকে কী বলবে কী করবে এ নিয়ে তাকে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। এজন্য প্রাথমিকভাবে তার একজন সহায়িকা দরকার। সেই সহায়িকা হচ্ছে ব্যবারী বুড়ি। গ্রাম বাংলায় এই ব্যবারী বুড়ির প্রচলন আগের মতোই আছে। সম্পর্কের দিক থেকে ব্যবারী বুড়িকে হতে হবে ভাবি, দাদি, নানি বা তৎসমতুল্য অন্য কেউ। যাকে সে অতি সহজে তার সমস্যার কথা বলতে পারে। স্বামী সহবাসজনিত কোনো সমস্যাও যাতে দ্বিধাহীনভাবে খুলে বলতে পারে। নবদম্পতি কেমন আছে তা জানতে কনের বাড়ি থেকে তিন দিনের দিন বরের বাড়ি লোক যায়। একে মেলানি বলে। মেলানিতে মাছ বাতাসা নিয়ে যাওয়ার প্রথাও আগের মতো আছে। দশদিন পরে বর কনেকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে যায়। এমনও জনশ্রুতি আছে যে, কনের মা যদি ভোর বেলায় দেখতে পায় যে মেয়ের মাথার চুল এলোমেলো তবে তিনি খুব খুশি হন। ভাবে কন্যাকে বর সোহাগ করেছে।

১১. রাখাল পোড়া

ভারতীয় উপমহাদেশের কৃষি কাঠামো মূলত পশুর কর্মের উপর ভর করে গড়ে উঠেছে। গরু, মহিষ তারমধ্যে অন্যতম। দক্ষিণ বাংলার বিশেষ করে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নড়াইল–এই সমস্ত জেলায় মহিষ তেমন একটা দেখা যায় না। গো পালনকারী পরিবারের সংখ্যা বেশি। ট্রাক্টর আসার আগে হালচাষ ভিন্ন জমি আবাদ করার অন্য কোনো গত্যান্তর ছিল না। হালচাষ করতে গরু, ঘোড়া ও মহিষ এই তিনটি পশু ব্যবহার হয়। গোয়াল ঘরে গরু না থাকলে কৃষক পরিবারগুলোকে কেমন যেন শ্রীহীন মনে হতো। তখন প্রত্যেক পরিবারে একজন করে গরু চারণকারী থাকত। যাদেরকে বলা হয় রাখাল। বিভিন্ন শর্তে রাখাল বালকেরা গৃহস্থদের গরু চরাত। কেউ মাসিক বেতনে আবার কেউ পেটে ভাতে। রাখাল বালকেরা সকালবেলা সারি বেঁধে গরুর পাল নিয়ে ছুটতো গরু চরাতে। তাদের কোমরে গামছা বাঁধা থাকত । হাতে থাকত একটি লাঠি যাকে নড়ি বলা হয়। এই নড়ি হলো গরু শাসনের হাতিয়ার। রাখাল বালকেরা গরু চরাতে বিভিন্ন ধরনের শব্দ উচ্চারণ করত। যেমন–ট্রিথায়, ঢাঢা, ভুম, ভ্রুম, ঢি ইত্যাদি। আরো কিছু শব্দ আছে যেগুলোর উচ্চারণ লিখে প্রকাশ করা যায় না। তারা বিভিন্ন ধরনের খেলাও খেলতো যেমন গোবর্ধন, পুথিবাড়ি ইত্যাদি। সবচেয়ে তারা বেশি আনন্দ উপভোগ করত নাড়ার আগুনে ফসল পোড়ায়ে খেতে। বৃত্তাকারে বসে তারা ঐ পোড়ানো ফসল খেত। একেই বলে রাখাল পোড়া। রাস্তা ঘাটে এমন কিছু বন্য ফল ফলতো যাদের নাম ছিল অজানা। রাখাল বালকেরা সেসব ফল আনন্দ করে খেত বলে ফলগুলোর নামকরণ হয়েছে রাখাল ফল। রাখাল বালকদের সেই স্বর্ণ যুগ আর নেই। আধুনিক চাষাবাদ এসে এই সংস্কৃতি প্রায় বিলুপ্ত। তেমন একজন গৃহস্বামী আলমগীর ফকির (৫০) অতীত দিন সম্পর্কে বললেন, 'আগে দেশে অভাব ছিল তবে অভাবের সাথে শান্তিও ছিল। এখন অভাব নাই শান্তিও নাই। লক্ষ করে দেখা গেছে ট্রাক্টর চাষের জমিতে যে পরিমাণে ফসল ফলে তারচেয়ে বেশি ফসল ফলে হাল চাষওয়ালা জমিতে। কারণ ট্রাক্টরের ফলা মাটির নির্দিষ্ট একটা গভীরতা পর্যন্ত যায়।

www.pathagar.com

কিন্তু লাঙলের ফলা কোথাও বেশি মাটির তালে যায় কোথাও অল্প মাটি ভেদ করে। এতে মাটিতে জো ঠিক থাকে। তাই এতে ফসল ভালো হয়। এখন আগের মতো গরু নাই, রাখাল নাই, চোতের রাতে সেই গল্পও আর শোনা যায় না। আগের সহজ সরল দিন এর থেকে অনেক ভালো ছিল।'

১২. বৃক্ষপূজা ও বৃক্ষ বিবাহ

জল, মাটি ও গাছ এই তিনটি উপাদানের সমন্বয় সাধন ঘটলে পৃথিবী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। স্বস্তি পায়। তন্মধ্যে গাছ সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। গাছ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে, অক্সিজেন দেয়, উত্তপ্ত পৃথিবীতে শীতল ছায়া দান করে। হাজার হাজার বছর পূর্ব হতে শুরু হয়েছিল বৃক্ষোৎসব। মৎস্য পুরানের ৪৯তম অধ্যায়ে বৃক্ষপূজার বর্ণনা দেওয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি একটি মাত্র বৃক্ষ রোপণ করিবেন, তিনি তিন অযুত কাল ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্যন্ত স্বর্গে অবস্থান করিবেন।' আগের মানুষ বৃক্ষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে দেখে এসেছে। কারণ তখনকার দিনের জীবনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদ ভিত্তিক। কারণ প্রতিটি বৃক্ষ লতাগুল্মের মধ্যে রয়েছে কোনো না কোনো ভেষজ গুণ। তাছাড়া পরিবেশ রক্ষায় বিশাল ভূমিকা তো এর রয়েছেই। বৃক্ষের জীবন আছে এই অনুভূতি পৌরাণিক শাস্ত্রাদিতেও সাক্ষ্য দেয়। মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৪৮ নম্বর শ্লোকে বলা হযেছে, 'ইহারা বহুবিধ অসৎ কর্মফলে আচ্ছন্ন। ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে এবং ইহারা সুখ-দুঃখও অনুভব করিয়াছে।' এই সত্যকে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমাণ করে বিশ্ববাসীকে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। বৃক্ষকে তারা শুধু পূজাই করত না, তাদের মধ্যে বিবাহ প্রথাও প্রতিষ্ঠা করেছিল। সাধারণত বট ও অশ্বত্থ এই দুই বৃক্ষের মধ্যে বিবাহ বিধান স্থাপন করেছিল। এদের মধ্যে বিবাহ সংগঠনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে। দুটি বৃক্ষই আমাদেরকে নানাবিধ ব্যধি থেকে মুক্ত রাখতে অত্যন্ত সহায়ক। বটের বাল্কলের রস রক্তপ্রদর, শ্বেত প্রদর, শুক্র তারল্য ও স্বপ্নদোষ ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে চিহ্নিত। অশ্বত্থের ছাল, মূল ও ফল গর্ভস্থাপন ও বাজীকরণের ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রদ। তা ছাড়া অশ্বত্থ গাছ যতই বড় হয় ততই এর শিকড় শূন্য হতে থাকে। তখন বটই হয় তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। বট তার শত সহস্র শিকড় দিয়ে অশ্বত্থ গাছকে আবদ্ধ করে রাখে। শিকড় শূন্যতার কারণে এই প্রজাতির উপকারী বৃক্ষ যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য বোধ হয় এই ব্যবস্থা। বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যাবে একই সঙ্গে বটগাছ ও অশ্বত্থ গাছ জড়াজড়ি করে বেড়ে উঠে শাখা প্রশাখা মেলে স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় আড়ুয়াকংশুর গ্রামে তেমন একটি বৃক্ষযুগল দেখতে পাওয়া যাবে। বহুপূর্বে গ্রামস্থ কার্তিক মজুমদার ও মনোহর বালা এই বৃক্ষ দম্পতির বিবাহ দিয়েছিলেন। বৃক্ষটির নীচে একটি কালীমন্দির আছে। মুসলমানরাও সাপের ভয়ে মনসাদেবীকে দুধকলা দেওয়ার জন্য এই মন্দিরে সমবেত হন। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন সময়ে উক্ত বৃক্ষদম্পতিকে তেল সিঁদুর দিয়ে পুজে থাকে। এই বৃক্ষকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তিও শোনা যায়। এই বৃক্ষগুলো অনেক গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিও রক্ষা করে। এসব বৃক্ষকে বিভিন্ন কারণহেতু কেউ অত্যাচার করতে সাহস পায় না। এই এলাকাটি কোনো এক সময় গাছের জন্য বিখ্যাত ছিল তার প্রমাণ মেলে বিভিন্ন গ্রামের

www.pathagar.com

নামকরণ থেকে। অনেক গ্রাম আছে গাছের নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন–হিজলবাড়ি, ভেন্নাবাড়ি, নারিকেলবাড়ি, বটবাড়ি, মান্দ্রা, বরইভিটা, কদমবাড়ি, আমতলী, জামতলী ইত্যাদি।

১৩. তুলসী গাছের মাহাত্ম্য

নানাবিধ ভেষজগুণে সমৃদ্ধ তুলসী বৃক্ষ। যা তুলনাহীন তা-ই তুলসী। জীবাণু সংক্রমন প্রতিরোধ করা তুলসীর অন্যতম গুণ। প্রায় বাড়িতে তুলসী গাছের কদর দেখা যায়। অনেকে সকাল সন্ধ্যায় ঘর ও ঘরের আঙিনায় তুলসী জলের ছিটা দিয়ে থাকেন। তুলসী তলায় প্রণাম করারও বিধান আছে। প্রণাম করার অর্থ হলো কিছু সময় তুলসী গাছের সাহচর্যে থাকা। পূজা পার্বণের নৈবেদ্যেও তুলসী পাতা দেওয়া হয়। এর অর্থ দেবতার প্রসাদকে জীবাণুমুক্ত রাখা। ভক্তরা সেই প্রসাদ খেয়ে যাতে রোগাক্রান্ত না হয় সেজন্যই বোধ হয় এই ব্যবস্থা। তাছাড়া মানুষ মারা গেলে মৃতের চোখে, মুখে, নাকে তুলসী পাতা রাখা হয়। এতে মৃতদেহ হতে জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে না। একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও কবিরাজ ক্ষিরোদ পোদ্দার তুলসীর ভেষজগুণ সম্পর্কে যা তুলে ধরলেন–'তুলসী পাতা খেলে হৃদরোগ ভালো হয়। এই পাতার রস লবণ মিশিয়ে দাদে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। হাম বসন্তের গুটি গায়ে ভেসে উঠতে বাধাগ্রস্ত হলে তুলসী পাতা গায়ে মেখে দিলে তাড়াতাড়ি হাম বসন্তের গুটি বেরিয়ে আসে। তুলসী পাতা গুড়া করে নস্যের মতো নাকে টানলে সর্দি ভালো হয়। এর পাতা পুটলি করে নাকে টানলে নাক রোগ ভালো হয়। বোলতা বিছা বা পোকামাকড়ে কামড়ালে তুলসী পাতার রস খুব উপকারী, এতে আমবাত ও ব্লাড সুগারের উপকার হয়। বাচ্চাদের সর্দি কাশিতে তুলসী রস মধু দিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

১৪. কালিভাঙা

কালিভাঙা পার্বণটি কার্তিক সংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠিত হয়। কালিভাঙার অর্থ হলো রান্নাঘর, বাসগৃহ ও আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। কার্তিক সংক্রান্তিতে কেন এই বিধানটি প্রাচীনেরা দিয়েছেন এর তথ্যদাতা বসুদেব বিশ্বাস (৫৮), টুঙ্গীপাড়া, বর্ণনাটি এভাবে দিয়েছেন–'কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে যম পূজা হয়। যম মৃত্যুর দেবতা। যমের বাহন মহিষ। মহিষের রং কালো। কালো শোক বা মলিনতার প্রতীক। মৃত্যুকে আমরা অসুন্দর মনে করি। শরৎ ঋতুর শেষে হেমন্তের আগমনে অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। অনেকে মারাও যায়। আগে কার্তিক মাসে মহামারীর ছিল ভীষণ ভয়। যমকে তুষ্ট করতে পারলে মৃত্যুকে জয় করা যাবে বা অকাল মৃত্যু ঘটবে না। এই কারণে কার্তিক মাসে যম পূজার প্রচলন করা হয়েছিল। বর্ষাভেজা শরীরে শরতের সূর্যরশ্মি বিভিন্ন রোগের উদ্ভব ঘটায়। পিত্তের প্রকোপ তারমধ্যে অন্যতম। আয়ুর্বেদ মতে পিত্ত জ্বর, দাহ, অগ্নিমন্দা, অতিসার, কৃমি, প্লীহা এসব রোগের কারণ। ওল, কালকাসুন্দি, জয়ন্তী, পুদিনা পাতা এই ঋতুতে খাওয়া ভালো বলে প্রাচীনেরা আজও বলে থাকেন। ভেষজগুণ সম্পন্ন এইসব উদ্ভিদ ওইসকল রোগসমূহের উত্তম প্রতিষেধক। আগেকার মানুষ বলতেন, কার্তিক মাস গেলে একটি বছর বাঁচব। এই সময়টা যমের

www.pathagar.com

দক্ষিণ দুয়ার বলেও অনেকের বিশ্বাস। তাই কার্তিক সংক্রান্তিতে কালিভাঙার অর্থ হচ্ছে রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-দুর্দশা ও মরণভীতি দূর করার একটি প্রতীকী ব্যবস্থা। আজকাল অনেকে এই পৌরাণিক আচরণটিকে এড়িয়ে চলেছেন।'

১৫. গোফাগুনা

সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকজসংস্কৃতি সুদূর অতীত থেকে বয়ে এসেছে। গোফাগুনা তারই একটি অনুসর্গ। এটি রাখাল বালকদের একটি ব্রত। তাও আবার সব রাখালদের নয়। গাভী পালনকারী গৃহস্থের গোশালায় রাখাল বালকেরা কিংবা গৃহকর্তারা এটি পালন করে থাকেন। কেন, কবে থেকে এই ব্রত শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া না গেলেও নীলপূজার বালা খিরোদ পোদ্দার-এর কাছ থেকে এরকম জানা যায় যে, 'সত্য যুগে অসুর ও দেবতাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। পরাক্রমশালী অসুরদের সাথে দেবতারা কোনোক্রমে পেরে ওঠে না। বারবার পরাজয়ের পর দেবতারা এর প্রতিকার খুঁজতে লাগলেন। তাদের এই মর্মপীড়ায় গোলকবিহারী হরি দৈব বাণীতে বলেছিলেন এতে তোমরা ভয় পেও না। এ যুদ্ধে বিজয় তোমাদের হবেই। এই অভয়বাণী শুনে দেবতাসকল বুকভরা আশা নিয়ে গোলাকবিহারী নারায়ণের কৃপা পানে চেয়ে থাকেন। পরমেশ্বরের কৃপায় এক অপরূপা জ্যোতির্ময়ী সুন্দরী আবির্ভূতা হন। সেই পরমা সুন্দরী বলেছিলেন, হে দেবতাগণ তোমাদের আর ভয় নেই। তাঁর এই অভয় বাণীতে সকল দেবতা তাদের সর্বশক্তি ঐ জ্যোতির্ময়ীকে দান করলেন। বীরাঙ্গনা বেশে তিনি অসুরদের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই দুর্বৃত্তের সাথে মোটেই পেরে উঠতে পারছিলেন না। তাই সেই পরমাসুন্দরী মহামায়া ক্ষণিকের জন্য গাভীরূপ পরিগ্রহ করে বিশ্রাম করছিলেন। ক্লান্তি দূর করে যখন তিনি গাভীরূপ ত্যাগ করে পুনরায় জ্যোতির্ময়ীরূপ ধারণ করেন তখন গাভী বলেছিলেন হে মহামায়া আমায় ত্যাগ করলেন কেন? আমার এখন কী উপায় হবে? একথা শুনে তিনি বলেছিলেন এই মুহূর্তে তুমি মর্তে গিয়ে আবির্ভূতা হও, ঘরে ঘরে তোমার পূজা হবে। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি তোমার সেই শুভদিন, তার নাম হবে গোফাগুনা। এই প্রেক্ষাপটে আনন্দ-উল্লাসে এলাকায় বিশেষ করে গাভী পালনকারীর গৃহে অনুষ্ঠানটি পালন হয়ে থাকে। এখানে ব্রাহ্মণ বা তন্ত্রমন্ত্রের দরকার হয় না। রাখাল বালকেরা এতে মুখ্যম ভূমিকা পালন করে। দুগ্ধজাত বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবারের আয়োজন থাকে। গাভীস্নান করায়ে গোয়াল ঘরে নিয়ে ধূপ-দীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। সেখানে থাকে এক ঘটি জল। রাখাল বালক ওই জল গাভীর গায়ে ঢেলে দেয়। তারপর নানা প্রকার সুস্বাদু খাবার একত্রিত করে সকলকে বণ্টন করে দেওয়া হয়। প্রতি ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিনে এলাকাবাসী দলে দলে সেই খাবার খেতে গাভী পালনকারীদের ভবনে উপস্থিত হয়।

১৬. দ্বৈতবিয়া

মাতৃত্ব লাভের যোগ্যতার আগে যদি কোনো নারীর বিবাহ হয় এবং সেই যোগ্যতা যদি স্বামীর বাড়িতে দেখা দেয়, তবে তাকে ঘিরে একটি অনুষ্ঠান হয়, একে দোতুব্বিয়া বা

www.pathagar.com

দ্বৈতবিয়া বলে। এই অনুষ্ঠানে সাধারণত গ্রাম্য নারীরা অংশ নিয়ে থাকে। তাকে ঘিরে নাচ গান হয়। কাঁদামাটি করে। এভাবে কিছু সময় চলার পর সবাই মিলে নদীতে স্নান করে পুত পবিত্র হয়ে নববধূকে নতুন কাপড় পরিয়ে দেয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করে নতুন বউকে আশীর্বাদ জানিয়ে এই পর্ব শেষ করে। এখন এই দোতুব্বিয়া বা দ্বৈতবিয়া প্রায়ই দেখা যায় না। কারণ আগের মতো মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয় না। বাল্যবিবাহ জনিত কারণে এই দোতুব্বিয়ার অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়েছে বলে সবার ধারণা।

১৭. তিন তেঁতুলে

লিঙ্গভেদে সন্তান জন্ম সংক্রান্ত বিষয়ে এটি একটি আঞ্চলিক প্রথা। কোনো দম্পতির পর পর তিনটি ছেলে সন্তানের পর একটি কন্যা সন্তান বা পর পর তিনটি কন্যা সন্তানের পর একটি ছেলে সন্তান জন্ম নেওয়াকে বুঝায়। যদি কারুর এই প্রকারের সন্তান জন্ম নেয় তবে তার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বলে জনশ্রুতি আছে। সংসারের আয় উন্নতি বৃদ্ধি পায়। তবে এজন্য কিছু করণ ক্রিয়ার প্রচলন আছে। ওই দম্পতিকে বিশেষ করে বধূকে পার্শ্ববর্তী পরিবারগুলোকে লবণ ও মাছ বিতরণ করতে হয়। লোকাচার পালন করতে কেউ বিমুখ হয় না। সব সময় একটা ভীতি কাজ করে—না জানি এটা পালন না করলে কখন কী বিপদ ঘটে। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত নারী মাছ ও লবণ বিতরণ করে বেড়ায়। এসব কারণে দেখা যায় অনেক লোকাচার অনেকের কাছে বাধ্যতামূলক হয়ে ধরা দেয়। লোকজসংস্কৃতি বিকাশে এই ধরনের বিষয়াদি বিশেষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

১৮. বাটি চালান

বাটি চালান হলো হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরে পাওয়ার একটি পৌরাণিক পদ্ধতি। প্রথমে একটি কাঁসার বাটি নেওয়া হয়। বাটিটা এমন হবে যাতে একজন লোকের হাত বাটির মধ্যে স্থাপন করা যায়। যে লোকটির হাত বাটিতে স্থাপন করানো হয়, তাকে অবশ্যই তুলারাশির লোক হতে হবে। যেদিন হারানো জিনিস পাবার জন্য বাটি চালানোর দিন ধার্য হয় তার আগের দিন সারা গ্রামে বা পাড়ায় অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার জন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তুলারাশির লোকটিকে যথাস্থানে উপস্থিত করে তার সামনে একটি পরিষ্কার কাঁসার বাটি আনা হয়। প্রথমে লোকটি একখানা গামছা বাটির মধ্যে সুন্দরভাবে স্থাপন করে। বাটির মধ্যে ওই গামছার উপরে তার ডান হাত স্থাপন করে নেয়। পরে গণক এসে হাজির হয়। গণকের হাতে থাকে কিছু ইঁদুরের মাটি, অনেক সময় গাছ গাছড়াও ব্যবহার করে। তুলারাশির লোকটির হাতের উপর কিছু মাটি ছাড়ে আর মন্ত্র পাঠ করে। কিছু সময় যেতে না যেতেই বাটিটা নড়তে থাকে। প্রথমে বাটিটা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে। পরে আরম্ভ করে দ্রুত বেগে ছুটতে। হারানো জিনিস যেখানে লুকানো থাকে, সেই পর্যন্ত বাটি গিয়ে থেমে যায়। তুলা রাশির সেই লোকটিরও বাটির সঙ্গে যেতে হয়। কেননা তুলারাশির লোকটি ইচ্ছা করলেই বাটি থেকে হাত তুলতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, যে লোকটি এই জিনিস চুরি করেছে তার পায়ের কাছে গিয়ে বাটি থেমে যায় এবং তাকে চোর বলে সনাক্ত করা হয়। গ্রাম বাংলায় হারানো জিনিস বা চুরি যাওয়া জিনিস ফিরে পেতে এই ধরনের

www.pathagar.com

একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা যায়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই ভাবেই তারা তাদের হারানো বা চুরি হওয়া জিনিস ফিরে পাবে। গ্রাম বাংলায় আজও এই পদ্ধতি চালু আছে। এই হলো বাটি চালান।

১৯. চটা চালান

হারানো জিনিস ফিরে পেতে বা চোর ধরতে আরেকটি অভিনব কৌশল হলো চটা চালান। প্রথমে ৭-৮ ফুট লম্বা দুটো বাঁশের চটা নেওয়া হয়। চটা দুটো অন্তত দেড় ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া থাকে। চটা দু'টির একপ্রান্ত একজনের দুই হাতে বেঁধে দেওয়া হয়। আবার চটা দু'টির দুই প্রান্ত দুইজনে ধরে রাখার প্রচলনও আছে।

প্রথম পদ্ধতিতে গণক চটা দুটোকে মন্ত্রপুত করায় চলতে থাকে। চটা যেদিকে যাবে, লোকটিও সে দিকে যেতে বাধ্য। সারা পাড়া মহল্লায় ঘুরে বেড়ায়। চটা মাঝে মাঝে বাড়ি খেয়ে প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করে। হঠাৎ দেখা যায় কোনো এক লোকের গলা ঐ চটায় চেপে ধরেছে। সে চোর বলে গণ্য হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে চটায় মন্ত্রপুত করার সঙ্গে সঙ্গে চটা দৌড় আরম্ভ করে। চটা বহন কারী দুজনও চটার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে থাকে। এমন এক সময় দেখা যায় ঐ চটা কোনো একজনকে গোপের মতো আটকিয়ে ফেলে এবং তাকেই চোর বলে সনাক্ত করা হয়। এইভাবে চটা চালানোর মাধ্যমে চোর ধরার রেওয়াজ বা পদ্ধতি গ্রাম বাংলায় বহুল প্রচলন আছে।

২০. আয়না তপ্পন

আয়না তপ্পন চোর ধরার আরেক পদ্ধতি। গণকের হাতে স্বচ্ছ একখানা কাচ বা আয়না থাকে, তার উপর তেল ঢেলে বিড়বিড়ি করে তার ভাষায় মন্ত্র পাঠ করে যায়। কিছু সময় পরে গণক চোরের চেহারা কেমন, তার মুখে দাড়ি আছে কিনা, গায়ে রং কি, লম্বা কি বেটে, মাথায় কেমন ধরনের চুল, তার গায়ে কি পরিধান আছে ইত্যাদি বলতে থাকে। তখন গ্রামের মাতব্বররা মন্তব্য করেন কে হতে পারে। এসব পদ্ধতিতে কোনো কোনো সময় মতভেদ দেখা দেয়, সৃষ্টি হয় রেষারেষি। তবুও বিশ্বাসী জনগণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করে যাচ্ছে। আরেক পদ্ধতিতে গণক একখানা স্বচ্ছ আয়না নিয়ে বসে এবং আয়নার উপর সরিষার তেল ঢেলে দেয়। অবশ্য এর আগে সন্দেহভাজন কয়েজনের নাম লিখে গণকের হাতে দেওয়া হয়। গণক মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং লিখিত নামের মধ্যে যেকোনো একজন চোরের অবয়ব ভেসে ওঠে। এভাবে গণক আয়না তপ্পনের মাধ্যমে চোর নির্ণয় করে থাকে।

২১. স্বপ্ন

স্বপ্ন জিনিসটা কি এবিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। তবে অচেতন অবস্থায় মনেন্দ্রিয়ার যে শিল্পকর্ম তাই স্বপ্ন বলে মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে। স্বপ্ন না দেখে কে? সবাই স্বপ্ন দেখে। শরীর অসুস্থ অবস্থায় মানুষ অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখে। আবার কারো কারো কাছে ভবিষ্যতের ইশারা স্বপ্ন হয়ে ধরা দেয় কিংবা মানুষ যা কল্পনা করে তাও স্বপ্নে দেখে। লোকাচারেও স্বপ্ন বেশ জায়গা করে

www.pathagar.com

নিয়েছে। স্বপ্নে সাধারণত আগুন, মৃত ব্যক্তি, হিংস্র পশুর আক্রমণ, রক্ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা গেলে বিপদের পূর্বাভাস বলে তারা সতর্ক হয়ে যায়। আবার স্বপ্নে ফকির, দরবেশ, দেবালয়, মসজিদ, ফুল দেখলে শুভ লক্ষণ বলে সাধারণ মানুষ আশায় বুক বাঁধে।

২২. বার নিয়ে লোকাচার

সাত দিনের মধ্যে শনি ও মঙ্গলবার শুভপ্রদ নয় বলে অনেকের বিশ্বাস। তারা শনিবারটিকে খুব সতর্ক হয়ে অতিবাহিত করে। বিবাহ, ঘর নির্মাণ, বীজবোনা বা কোনো ধরনের শুভ কাজ শনিবারে সম্পাদন করে না। তারা অশুভকে শনি বলে জানে। তবে বুধবারকে ভালো বলে মেনে নিয়েছে। মঙ্গলজনক কোনো কাজ করতে হলে ঐ বুধবারটিকে বেছে নেয়। বার সংক্রান্ত সুবিধাদি বিবাহ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বর কনের অভিভাবকগণ কোনোক্রমেই শনিবারে বিয়ে সম্পাদন করেন না।

২৩. আহ্নিক কৃত্য

পল্লিবাসীরা রাত দিন ২৪ ঘন্টার মধ্যে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা এই তিনটি সময়ে বিশেষ বিশেষ কৃত্য পালন করে থাকে। প্রত্যেকে যে যার ইষ্ট মন্ত্র জপ করে গাত্রোত্থান করে। ফজরের আজানের মাধ্যমে দিবসের সূচনা ঘটে। হিন্দু বাড়িগুলোতে বৈষ্ণবরা কৃষ্ণ নামের টহল দিতে থাকে। ঘুম থেকে উঠে অনেকে সূর্যকে প্রণাম জানায়। বাড়ির আশে পাশে কুলবধূরা গোবর ছড়া দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। পরিষ্কারজনিত কাজগুলোকে তারা বাসি কাজ বলে থাকে। ভরা দুপুরের মুহূর্তটা সবাই সতর্ক হয়ে কাটায়। এই ক্ষণে অনেক অপদেবতা চলাফেরা করে বলে অনেকের বিশ্বাস। অসাবধান হলে সেসব অশরীরী অপদেবতাদের কোপদৃষ্টি পড়তে পারে বলে তাদের ধারণা। নারীদের ক্ষেত্রে এই বাধা নিষেধ বেশি প্রযোজ্য। তেমন একজন নারী রেণু রাণী (৪২) যা বললেন–'লোহা হলো ভূত-পেত্নীর ভাশুর। লোহা কাছে থাকলে ওরা ধারে কাছে আসতি পারে না। দুফরে ও সোন্দিয়ায় একা একা চলতি গেলি লোহার জিনিস রাখতি হয়। শড়া আর হিজল গাছতলা দিয়া হাঁটলি আর রেহাই নাই। তাছাড়া আমরা কাপড়ের আঁচলে গিড়িয়া দিয়া রাহি। এতে অপদোউত আসতি পারে না।'

মাগরিবের আজানের আহ্বানে সন্ধ্যা নেমে আসে। সন্ধ্যায় ধূপ-দীপ জ্বেলে তুলসী তলায় প্রণাম করতে আগের মতো আর দেখা যায় না। সন্ধ্যায় পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রণাম করার রীতি একেবারে মুছে যায়নি। তবে উলুধ্বনি আগের মতো কানে ভেসে আসে। উপাসনালয়ে ও পারিবারিক আসনে সন্ধ্যাকৃত্যে আগের থেকে অনেকটা ভাটি পড়ে গেছে। ধর্মীয় কাজ ভিন্ন অন্য যেকোনো কাজ সন্ধ্যায় নিষিদ্ধ। এই গোধূলি লগ্নে অনেককে সন্ধ্যা তারাকেও প্রণাম করতে দেখা যায়। তিন তিথি এক হলে তাকে বলে ত্র্যস্পর্শ। ত্র্যস্পর্শের দিনে আজও প্রাচীনেরা সন্ধ্যার আগে খাওয়া শেষ করে থাকেন।

২৪. যাত্রা নিরূপণ

লোকজন বাড়ি থেকে কোথাও যাত্রাকালে এখনও বেশ কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলে। ঘর থেকে বের হবার সময় সাধারণত তারা ডান পা আগে চালনা করেন। তারপর যে

www.pathagar.com

নাক দিয়ে শ্বাস প্রবাহিত হয় সেই পদ আগে বাড়ায়। বাম পদে ঘা দিয়েও অনেকে যাত্রা করেন। যাত্রার সময় মস্তকে আঘাত লাগলে তারা যাত্রা বিরতি করে। যাত্রার সময় সামনে বিড়াল বাধলে তাতেও যাত্রা বিরতি হয়। মায়েরা আজও সন্তানের পিছু পিছু কিছুদূর হেঁটে গিয়ে সন্তানের যাত্রা শুভ করে দিয়ে আসে। খনার বচনের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রামের লোকজন আজও দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করে যাচ্ছে। যেমন-

আগে হতে পিছে ভালো
যদি ডাকে মায়
ভরা হতে শূন্য ভালো
যদি ভরতে যায়।

তাই দেখা যায় সন্তানের যাত্রা পথে বিনা প্রয়োজনে মা পিছন থেকে ডাক পাড়ে। বলে ঠিকমতো চলাফেরা করিস। তারপর যাত্রাকালে সামনে শূন্য কলস দেখলে যাত্রা শুভ হয় না। যদি কলস ভরতে যাচ্ছে এমনতর দেখা যায় তাহলে যাত্রা ভালো। যাত্রাকালে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দৃষ্ট হলে যাত্রা শুভ বলে তারা বিশ্বাস করে। কারণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে মহাযজ্ঞ বলা হয়। সামনে নাপিত বাধলে তার গা ঘেষে যাওয়া হয়। এতে যাত্রা শুভ হয় বলে মানুষের বিশ্বাস।

২৫. গঙ্গাপূজা বা নদীর ঘাটের ব্রত

ব্রত, পার্বণ, লোকাচার এই সমস্ত লোকসংস্কৃতি বস্তুত ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ভর করে গড়ে উঠেছে। যেমন বরফে ঢাকা সাইবেরিয়ার লোকসংস্কৃতিতে যে আদর্শ ফুটে উঠেছে তার বিপরীতধর্মী আর্দশ দেখতে পাওয়া যাবে সাহারা মরুভূমির কিনার ঘেঁষা লোকজ উপাদানে। আবার নদী মাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশের জনজীবনে লোকগাথার তাৎপর্য আরেক রকমের। জলজনিত দুর্গতি থেকে পরিত্রাণের জন্য-এ আঞ্চলে একটি ব্রত পালন করতে দেখা যায়। তাহলো গঙ্গাপূজা বা নদীর ঘাটের ব্রত। বর্ষার আগমনে বালিকা-বধূরা তা পালন করে থাকে। দিন তারিখ সময় এতে প্রয়োজন হয় না। যত পার্বণ, ব্রত, লোকাচার আছে তার বেশির ভাগই নারী ও কিশোরীরা পালন করে থাকে। আবহমান লোকজসংস্কৃতি ধরে রাখতে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গঙ্গাপূজার উপাচারে বাগাড়ম্বরতা নেই। গঙ্গা শিবঠাকুরের পত্নী, শিবঠাকুর অল্পতে তুষ্ট। তাই তার এক নাম অশুতোষ। শিব ঠাকুরের পত্নী হিসেবে অল্পে-স্বল্পে তুষ্ট থাকার বৈশিষ্ট্য তার মধ্যেও আছে বলে ভক্তদের বিশ্বাস। গঙ্গাপূজার প্রয়োজন হয় শুধুমাত্র পান-সুপারি ও সিঁদুর, ধূপদীপ। নারীরা স্নান সমাপন করে আবক্ষ জলে দণ্ডায়মান হয়ে ওইসব উপাচার ভক্তিসহকারে জলে নিবেদন করে। কিনারে জলতে থাকে ধূপদীপ। তারা গঙ্গাস্তব পাঠ করে কূলে এসে উলুধ্বনি দিয়ে এই ব্রত শেষ করে। বিষয় সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্য কারণও আছে। যেমন–ছোট শিশুরা সাঁতার জানে না, তারা যেন জলে তলিয়ে না যায় তারও নিবেদন আছে এই ব্রতে। এমন কিছু নারী আছে যারা জলে নামা মাত্রই বুদবুদ করে কী যেন তাদের দিকে ধেয়ে আসে। ভয়ে তারা জলে নামতে পারে না। কূলে বসে ঘটিতে জল ভরে স্নান করে। শুধু নারী কেন অনেক পুরুষ আছে যারা একা একা জলে নামতে ভয় পায়। তাই এইসব জলভীতি ও দুর্ঘটনা না ঘটে এই কারণে গঙ্গাপূজা বা নদীর ঘাটের ব্রত পালন করা হয়।'

www.pathagar.com

২৬. ক্ষেতে কচু ও মানুষের প্রতিকৃতি

ক্ষেতে ফলবে ফসল কিন্তু সেখানে কচু ঝুলানো ও মানুষের প্রতিকৃতি দেখে কার না কৌতূহল জাগে। একজন কৃষক নটবর পাণ্ডে (৬৮) তিনি তা এভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেন–'কচু মোগে দেশে একটি ভালো খাবার। মানকচুকে তরকারির রাজা বলা হয়। আবার হেই কচু গালি হিসেবেও ব্যবয়ার অয়। গায়ের রক্ত জল কইরা মোরা ক্ষেতে ফসল ফলাই। কিছু লোক আছে বুদ্ধি শুদ্ধি মোডেই নাই। ক্ষেতের ফসল মারাইগা পথ বানায়। দেহাদেহি বেয়াকরা ঐ পথে হাডে। এসব পথের মাথায় মোরা কচু ঝুলাইয়া রাখি। এ দ্বারা পথিকদেরকে ঐ পথে হাডা মানা করা বুঝায়। যদি কেউ হাডে তবে কচু গালড্যা তার উপর পরবে। এই ব্যবস্থা করলে দেখা যায় আর কোনো পথিক ওখান দিয়া হাডে না।' অন্যের জমিতে চাষ করে এমন একজন বর্গা চাষি মজিবর মোল্যা জমিতে খড় দ্বারা বানানো মানুষের প্রতিকৃতি রাখার কারণ বললেন,–'ঝড়বাদলতো ফসলের ক্ষতি করেই। জীব-জন্তুরাও ফসলের ক্ষতি কম করে না। ইন্দুর ফসলের ক্ষতি করে সবচেয়ে বেশি। ফসলেত্তিয়া ইন্দুর খেদানির জন্যি খ্যাড় দিয়া মানুষ বানাইয়্যা ইন্দুরের গানার ধারে রাহা অয়। গলায় দিতে অয় শামুকির মালা। বাতাসে মালা দোলবে আর মালায় ঝম ঝম শব্দ অবে। ইন্দুর ভাববে এই মানুষটি আমারে ধরতি আসছে। সে ভয়ে আবার গানায় ঢোকপে। এতে আমরা উপগার পাই। এছাড়াও জমিতে ইন্দুরির গানার কাছে গাছের ডাল পুতিয়া রাহা-অয়। পেঁচা ও টিটিপক্ষ নামের এই ফায়ি দুড্যা ইন্দুর খায়। এদের বসার জন্যি গাছের ডাল পুঁতিয়া রাহা-অয়। তারা ঐ ডালে বসে ইন্দুর ধইরা খায়।'

তথ্যসহায়ক

১. বিপুল বিশ্বাস, গ্রাম : রাজিন্দ্রার পাড়া, কোটালীপাড়া।
২. জাহাঙ্গীর আলম, খান্দার পাড়, উপজেলা : মুকসুদপুর।
৩. বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস, গ্রাম : ইন্দুহাটি, উপজেলা : মুকসুদপুর।
৪. গণপতি বিশ্বাস, বয়স-৬৯. পেশা : শিক্ষক, উপজেলা : কাশিয়ানী।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

১. নৌকা

নৌকা লোকপ্রযুক্তির অন্যতম আরেকটি নিদর্শন। জলাময় এই জনপদের একদা যোগাযোগের বড় মাধ্যম ছিল নৌকা। এই নৌকা নির্মাণে তাদের মনন মেধা যেভাবে ফুটে উঠেছে তা যেনতেনভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। জলে টেকসই এমনতর গাছ দিয়ে তৈরি করে নেয় বিভিন্ন ধরনের নৌকা। গলৈ, গুরা, চরাট, মাচাল, বৈঠা, হাল, চৌড় এগুলো নৌকার উপকরণ। পাতাম দিয়ে নৌকা মিস্ত্রিরা একটার পর একটা তক্তা লাগিয়ে তৈরি করে নৌকা। পানসি, খোসা, করফাই, ব্যাপারী নৌকা এরকম নানাবিধ নৌকা গ্রাম্য দারু প্রকৌশলীরা তৈরি করে। বাচাড়ি নামক এক প্রকার লম্বা নৌকা এখানে বানাতে দেখা যায়। এই নৌকাগুলো মূলত ধনী পরিবারগুলোর এক প্রকার পারিবারিক সাজ। লক্ষ্মীপূজা, দুর্গাপূজা ও কালীপূজার মেলায় সেসব বাচাড়ি নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। নৌকা বানানোর এখানেই শেষ কথা নয়। আরও দেখা যায় তাল গাছের ডোঙা। এই ডোঙা বানানো খুব কঠিন কাজ। ভিতরকার লম্বা আশ তুলে নৌকা সদৃশ ডোঙা বানাতে প্রকৌশলীদের ঘর্ম ঝরাতে হয়। যে কেউ এই ডোঙা বানাতে পারে না। এ নিয়ে এখানে একটি প্রবাদও প্রচলিত আছে। তাহলো–

শুনছ তাল গাছে ডোঙা হয়
বানায়ে দেখছ?

কাঠের তৈরি ডোঙা নাও

www.pathagar.com

২. পাটবান

এখানে দারু শিল্পের মধ্যে আছে বসত ঘর, পাটবান বা শিবাসন, ঢেঁকি, ঘানি, লাঙল ইত্যাদি।

বসতঘরগুলো দেখতে খুব চমৎকার। টিনের ঘরগুলো দেড়তালা ও দোতালার। কাঠ খুঁটির কাঠামোর উপর টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি করা হয় এই ঘরগুলো। বাতা, গোলবাতা, আড়া, পাড়, দড়ি, কাঠ এসব ঘরের প্রাণস্বরূপ।

পাটবান বা শিবাসন লোকপ্রযুক্তির মধ্যে খুবই প্রশংসা কুড়িয়েছে। তিন ধরনের গাছ দিয়ে তৈরি করা হয় এই শিবাসন। নিম, বেল ও চন্দন বৃক্ষ। দশ অবতার সংযোজিত এই শিল্পকর্ম দেখলে নয়ন জুড়ায়। রথযাত্রার ঠুটো জগন্নাথের মূর্তিও এখানে ফুটিয়ে তুলতে দেখা যায়।

ঢেঁকি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লোকপ্রযুক্তির নিদর্শন। ধান ভানতে এই লোকপ্রযুক্তিটির কোনো একসময় খুব কদর ছিল। বেশ কয়েকটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয় এই লোকপ্রযুক্তিটি। মোনাই, শাইল্যা ও কাতলা তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য। ঢেঁকির মাথার দিকের যে অংশের মাধ্যমে নোটে আঘাত হানা হয় তার নাম মোনাই। ঢেঁকির পিছনের দিকে দুই ধারে যে দু'টি কাষ্ঠ খণ্ড মাটির মধ্যে পোতা থাকে তার নাম কাতলা। ঢেঁকির নির্ধারিত স্থানে ছিদ্র করে যে যন্ত্রটি ঢুকানো হয় তার নাম শাইল্যা। এই শাইল্যার দুই প্রান্ত কাতলার উপর থাকে। এই হলো ঢেঁকির বিভিন্ন যন্ত্রের মোটামুটি অবস্থান। এই ঢেঁকি গ্রাম বাংলার একটি পৌরাণিক ঐতিহ্য।

ঘানি হলো শস্য বীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের একটি অন্যতম লোকপ্রযুক্তি। এর অর্ধেকটা মাটির মধ্যে পুতে রাখা হয়। উপরের অংশ থাকে কিছুদূর পর্যন্ত খোলা। এর ভিতর ঢেলে দেওয়া হয় তিল, তিষি, মোষণে, সরিষা ইত্যাদি তৈলবীজ শস্য। ঐ গর্তে ঢুকানো থাকে আরেকটি কাষ্ঠ খণ্ড (বান্দর) যার উপরের অংশ সংযুক্ত থাকে মোটা একটি তক্তার সাথে। সেই তক্তার একপ্রান্ত কৌশলগতভাবে লাগান থাকে পোতা কাষ্ঠ খণ্ডটির সাথে যা অনায়াসে বৃত্তাকারে ঘষে ঘষে ঘুরতে পারে। তক্তাটির অপর প্রান্ত আর এক অভিনব কৌশলে গরু বা ঘোড়ার কাঁধে জুড়ে দেওয়া হয়। মোটা তক্তাটির উপর পাথর বা ভার জাতীয় কোনো কিছু থাকা আবশ্যক। বৃত্তাকারে পশুরা ঘোরে আর বান্দর চাপে তৈলবীজ পিষ্ট হয়ে তেল বের হয়ে আসে। তেল নিষ্কাশনের পর তৈলবীজ চাপে জমাট বেঁধে যে রূপটি ধারণ করে তাকে খৈল বলে।

৩. লাঙ্গল নির্মাণ

ভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে ফসল ফলানো সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে। আর এ কাজে শ্রেষ্ঠতম চাষি প্রযুক্তি হলো লাঙল। অবশ্য এরও আগে লাঙলের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ভূমি কর্ষণকালে জনক রাজা লাঙলের ফলায় সীতাকে পেয়েছিলেন শাস্ত্রে তাও উল্লেখ আছে। আদিম মানুষ ছিল কৃষিনির্ভর। তাই ভূমি কর্ষণ কাজে লাঙলের যে কতটা কদর তা বলাই বাহুল্য। কৃষক পরিবারগুলো এখনও লাঙলকে ঢের সম্মান দেখিয়ে থাকে। এর প্রযুক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গরুর কাঁধে থাকে জোঙ্গাল বা জোয়াল। লাঙলের যে অংশ কৃষকরা ধরে থাকে তার নাম হলো গুটি। লোহার ফলা যুক্ত নিম্নাংশ ভূমি বক্ষ

www.pathagar.com

বিদীর্ণ করে চলে। ঈষের কৌণিক মাপ এত সূক্ষ্ম যে গরুর কাঁধের জোয়ালের সাথে সাদৃশ্য রেখে সমান্তরালভাবে তা এগিয়ে যায়। এই প্রযুক্তি কৃষককুলের অগ্রসর মননের পরিচয় দেয়।

আগাছা ফসল উৎপাদনে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঐ সকল আগাছা নিধনে লোকপ্রযুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। কাঁচি, ট্যাঙারি, কোটা, বককোটা, আচড়া তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য। কাঁচি ফসল কাটতে বেশি ব্যবহার হয়। কাঁচির বৃত্তাকারের ভিতরের অংশে থাকে অসংখ্য আল। এই কুচি কুচি আল ফসল কেটে ঘরে আনতে খুবই সহায়ক। ট্যাঙারির গঠন ছোট কোদালের মতো। ফসল নিড়াতে এই লোকপ্রযুক্তিটি খুবই দরকার। কোটা হচ্ছে ৭-৮ ইঞ্চি লম্বা পরিমাপের লোহার শলাকা চিকন গাছ খণ্ডে ঢুকানো এক প্রকার যন্ত্র। ফসলের ক্ষেতে মাটি আলগা করতে এর খুব কদর। বককোটাও ওইরকম। তবে এই বককোটা যন্ত্রের গলাটা বকের মতো বলে এর নামকরণ করা হয়েছে বককোটা। আচড়া হলো ৩-৪ ফুট লম্বা কাষ্ঠ গাত্রে সারিবদ্ধভাবে লোহার শলাকা বিধানো যন্ত্র। এই যন্ত্র দিয়ে ফসলের জমাট বাঁধা মাটিকে আলগা করা হয়। তারপর আছে থোড়া বাঁশ। চিকন বাঁশের এক প্রান্তে গাছের দো ডালা শাখা লাগিয়ে হুক সদৃশ করা হয়। ভূমির আগাছা যেমন কচুড়ি বা নাড়া পরিষ্কার করতে এই যন্ত্রটি সর্বাধিক প্রয়োগ হয়। তারপর বাড়ির কাছের আলান পালানের কাজ করতে খোন্তা, কোদাল, শাবল, দা ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে থাকে। কৃষকরা রোদ বৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য যে প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে তারমধ্যে মাথাল ও জোঙড়া উল্লেখযোগ্য। এই দু'টি প্রযুক্তিকর্মের উপকরণ হলো বাঁশ। বাঁশ শিল্পীরা এই বুননকে একটি ভিন্নমাত্রা সংযোজন করে দেয়। এর উপরিভাগ থাকে সুচালো নিম্নভাগ বিস্তীর্ণ যা রোদ বৃষ্টিকে বাঁধা দেয়। পাট কাটতে তারা ব্যবহার করে হাসুয়া। এই যন্ত্রটিতে কাঁচির মতো আল থাকে না। আকারে কাঁচির মতো হলেও পরিমাপে বড়। শীতকালে খেজুর গাছের বাকল ছেঁচে রস বের করতে গাছিরা ছ্যান ব্যবহার করে থাকে।

গরু মহিষ দ্বারা ফসল মাড়াই করা এ আরেক কৌশলী পদ্ধতি বটে। উঠানে ধানের আঁটি বা অনান্য ফসল ছড়িয়ে তার উপর ৪-৫টি গরু পরস্পর বেঁধে বৃত্তাকারে ঘুরালে সুন্দর ফসল মাড়াই হয়। প্রথম যে গরুটি বাঁধা হয় সেটি সাধারণত শান্ত স্বভাবের। একেবারে চঞ্চল স্বভাবের গরুটি বাঁধা হয় শেষ প্রান্তে।

উনুন প্রযুক্তির গুরুত্বও কম না। উনুনের গঠনশৈলী বেশ প্রযুক্তি নির্ভর। উপরের দিকে আছে তিনটি ঢিবি। একে ঝিক বলা হয়। ঐ তিনটি ঝিকের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটুকু থাকে সেখান দিয়ে বাতাস ঢোকে এবং ধোয়া বের হয়। এই পদ্ধতির জন্য সুন্দর আগুন জ্বলে। আরও থাকে উনুনে মহোন। এ মহোন দিয়ে দাহ্য পদার্থ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বাতাসের প্রবেশ দ্বার হিসেবেও মহোনের ভূমিকা রয়েছে।

৪. মৃৎশিল্প

গৃহকর্মের সরঞ্জামাদিতে লোকপ্রযুক্তির ঠাঁই বহুল আলোচিত। গৃহকর্মে ব্যবহৃত যেসব উপকরণ চোখে পড়ে তারমধ্যে মাটি, বেত ও বাঁশের তৈরি দ্রব্য সামগ্রী বেশি। এখানকার এঁটেল ও দোআঁশ মাটি এই সুবিধাকে বেশি প্রভাবিত করেছে। মাটির

www.pathagar.com

পাত্রের মধ্যে প্রথমে ভাতের হাড়ির কথা বলে রাখা ভালো। কারণ গ্রাম বাংলায় আজও মাটির হাড়িতে ভাত রাঁধতে দেখা যায়। সরা কিন্তু হাড়ির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই মাটির হাড়ির ভাত খেতে খুবই সুস্বাদু এবং নিরাপদ। চাল ধুতেও মাটির তৈরি বাসন আছে। এর নাম ঝাঁঝর। শত ছিদ্রের সমন্বয়ে তৈরি এই ঝাঁঝর যন্ত্রটি। মুড়ি চিড়া ভাজতে প্রয়োজন হয় খোলা পালিয়া, বালিয়ান, ছাবনা ও ঝাঁঝর। উত্তপ্ত এসব পাত্র ধরার জন্য কাপড়ের তৈরি এক ধরনের জিনিস ব্যবহার করে। আঞ্চলিক ভাষায় একে পাটুয়া বলে। ভাজার কাঠি বানিয়ে নেয় নারিকেল পাতার শলাকা দিয়ে। তারপর আছে বড় বড় কোলা। এই কোলায় আগেরকার মানুষ মুড়ি রাখতো। এতে মুড়ি তরতাজা থাকে। এমনও শোনা যায় ঐসব কোলায় ঘি মেখে শুকায়ে নিত। এতে মুড়ি খুব সুস্বাদু হয়। আছে কলস, খোরা, কুনো, ঘট, তাওয়া, জালা ইত্যাদি। এর সবই মাটির তৈরি তৈজষপত্র। কুমারেরা বিশেষ এক পদ্ধতিতে এই গৃহকর্মের প্রসাধনী তৈরি করে থাকে। মাউ তারমধ্যে অন্যতম কুমারীয় যন্ত্র। এই মাউ নিয়ে এখানে ছড়াও প্রচলিত আছে। যেমন–

ভাণুরাম কুমোরেরা
    সাতে পাঁচে ভাই
মাউ খানি ছেনিয়া
    করলেন এক ঠাঁই
মাউ খানি ছেনিয়া
    তুলে দিলেন চাকে
সুবর্ণ ধূপতি হলো
    আড়াইটি পাকে।
রবি দিলে শুকিয়ে
ব্রহ্মা দিলেন পুড়িয়ে
    গুরু দিলেন বর
আজ এই ধূপতি শুদ্ধকর
    ভোলা মহেশ্বর।

মৃত্তিকা প্রযুক্তির মধ্যে পুতুল, মূর্তি ও অন্যান্য খেলনা সামগ্রী যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ভাস্করদের মাটির মূর্তি লোকপ্রযুক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাকে। তাদের নিখুঁত মূর্তি দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। অধিকাংশ পালেরা হাতে মূর্তি গড়ে থাকেন।

৫. মাছ শিকারে লোকপ্রযুক্তি

গোপালগঞ্জ জেলাটি জলাভূমি হওয়াতে মাছ শিকারের জন্য যেসব লোকপ্রযুক্তি সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও অম্লান। জাল দিয়ে মাছ ধরা তারমধ্যে অন্যতম। কয়েক প্রকার জাল এখানকার জনগণ ব্যবহার করে থাকে যেমন, পাশ খেওলাজাল, ঝাঁকিজাল, মৈয়াজাল, ওচাজাল, ধম্বজাল, ভ্যাসালজাল, ভুরিজাল কৈয়াজাল, পুঁটিয়াজাল, সরপুটিয়াজাল, খুটনিজাল ও ইলশাজাল ইত্যাদি। এই জাল তৈরিতে যেসব যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তারমধ্যে থুড়িয়া, চটা ও কাফুয়া গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

বাঁশের তৈরি মাছ শিকারের যন্ত্রের মধ্যে দুঘোড়, বানা, খারা, সাগরা, ঘুনিয়া, চাচড়া উল্লেখযোগ্য। ফুলকুচি, অ্যাড়া, ঠ্যাটা, ঝুপি, এইসব যন্ত্র দিয়ে বড় বড় মাছ কোঁপাতে দেখা যায়। রাতে আলোর মাধ্যমে মাছ শিকারকে আলাধরা বলে। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাস এই আলাধরার জন্য উপযুক্ত মৌসুম। হাজারি বড়শি দিয়েও জেলেরা নদীর বড় বড় আইড়, বোয়াল ও কাছিম শিকার করে থাকে।

৬. পাখি ও পশু শিকারে লোকপ্রযুক্তি

এই এলাকাটি বন-বাদাড়ের জন্য বিখ্যাত নয় তাই পশু শিকারে এখানকার প্রযুক্তি তেমন অগ্রসর হয়নি। সড়কি, ভ্যালা, দিয়ে মাঝে মধ্যে দু'একটি শিয়াল ও বন বিড়াল শিকার করতে দেখা যায়। তবে পাখি শিকারে এখানকার লোকপ্রযুক্তি একেবারে অনগ্রসর একথা বলা যাবে না। চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাহাড় থেকে নেমে আসা বাবুই পাখি ধরতে এলাকায় ধূম পড়ে যায়। যে জাল দিয়ে বাবুই পাখি শিকার করতে দেখা যায় তার নাম সাট জাল। শীতের দিনে বিভিন্ন প্রকার পাখি শিকারও করা হয় ঐ সাট জালের মাধমে। চ্যাগা ও অন্যান্য পাখি শিকার করতে রাতে শিকারীরা টানা জাল ব্যবহার করে। বিভিন্ন প্রজাতির বক শিকার করতে বাঁশের তৈরি ফাঁদ চোখে পড়ে। মাড়ে ও ছিটকা তার মধ্যে নাম করা। কোড়া, ঘুঘু ও অন্যান্য পাখি শিকার করতে এখানে রয়েছে নানা ধরনের গোঁফ।

৭. চিত্তবিনোদনে লোকপ্রযুক্তি

চিত্ত বিনোদনের কথা বলতে গেলে প্রথমে ঘুড়ির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখানে যেসব ঘুড়ি উড়াতে দেখা যায় তারমধ্যে, পতেঙ্গা, ত্যাল পতেঙ্গা, ঢ্যাপস ও জের ঘুড়ি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মাঠে প্রান্তরে কিশোর বালকেরা মেতে ওঠে এই লোকপ্রযুক্তির প্রতিযোগিতায়। ঘুড়ির মাথায় ভেরি নামক একপ্রকার যন্ত্র তারা ব্যবহার করে। ঐ ভেরিতে যুক্ত চিকন সুতার সাথে বাতাস লেগে এক সুরেলা ধ্বনি সৃষ্টি করে। লাটাইয়ের কাছে সুতায় কান পাতালে তা বেশ শোনা যায়।

ঘরের সজ্জায় লোকপ্রযুক্তির মধ্যে পড়েছে শিকা, নকশিকাঁথা, চেলা দেওয়া কাঁথা, তাল পাখা, রুমাল, খেজুর পাতার মাদুর, গৃহলক্ষ্মীর আসন ইত্যাদি। মাটির প্রদীপও কিন্তু কম গৌরবের না। সন্ধ্যাবেলায় প্রতিটি ঘরে মিটমিট করে জ্বলতে দেখা যায় সেই প্রদীপগুলোকে। ঘরের ডোহা কুলবধূরা দক্ষতার সাথে গড়ে থাকে। ঘরের চতুর্দিকে ঐ ডোহা ঘরগুলোকে নবীন করে তোলে। তারপর আছে পাক ঘরের সাজনা। পাক ঘরে কলসি রাখার জন্য তারা মাটি দিয়ে উঁচু করে যে জিনিসটা তৈরি করে তার নাম ওটা। ঢেঁকির নোট তৈরি বেশ মজার। ইট, পাথর ও চাড়া ঢেঁকিতে টুকরো টুকরো করে অভিনব কৌশলে একটু গর্ত করে আস্তে আস্তে পিটায়ে নোট তৈরি করে নেয়। বেশ কয়েকদিন আগুন জ্বেলে তারা নোট শুকানোর ব্যবস্থা করে। এটিকে বলে সাজাল। ঐ নোটেই চলে ঢেঁকির ভারাভানার কাজ।

প্রায়ই পরিবারে দেখা যায় পিড়ি ও জলচৌকি। এই পিড়ি ও জলচৌকি বাংলার ঐতিহ্য বলে পরিবারগুলো বিশ্বাস করে। মেহমানদেরকে মেহমানদারী করতে পিড়ির

www.pathagar.com

কদর অনস্বীকার্য। নতুন কুটুমদের সম্মান দেখাতে বড় বড় পিড়ির আসলে জুড়ি হয় না। মেহমানদের পা ধুইতে জলচৌকিতে বসতে দেওয়া হয়। জলচৌকি ও জলপাত্রের সাথে থাকে একটি গামছা। ঐ গামছা দ্বারা অতিথিরা পা মুছে গৃহকর্তাদের সম্মান রক্ষা করে থাকেন।

৮. ঘানি

তিল, তিষি ও সরিষা থেকে খাঁটি তৈল পাওয়ার জন্য কাষ্ঠ নির্মিত এক প্রকার পেষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যার নাম ঘানি। অবশ্য যান্ত্রিক যুগ আরম্ভ হওয়ায় এর কদর বলতে গেলে একেবারেই কমে গেছে। এই ঘানি মোটা একটা কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা নির্মিত। ওই গুড়িটাকে প্রায় অর্ধেক পরিমাণে খাড়া করে মাটিতে পোঁতা হয়। মাটির উপরের অংশ প্রায় এক হাত পরিমাণ খোলা হয়। যেন একটা ঢোলের বেড়। তার নীচে করা হয় একটা গর্ত। গর্তের মধ্যে বসানো হয় একটা কাষ্ঠ দণ্ড, যার দৈর্ঘ প্রায় দুই থেকে চার ইঞ্চি বেড়ে। একে জাঠ বলে। ওই জাঠের সঙ্গে কৌশলগতভাবে সংযুক্ত করা হয় আর একটা কাষ্ঠ দণ্ড, যার নাম বান্দর। বান্দরের উপরের অংশ সংযুক্তি থাকে মোটা ও চওড়া একটা তক্তার সঙ্গে যা ঘষে ঘষে বৃত্তাকারে ঘুরতে পারে। তক্তার অপর প্রান্ত আর এক অভিনব কৌশলে গরু বা ঘোড়ার কাঁধে জুড়ে দেওয়া হয়।

ঘানি

মোটা তক্তাটির উপর অবশ্যই পাথর বা ভারা দেওয়ার জন্য অন্য কিছু থাকে। বৃত্তাকারে পশু ঘোরে আর দণ্ডের চাপে তৈল বীজ থেকে তৈল বেরিয়ে আসে। যেসকল গরু বা ঘোড়া ব্যবহার করা হয় তাদের চোখ ঠুলি বা ঢাকনা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। গরুগুলোকে সাধারণত কলুর বলদ বলা হয়। তৈল নিষ্কাশনের পর জাঠের চাপে তৈল বীজ জমাট বেঁধে যে রূপটি ধারণ করে তাকে খৈল বলে। ওই খৈল বিভিন্ন প্রকার সার ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষত পানের বরজের এটি একটি উৎকৃষ্ট সার।

www.pathagar.com

৯. জাহৈ

এটি একটি কৃষি কর্মের আঞ্চলিক নাম। জমির চারা ধানগুলো যখন অপেক্ষাকৃত চিকন ও রং করাটে হয় তখন কৃষকগণ এর কারণ খুঁজে বের করে। সাধারণত ধানের চারার গোড়ার মাটি জমাট বেঁধে গেলে এমন হয়। তখন বাশ নির্মিত মই ধানের চারার উপর দিয়ে টানা হয়। এতে ধানের চারার গোড়ার মাটি আলগা হয় এবং দেখা যায় কয়েকদিনের মধ্যে গাছ সতেজ হয়ে নতুন নতুন চারা বের হচ্ছে। একে জাহৈ বলে। যারা আদর্শ কৃষক তারা কিন্তু এ পদ্ধতিটা ব্যবহার করেই যায়। চারার বয়স যখন ২০-২২ দিন হয় তখনই এই পদ্ধতি উপযোগী।

জাহৈ যদিও সামন্ত যুগের পদ্ধতি তবুও এর গুণাগুণ যথেষ্ট থাকায় কৃষক বর্তমান সময়ও এর যথোচিত ব্যবহার করে আসছে। দেখা যায় ইরি ধানের ক্ষেতেও এর বহুল ব্যবহার আছে। কেননা এতে রোপা চারার গোড়ার মাটি ওলোট পালট হয় এবং গোড়া দিয়ে নতুন চারা বের হয়ে অধিক ফলনে সহায়তা করে।

www.pathagar.com

লোকভাষা

এ অঞ্চলের লোকভাষায় দেখা যায় ঈ, ঊ, স, ঐ,ঔ, ঝ, ঞ, ঠ, ন শ, ষ, ক্ষ, ী, ে া, ং, ঃ এসব বর্ণের ব্যবহার কম।

আঞ্চলিক শব্দ	অর্থ
দেশাল	দেশীয়
তাগদ	তৎপর
ঢক	আকার/ চেহারা
ঘোপ	আড়াল
খন্দ	ফসল
গাছি	যারা গাছে উঠে গাছ কাটে
আনাচ-কানাচ	ঘরের চারপাশের স্থান
ডন্ড কপালিয়া	যারা ধ্বংসাত্মক কাজ করে
বেহিবেড়া	বাড়ির/ ঘরের চারিপাশে হালকা বেড়া
চুনি	ছোট
ছ্যাপ	থু-থু
বোটোরি	আকারে ছোট
জাবড়া	অগোছালো অবস্থা,
কাঠা	দুই পইয়া বা ১০-১২ সের ধান ধরে এমন পাত্র।
শোলী	২০ পইয়া পরিমাণ ধান/৪০ পইয়া পরিমাণ ধান।
চ্যাংড়া	অল্প বুদ্ধির লোক
জবো-জবো	খাবার খেতে ভাতের সাথে মাছের ঝোল বা ডাল বেশি করে মিশ্রিত করা।
কায়ড়া	কাকড়া
জটুয়া	জটওয়ালা
ছদুমধু	অতি সাধারণ
টেনুয়া	বিদ্রুপার্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়।
মোথা	গাছের গোড়ার অংশ
মোথুয়া	সামগ্রী
বেঙি	গালি বোঝায়
দি	দিদি/ বড় বোন
ম্যালেং	শামুকের মুখের ঢাকনা
বেহান	সকাল

www.pathagar.com

বেহানেস্যার বেহানে	সাধারণত সকালবেলা কেউ কাউকে তাজ্জব কথা বললে শব্দটি ব্যবহার করে।
ঠুটুয়া	অপুষ্টি
ইটিয়াল	ঢেলা
জারুয়া/বারুয়া	গালি বিশেষ
ভেউয়া	ভেলা
নছল্যা	নাক ছিটকানো
নাহে	নাকে
মুহি	মুখে
ত্যাশে	তারপর
খোটা	তুলনা করা
আশুব্বাদ	আশীর্বাদ
সন্ধিয়া	সন্ধ্যা
মোনশারে মোনশারে	মনে মনে
ঠেউয়া	পতনশীল কোনো বস্তুর গতিরোধক
ভোদুয়া	খুব বড়
কুত্তি	ছোট
ভূচড়ুয়া	গাদিল
ভাটুয়া	দুরূহ
ন্যাচামারা	পালানো বা ভয়ে সরে যাওয়া
ছালাবাৎ	পছন্দ করতে খুব বাছাই বাছাই করা
ডাংরা	বড়
ঘিটি	গদ্দান
আবুয়া	বোকা
আউড়ুয়া	খাবারের প্রতি অতিরিক্ত লোভ
টাউয়া	গণ্ডদেশ
বোন্টিয়া	যার মাথায় টিকি আছে
মচ্ছোপ	মহোৎসব
ক্যাতকুল	বোগল
ফেন্টুল	প্যান্ট
চোমো	মই
আনতোলি	এখন
চুবনি	জলের ভিতর ঠেসে ধরা
বাহান্দে	ঘরে
খচ্ছাৎ	তাড়াতাড়ি
আহা	উনুন
জম্বের	খুব

www.pathagar.com

বোগ	অঙ্কুর
ঝিক	উনুনের উঁচু অংশ
মোহন	উনুনের ভিতর যেখান দিয়ে জ্বালানী ঢুকানো হয়
ঘা	১০টি কাঁচা সুপারি পরিমাণ
আন্দু	ঘরের কালো ঝুল বা ময়লা
টোয়া	অল্প পরিমাণ আঘাত
ঠাটা	বজ্রপাত
কেরুর /কোট্টেন	কারো নিকট
কুইয়া	দুর্গন্ধযুক্ত কোনো কিছু
কেটৈ	বিদ্রুপার্থে ব্যবহার করা হয়
খাজনী	চুলকানি
নটি	গালি বিশেষ
ঢ্যাবনা	গালি বিশেষ /প্যাজি
তেনা	ন্যাকড়া
ফাও	বিনামূল্যে
গাছুম	অল্প পরিমাণ
গাবানো	জেগে থাকা/ পানিতে অক্সিজেনের অভাবে মাছ এটা করে
ঘাইয়্যান	খুব বড়
চেনু/নুনু	পুরুষাঙ্গ
ছ্যাবলা	হালকা বুদ্ধির লোক
ডাবু	বিরক্ত হলে খেলার ক্ষেত্রে ব্যবহার
ফাড়ুয়া	প্রতিযোগিতায় একেবারে পিছনে পড়া
কোল	বক্ষদেশ
আদ্দামড়া	যে লোক আকারে বড় কিন্তু কোনো কাজের নয়
আটমারি	যার মন খোলাসা নয়
কাওরা	মিলনে আসক্ত এমন
ঘাই	ছুড়ে মারা
খিটনদাড়া	যে শলাকা উনুনে ব্যবহার করা হয়
চরাট	নৌকার যেখানে বসে নৌকা বাওয়া হয়
মাচাল	নৌকার বসার স্থান
কৈলা	হুক্কার উপরের অংশ/যে পাত্রে তামাক দেওয়া হয়
বুন্ডি	ছোট বোন
খুড়ি	কাকিমা
টাউয়া	মুখের অংশ বিশেষ
কেনুয়া	বাহুর কব্জি
টাবুরিয়া	ছৈয়া নৌকা

www.pathagar.com

মানান্তার	অভাব
বুনু	ভগ্নিপতি
ঝোলানী	নিরামিষ
কুহুর	কুকুর
মেহুর	বিড়াল
বেনুন	তরকারি
ছালুন	তরকারি
পিদ্দুম	প্রদীপ
ফ্যাতরা	কৃপণ
তেলানী	সম্বারা
মোচকুর মাছ	মাগুর মাছ
ফেত্তম	প্রথম
ফেষ্টুয়া	পাটের আলগা আঁশ বিশেষ
আথাল	আঙ্গিনায় গরু রাখার স্থান
আতোন	দুধের পাত্র
চুমোর	গাছের মোচা বিশেষ
বেহা	বাঁকা
আজোরিয়া	অযথা
খাবরান	বকাবকি
খোতি	পকেট
ফুজোল	মাঝারি উকুন
নেক	উকুনের ডিম
বুড়ায়া	বড় উকুন
বোতি	পরিপক্ক
ফুলুয়া	কাঁচা
টালটি -বালটি	তালবাহানা
অবব-জবব	আবর্জনা
মুড্ডুয়া	মাথা
আতুত	কুকুরকে ডাকা
থাউক	রেখে দেওয়া
ছোবলা	ফলের খোসা
কুয়ারা	হাসি তামাশা
কাহৈ	চিরুনি
মুছি	প্রদীপ
গাশুয়া	অপরিষ্কার
আইয়া	নানি/দিদিমা
উড়ুম	মুড়ি

www.pathagar.com

গাওয়াল	ফেরি করা
মেচি	মাদি কুকুর
উপুন	কেশকীট
ক্যাম্বাইয়া	কীভাবে
থোড়া বাঁশ	কৃষিকাজে ব্যবহৃত বাঁশের সাথে হুক লাগান যন্ত্র।
কোরানী	নারিকেলের খোল থেকে শ্বাস বের করার যন্ত্র।
নোট	ধান ভানার গর্ত
মোনাই	ঢেঁকির সামনে লাগানো কাঠের তৈরি যা ধানকে আঘাত করে চাল বের করে।
কাতলা	যে দুটি খুটির উপর ঢেঁকি থাকে।
ট্যাপান	গাছের অন্তঃসত্ত্বা
কাঠুয়া	কাঠের তৈরি পাত্র
খোরা	মাটির তৈরি পাত্র
আরান	কাজ করতে বলা
বেছন	বীজ
আহাশ	আকাশ
পৈয়া	বেতের তৈরি এক প্রকার পাত্র
জুয়াড়	উলুধ্বনি
থোতনা	চিবুক
ছ্যানা	মাখানো
চ্যাটক্যানো	মাখানো
প্যান	কফ/ সর্দি
ছ্যাচোড়	চোরা স্বভাব
কোতা	কাতরানো
আহাল	কাকড়
ট্যাটন	চালাক
পোঙয়া	পাছা
ফ্যাৎ করে	তাড়াতাড়ি
যুত কর	চুপথাকা
ঠেয়ার	ভাবভঙ্গি
ক্যাতর	চোখের ময়লা
গুটুয়া	জমিতে আগাছার ঢিবি
ছেড়ুয়ানো	পাতলা পায়খানা করা
বটিল	মজবুত
খেমচু	চিমটি
দান্দড়িয়া	ভীতিকর কম্পিত জলজ প্রাণী
গানা	গর্ত

www.pathagar.com

নোঠানী	আটার জাউ
ফেনাজাউ	ফ্যান জড়ানো ভাত
প্যাটা	কলিজা
আশখোলি	আইশ
ছাবনা	মুড়িভাজার পাত্র বিশেষ
বালিয়ান	মুড়ি ভাজার পাত্র বিশেষ
ফাটি	ছাগল

হাট বাজার

গোপালগঞ্জ সদর

নাম	বার	দ্রব্য
বৌলতলী	শুক্রবার-সোমবার	বাঁশ, মাছ, পাট, চাল, আটা তরিতরকারি ইত্যাদি
সাতপাড়	রবিবার-বৃহস্পতিবার	চাল, ধান, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
চন্দ্রদিঘলিয়া	শনিবার-মঙ্গলবার	চাল, মাছ, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি
ভেড়ার হাট	রবিবার-বুধবার	বাঁশ, চাল, ধান, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
গোপালগঞ্জ	শুক্রবার-সোমবার	ধান, চাল, মাছ, গুড়, তরিতরকারি ইদ্যাদি
পাটিকেলবাড়ি	শনিবার-মঙ্গলবার	চাল, মাছ, তরিতরকারি, গুড় ইত্যাদি

মুকসুদপুর উপজেলা

নাম	বার	দ্রব্য
জলিরপাড়	সোমবার-বৃহস্পতিবার	ধান, চাল, পাট, মাছ, কলাই তরিতরকারি ইত্যাদি
দিগনগর	রবিবার-বুধবার	পাট, ধান, তিল, কলাই, মাছ তরিতরকারি ইত্যাদি
ট্যাংরাখোলা	রবিবার-বৃহস্পতিবার	ধান, পাট, কলাই, তিল, মাছ তরিতরকারি ইত্যাদি
বনগ্রাম	রবিবার-বৃহস্পতিবার	ধান, পাট, গুড়, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
গোহালা বাজার	দৈনিক বাজার	চাল, পাট, কালাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
রামদিয়া	সোমবার-বৃহস্পতিবার	ধান, চাল, পাট, চেরাইকাঠ, পান, সুপারি, চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি

কাশিয়ানী উপজেলা

নাম	বার	দ্রব্য
ফলসী	শুক্রবার-সোমবার	বাঁশ, ধান, চাল, পাট, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

কাশিয়ানী	সোমবার-বৃহস্পতিবার	ধান, পাট, কলাই, মাছ তরিতরকারি ইত্যাদি
পরানপুর	বুধবার	গরু-ছাগল, ধান, পাট, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
রাহুথর	রবিবার-বুধবার	বাঁশ, ধান, পাট, চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি।
ঘোনাপাড়া	রবিবার-বুধবার	ধান, চাল, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি

কোটালীপাড়া উপজেলা

নাম	বার	দ্রব্য
রামশীল	শনিবার-মঙ্গলবার	ধান, চাল, কলাই, মাছ তরিতরকারি ইত্যাদি
কুশলা	রবিবার-বৃহস্পতিবার	চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
হিরণহাট	শনিবার-মঙ্গলবার	চাল, গুড়, মাছ তরিতরকারি ইত্যাদি
রাধাগঞ্জ	শনিবার-বুধবার	ধান, চাল, কলাই, পাট, গুড়, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি।
ঘাগর হাট	সোমবার-শুক্রবার	চাল, পাট, কলাই, মাছ, তরতরকারি ইত্যাদি
পূর্বপাড়া ওয়াবদাহাট		রবিবার-বুধবার নিত্যপ্রয়োজনীয় সব ধরনের পণ্য

টুঙ্গীপাড়া উপজেলা

নাম	বার	দ্রব্য
পাটগাতী	শনিবার-মঙ্গলবার	ধান, পাট, শন, কলাই, চাল, মাছ তরিতরকারি ইত্যাদি
গিমাডাঙ্গা	শুক্রবার-সোমবার	চাল, মাছ, গুড়, তরিতরকারি ইত্যাদি
কুশলী	শনিবার-বুধবার	বেত, ধান, চাল, পাট, কলাই, মাছ তরিতরকারি ইত্যাদি
শিশনী	রবিবার-বৃহস্পতিবার	ধান, চাল, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
গোবরা	শনিবার-বুধবার	চাল, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি

সামাজিকতা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। নিজের ব্যক্তিত্ব, পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ, সমাজের প্রতি কর্তব্য ও দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এসব বিষয়ে যার সচেতন বোধ আছে তিনিই সামাজিক ব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে বোধাবোধ সবার মধ্যে কমবেশি দেখতে পাওয়া যায়। অত্র অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থা অনুরূপ পরিলক্ষিত হয়। তারমধ্যে কোনো

www.pathagar.com

কোনো অঞ্চলে অতীতকালের কিছু ভাবধারা চোখে পড়ে। ইতিহাস প্রমাণ দেয় জমিদারগণ বা প্রভাবশালীরা নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কিছু পারিষদবৃন্দ জোটাতেন। সেই পারিষদ ওইসব কুলীন ব্যক্তিবর্গের আজ্ঞাবাহী দাস হয়ে থাকত। সমাজে নিজেরা মাথাতুলে দাঁড়াবে, কিংবা নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে এই সচেতন বোধ তাদের মধ্যে ছিল না। সম্পূর্ণভাবে তারা তাদের মনিবদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এমনকি প্রভুদের অনুগত বলে প্রকাশ করে তারা গর্ভবোধ করতো। অতীত থেকে বয়ে আসা এরকম কিছু রীতিনীতি কোথাও কোথাও ভীত গেড়ে বসে আছে। যেমন একটি গ্রামে যদি দশটি বংশ থাকে দেখা যায় সেসব বংশের মধ্যে দুটি বংশের নামে সমাজ বয়ে চলেছে। বাকি বংশধরেরা কোনো না কোনোভাবে ঐ বংশীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কোন সমাজের লোক, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় আমি অমুক সমাজের লোক। অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছে এতে সে কিছুমাত্র সংশয় বোধ করছে না। দু'টি সমাজ মানে দু'টি পক্ষ। প্রায়ই গ্রামে দু'টি করে সমাজ আছে। ভাইতে ভাইতে, বংশে বংশে, পাড়ায় পাড়ায় সংঘর্ষ হানাহানি এতে লেগেই আছে। এই সমাজ ব্যবস্থায় একাত্মতা প্রকাশ পায় না। অনেকের সাথে এসব বিষয় তথ্য নিয়ে জানা গেছে এই সমাজ ব্যবস্থা শুভফলপ্রদ নয়। কংশুরের গৌরাঙ্গ দাস জানালেন–'এই বংশগত সমাজ ব্যবস্থা অচিরেই বিলোপ সাধন হওয়া দরকার। নিজের খাব নিজের পরব, নিজে শিক্ষিত হয়ে আমি অন্যের নামে পরিচিত হব এটা কোনো সচেতন মানুষ চায় না। এর বিরুদ্ধে বড় ধরনের আন্দোলনের প্রয়োজন। বিশেষ করে গোপালগঞ্জ উপজেলার সাহাপুর পরগণার আড়ুয়াকংশুর, কংশুর, খাটিয়াগড়, হাটবাড়িয়া, পানাইল ও আশপাশের গ্রামগুলো বেশি আক্রান্ত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আজ হোক, কাল হোক এই বংশগত সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয় ঘটবে।' তিনি আরও বললেন, পৃথিবীতে শত শত কোটি মানুষ বাস করে। কোথাও এই বংশগত সমাজ ব্যবস্থা নেই। কই তারাতো সুন্দর স্বাবলীল জীবন যাপন করছে।'

জীব-জন্তু পাখ-পাখালি, কীট-পতঙ্গ

জীব-জন্তু, পাখ-পাখালি, কীট-পতঙ্গ কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা করে না, প্রকৃতি তার নিজের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃহদাকৃতির প্রাণী পর্যন্ত সৃষ্টি করেছে। তবে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন জায়গায় আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু দেখতে পাওয়া যায়। এই জনপদের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী যে ধরনের জীবজন্তু থাকার কথা তা আছে বটে, তবে বনবাদাড় ঝোপঝাড় নিতি নিতি বিলুপ্তির ফলে বেশকিছু প্রজাতি হারিয়ে গেছে।

চতুষ্পদ প্রাণী : গরু, ছাগল, ঘোড়া, মহিষ, মেষ, কুকুর, বিড়াল, শিয়াল, খেঁকশিয়াল, বনবিড়াল, খাটাস, খচ্চর, বেজি, ছুচো, ইঁদুর ব্যাঙ ইত্যাদি।

সরিসৃপ প্রাণী : কাছিম, গুইসাপ, গোখরা, কেউটিয়া, শানিসাপ ও বিভিন্ন প্রজাতি সাপ।

পাখি : দোয়েল, শ্যামা, কোকিল, কবুতর, ঘুঘু, শালিক, চড়ুই, পেঁচা, হলদে পাখি, বউ কথা কও, তালচড়া, বাবুই, টুনটুনি, গুঁইগোদা, ফিঙে, চিল, কাক, হাস, মুরগী,

www.pathagar.com

ক্যাচকেচিয়া, চ্যাগা, ভিলভিলা, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, তোতাপাখি, চিল, বাদুড়, চামচিকা, গগন ধাওয়া, শীতের পাখি ইত্যাদি।

পোকামাকড় : বিছা, কেল্লুয়া (কেন্নো), প্রজাপতি, ভীমরুল, মৌমাছি, বল্লা, ক্ষুদে বল্লা, মশা, মাছি, ঝিঁঝি পোকা, জুনিপোকা, চাটুয়া, জোঁক, উইপোকা, পিঁপড়া, ওল্লা, মাইঝাল, টিকটিকি, ছিটকা পোকা, লেদাপোকা, চেলা, মাকড়সা, তুতপোকা ইত্যাদি।

জলজ প্রাণী : শুশুক, মেছো কুমির, রুই, কাতলা, মৃগেল, চিতল, বোয়াল, আইড়, শোল, গজার, বেলে টাকি, বাথুয়া টাকি, তেলুয়া টাকি, ভাইমরা টাকি, পাবদা, ইলিশ, ফলি, কৈ, শিং, মাগুর, বাইন, ট্যাংরা, পুঁটি, খয়রা (খলিসা), ইচিয়া (চিংড়ি) কাইল্যা, খল্লা, টাটকেনি, গুতিয়া, কুচিয়া, এলাং, পাতাসি, গাবপাতা, নাপিত কৈ, বাচা, ঘাগরা, ফুলট্যাংরা, বুজুরিয়া ট্যাংরা, কালিবোস, নান্দিয়াল, রয়না, ট্যাপটেপিয়া, গ্যানগেনিয়া, চেলা, চুচড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি।

ফসল, তরকারি, বনজ, ফলজ ও ওষধি বৃক্ষ

অনুকূল জলবায়ু ও দো-আঁশ মাটির জন্য অঞ্চলটি কৃষি প্রধান। ফসলী জমিতে ফসল আর বন বাদাড়, রাস্তার ও বাড়ির আশপাশে জন্ম নিয়েছে নাম জানা অজানা হরেক রকমের উদ্ভিদ। নিম্নবর্ণিত ফসল ও উদ্ভিদ কৃষক পরিবারগুলোর একমাত্র ভরসা। 'আগের মতো আমাদের দেশে আউশ ধান, দিঘা ধান ও আমন ধানের চাষ হয় না। বোরো ধান তো প্রায় উঠেই গেছে। ব্লকের চাষ আসায় সেসব আর কেউ চাষ করে না। আগে কত আউশ ধান দিঘা ধান ও আমন ধানের চাষ হতো।

আউশ ধান : লক্ষ্মীলতা, শ্রীবলিয়ান, পরাঙ্গী, কচ্চামুড়ি কোসমারী, চৌদ্দমুগুর, ষাটিয়া, নোড়ৈ, শিয়াল পরাঙ্গী, কটকতারা ইত্যাদি।

দিঘা ধান : লক্ষ্মী দিঘা, কনক দিঘা, ভাওয়ালী দিঘা, মানিক দিঘা, খাড়া দিঘা, লাল দিঘা, সম্বরি দিগা, সোনা দিঘা ইত্যাদি।

আমন ধান : ছত্রভোগ, দুধমণি, গাজীভোগ, পৃথিরাজ, কাচকলম, গৌরকাজল, খৈয়ামটর, শিয়াল নেজি, ন্যাতপাশা, জাবড়া, দলকচু, বান্দরজটা, জয়না, বীরপালা, ব্যতক, রায়েন্দা, মালভোগ, কালামনা, মাটচাল প্রভৃতি।'

অন্যান্য ফসল বা তরিতরকারি : সরিষা, পাট, গম, কলাই, বাদাম, সয়াবিন, তিষি, মোষনে, তিল, লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, আদা, ধনে, পিঠাজন, তামাক (বিলুপ্তপ্রায়), পান, গোলআলু, মিষ্টি আলু, শশা, কপি, মুলা, পালংশাক, হেলেঞ্চা, পুঁইশাক, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, কচু, কচুরলতি, বেগুন, চালকুমড়া, কুশি, কাঁচাঝাল, ঢেঁড়স ইত্যাদি।

ফুল : শাপলা, পদ্ম, জবা, গাঁদা, বেলীফুল, কৃষ্ণচূড়া, যুথি, মালতি, মল্লিকা, হাসনা হেনা, কাচড়াফুল, জুঁই, শেফালী, কামিনী, দুপুরে ফুল, লিলিফুল, কেতকী, টগর, ধুতরা ফুল, বর্ণিফুল, নীলকণ্ঠ, মোরগ ফুল, সূর্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ফল : আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, খেজুর, কলা, পেঁপে, লিচু, লেবু, বাতাবী লেবু, সফেদা, আতা, বেল, কুল, বাঙ্গি, তরমুজ, (শ্যাওড়া বাড়ি, বড় ডোমরাশুর) কামরাঙ্গা, করমচা ইত্যাদি।

আগাছা শুকনো মৌসুমে : ভাদলা, আদাগাঠিয়া, ভিটাচাটা, গুচ্ছঘাস, গুন্দিঘাস, বালিয়াবন, কাটা গাছ, চেউচি, কলবন, কাঁটানটে ইত্যাদি।

আগাছা বর্ষা মৌসুমে : কচুরিপানা, পদ্ম, কাঁটা শেওলা, ভাসা শেওলা, চুনো শেওলা, মালঞ্চ, শাপলা, মামাকলা, কলমি, শালুক, ঘেচু, উড়ি, কলবন, ঝরা ইত্যাদি।

পর গাছা : স্বর্ণলতা।

নেশা জাতীয় উদ্ভিদ : তামাক, গাঁজা, ভাং, সুপারি, ধুতরা ইত্যাদি।

বনজ বৃক্ষ : অর্জুন, মেহগনি, শিরিষ, বাঁশ, কড়াই, শিশুগাছ, গাবগাছ, হিজল গাছ, শ্যাওড়া গাছ, কালি কড়াই ইত্যাদি।

ফলজ বৃক্ষ : আম, জাম, কাঁঠাল, খেজুর, কলা, জামরুল, আতা, পেয়ারা, সফেদা, লিচু, কামরাঙ্গা, জলপাই, আমড়া, বিলাতি গাব, তাল, জাম্বুরা, লেবু, সুপারি, তেঁতুল, বেল গাছ ইত্যাদি।

ওষধি বৃক্ষ : নিম, নিসিন্দা, উলট কম্বল, হরিতকী, বহেড়া, আমলকি, বাশোক, নিশ্চিন্তা, ভিটা ছাড়ার লতা, দূর্বা, থানকুনি, কালোমেঘ, আশকলি গাছ, শেওড়াগাছ, আমগুরুজেয় লতা, পিঠাজন, আকন্দ, ধুতরা, কৈয়াড়া, বিশ কাটালি, বিশল্যকরণী ইত্যাদি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

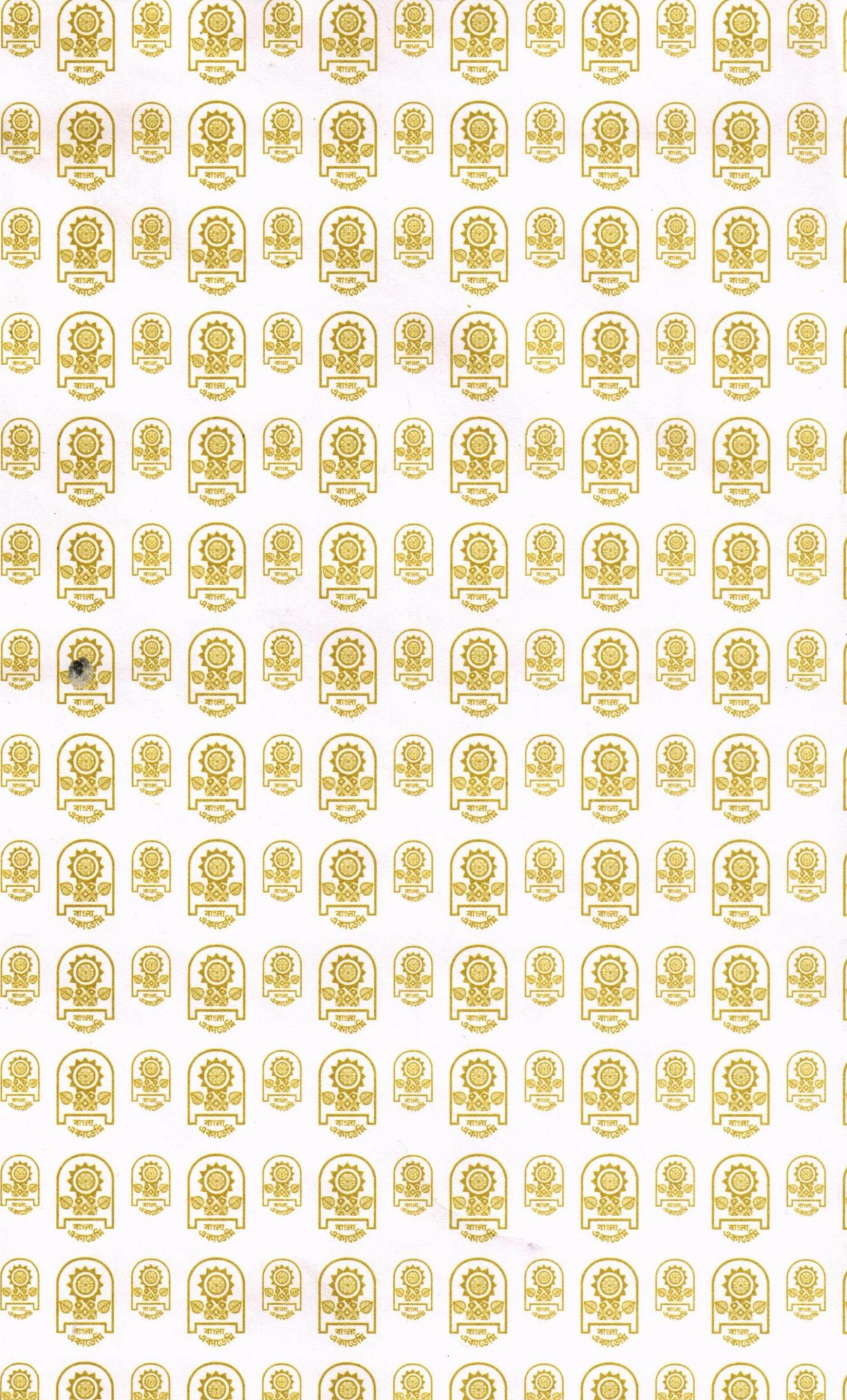
বাংলা একাডেমি